সূচিপত্র

পৃষ্ঠা　নিবন্ধ　লেখক

১৫ জেঠামো / রাজনারায়ণ বসু
১৯ ঢেঁকি / বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৩ কোকিল / চন্দ্রনাথ বসু
২৬ রসিকতা / কালীপ্রসন্ন ঘোষ
৩১ গগন-পটো / অক্ষয়চন্দ্র সরকার
৩৬ মোটা রসিকের প্রবন্ধ / ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৯ ন্যাসপাতি ও নবন্যাস / ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়
৪২ তৈল / হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৪৬ কেকাধ্বনি / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫০ বাজে কথা / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৪ ছত্র-মহিমা / দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
৬০ ফাল্গুন / প্রমথ চৌধুরী
৬৬ হুঁকা, কলিকা বনাম চুরট সিগ্‌রেট / ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৭০ প্র্যাক্‌টিক্যাল / বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭৩ প্রেম ও ডাণ্ডা / উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৫ নামতত্ত্ব / রাজশেখর বসু
৭৯ গণেশ / অতুলচন্দ্র গুপ্ত
৮৩ ক্যাবলের পত্র / সুকুমার রায়
৮৮ স্টোভ / ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৯৫ খিচুড়ি / জ্যোতির্ময় ঘোষ
১০০ বিজ্ঞাপন / পরিমল গোস্বামী
১০৪ পঞ্চাশোধ্বে / গোপাল হালদার
১১১ রেলগাড়ি / নবেন্দু বসু
১১৯ অটোগ্রাফ / প্রমথনাথ বিশী
১২২ অলিখিত পৃষ্ঠা / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পৃষ্ঠা নিবন্ধ লেখক

১২৭ শয়নবিলাস / ইন্দ্রজিৎ
১৩১ কানাই ও বলাই / অন্নদাশঙ্কর রায়
১৩৩ কুড়েমি / প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৩৭ বই কেনা / সৈয়দ মুজতবা আলী
১৪৩ কোনো কাজ নেই / প্রবোধকুমার সান্যাল
১৪৭ স্বাক্ষর-শিকার / শিবরাম চক্রবর্তী
১৫২ কড়া / জ্যোতির্ময় রায়
১৫৫ দাঁত / বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১৬৪ আড্ডা / বুদ্ধদেব বসু
১৭০ কিকিকিনি / পরিমল রায়
১৭৬ আধুনিকা / যাযাবর
১৭৯ মধুসংহিতা / সুবোধ ঘোষ
১৮২ বই হারানো / নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
১৮৭ যদি / কালপেঁচা
১৯২ নির্জনতার আনন্দে / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৫ মানচিত্র ও ব্র্যাডশ / রঞ্জন
২০০ সেই বাঙালী বাবুটি / রমাপদ চৌধুরী
২০৬ বসন্ত কেবিন / নীলকণ্ঠ
২১১ বাসরঘর / পূর্ণেন্দু পত্রী

২১৭ লেখক-পরিচিতি

ভূমিকা

কোনো বিশেষ একজন কবি বা তাঁর কাব্যকে নির্জন আখ্যা দিলেও একথা অনস্বীকার্য কবি মাত্রেই নির্জন, মনের দিক থেকে জনতাতেও নির্জনতম। কবির এই নিজস্ব নির্জনেই দ্রুতগতি সময় থমকে দাঁড়ায়, কবির হাতে দিয়ে যায় কয়েকটি চিরন্তন মুহূর্ত, যাদের আর-এক নাম কবিতা। কবিতার মতো আরও দু'টি সাহিত্য-প্রকরণে মানবমনের প্রকাশ যেমন সাবলীল তেমনই অন্তরঙ্গ: একটি ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, অন্যটি ব্যক্তিগত বা স্বগত প্রবন্ধ। এবং এদের জন্ম যেখানে আমরা তাকেই বলি লেখকের নিজস্ব নির্জন। এই নির্জনে দৈনন্দিনের তাড়নায় উৎসাহের ব্যথা উদ্যমের ভাবনা থাকে না বলেই মানুষ কবিতায় (বা কবিতার আদিরূপ গানে), ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে, সৎ আত্মজীবনীতে, স্বগত প্রবন্ধে নিজেকে যতখানি নিরঙ্কুশভাবে প্রকাশ করতে পারে, সাহিত্যের অন্য কোন প্রকরণে তা পারে না।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সঙ্গে প্রচলিত ধারণার প্রবন্ধের পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ প্রবন্ধ বলতে আমরা গম্ভীর চেহারার ভারি ওজনের তাত্ত্বিক রচনা বুঝে থাকি, যার উপজীব্য ইতিহাসের দর্শন থেকে দর্শনের ইতিহাস, বিমূর্ত চিত্রকলা থেকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পর্যন্ত বহু বিচিত্র বিষয়ের পরিসরে বিস্তৃত। ইংরেজীতে এই জাতীয় লেখাকে বলা হয় expository essay, বাংলায় সাধারণভাবে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ। ব্যাপক অর্থে প্রবন্ধ বা নিবন্ধ পদবাচ্য হলেও এ-জাতীয় রচনা বিষয়-প্রধান, অর্থাৎ এ-ধরনের রচনায় লেখক একটি বিশেষ বিষয়কে অবলম্বন করে নানা তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে ও পারম্পর্যে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াস পান, ফলে এতে লেখকের মনের চাইতে মনন অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে। অবশ্য এর দ্বারা আমি এ-কথা বলতে চাইছি না যে, তথ্যবহুল তত্ত্বপ্রধান প্রবন্ধ মাত্রই দুষ্পাঠ্য, প্রতিভাবান লেখকের হাতে এ-ধরনের লেখাও যে কতখানি রসোত্তীর্ণ হতে পারে এলিঅট ও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলি তার প্রমাণ।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা personal essay চেহারায় চরিত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। বিষয় বিশেষকে অবলম্বন করে লেখা হলেও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ একান্তভাবেই লেখকের নিজস্ব নির্জনের রম্য প্রসূন, যার সর্বাঙ্গে লেখকের ব্যক্তি-মনের শুভ্র সৌগন্ধ্যের বিনম্র উচ্চারণ। লেখকের ব্যক্তিমনই ব্যক্তিক নিবন্ধের প্রাণ, তার আত্মা, এককথায় তার সামগ্রিক অস্তিত্ব। য়ুরোপীয় সাহিত্যে যিনি প্রবন্ধকে সুস্পষ্ট চেহারায় প্রথম প্রতিভাত করেছিলেন, ষোড়শ শতকের সেই ফরাসী লেখক মঁতেইন একবার বলেছিলেন, প্রবন্ধে আমি নিজেকে রূপায়িত করি। ব্যক্তিগত বা স্বগত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে মঁতেইন-এর এই উক্তি সর্বাধিক প্রযোজ্য এবং আধুনিক স্বগত নিবন্ধকারদের আদিপুরুষ হিসাবে যিনি এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। এককথায়, যে-প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বাঙ্গীণ, সেই প্রবন্ধই সার্থক ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এবং সেই কারণে তা কবিতার সহোদর। এবং সত্য কথা বলতে গেলে, কবির কলমেই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ভালো খোলে। চার্লস ল্যাম, রবার্ট লুই স্টীভেনসন, জি. কে. চেস্ট্যরটন, হিলেয়ার বেলক—ইংরেজী সাহিত্যের এই অগ্রণী ব্যক্তিক নিবন্ধকারেরা কবিও ছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত নিবন্ধকার হিসাবে তাঁদের খ্যাতি তাঁদের কবি-প্রসিদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যেও একই দৃশ্য। বাংলা নিবন্ধ-সাহিত্যের একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ, অন্যদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী কাব্যচর্চা করতেন, আর বুদ্ধদেব বসু তো আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান পুরুষদের অন্যতম। এবং বর্তমান সংকলনের একাধিক রচনা বা রচনাংশ স্পষ্টতঃই লিরিকধর্মী।

॥ দুই ॥

তুচ্ছাতিতুচ্ছ বা আপাত-গম্ভীর যে-কোন বিষয়ই ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উপজীব্য। মাথার টুপি থেকে পায়ের মোজা, বই কেনা থেকে বই হারানো, জেঠামো থেকে কুড়েমি, দরজার কড়া থেকে মানুষের দাঁত—যে-কোন প্রসঙ্গ প্রবন্ধকারের ভাবনা-কল্পনাকে উদ্দীপিত করতে পারে। এবং সেই সঙ্গে পাঠকেরও। গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে লেখা অনেক পড়েছি, সেইসব লেখার অনেক সারবান অংশ আজও স্মরণে উজ্জ্বল, কিন্তু যখনই কারও মাথায় টুপি দেখি তখন অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে যায় চেস্ট্যরটনকে, যিনি বলেছিলেন উড়ে-যাওয়া টুপির পিছনে ছোটা বিয়ের জন্য পাত্রীর পিছনে ছোটার চাইতে এমন বেশি কিছু একটা হাস্যকর ব্যাপার নয়। অথবা কলকাতার প্রেসিডেন্সি

কলেজের রেলিঙে সাজিয়ে-রাখা পুরনো বইগুলি দেখতে দেখতে অগাস্টীন বীরেল-এর অসামান্য মন্তব্য অকস্মাৎ স্মৃতিকে উসকে দেয় : সমস্ত সেরা বই-ই হাত-ফেরতা পুরনো বই। গ্রাম-বাংলা থেকে ঢেঁকি বিদায় নিয়েছে, কিন্তু গ্রামের কোন সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়িতে গেলে আজও বঙ্কিমচন্দ্রের ঢেঁকিকে মনে পড়ে, যাকে দেখে বঙ্কিম লিখেছিলেন : 'দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র পান করে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই।' কতদিন আগে লেখা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'তৈল', প্রথম পড়েছিলাম ত্রিশ বছর আগে, কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধিতে বিত্তবানদের প্রতিদিনের কার্যকলাপ দেখে ঐ রচনা বারবার পড়তে ইচ্ছা হয়, প্রতীয়মান হয় রচনাটির আপ্তবাক্য-ধর্মী শেষ পংক্তি 'এক তৈলে চাকা ঘোরে আর এক তৈলে মন ঘোরে' একালেও কতখানি নির্মম সত্য।

সুশীল পাঠক মার্জনা করবেন। ব্যক্তিক নিবন্ধের উপর নিবন্ধ রচনা করতে করতে আমিও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এনে ফেলেছি। ব্যক্তিক নিবন্ধের বৈশিষ্ট্যই বোধহয় এইখানে, পাঠকের অজান্তে সে তার লেখকের সঙ্গে পাঠকের গাঁটছড়া বেঁধে দেয়। লেখকের সঙ্গে পাঠক তর্ক করেন না, আচ্ছন্নের মতো লেখকের সব কথা শুনে যান, মাঝে-মাঝেই তারিফ করে বলে ওঠেন, তাই-তো একথাটা তো ভেবে দেখিনি। প্রমথ চৌধুরীর 'ফাল্গুন' প্রবন্ধের শেষ স্তবকে এসে পাঠককেও প্রমথ চৌধুরীর কথায় সায় দিতে হয় : 'পৃথিবীতে বসন্তের যখন কোনোকালে অস্তিত্ব ছিল না, তখন সে অস্তিত্বের কোনোকালে লোপ হতে পারে না।' আমার মতো জাত-কুড়েও আত্মসমর্থনের পক্ষে যুক্তি পেয়ে যান প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কুড়েমি'তে : 'কাজ তো সবাই করে, সূর্য, চন্দ্র, তারা, জড় থেকে চেতন সমস্ত সৃষ্টি কাজের অমোঘ শৃঙ্খলে বাঁধা। কুড়েমি করবার ঐশ্বরিক অধিকার একমাত্র মানুষের। তার মনুষ্যত্বের চরম প্রকাশ এই কুড়েমি করবার স্বাধীনতায়।'

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সার্থকতা বক্তব্যের চাইতে বলার ভঙ্গির উপর বেশী নির্ভরশীল। এ-ধরনের রচনায় কী-বলছি-র চাইতে কেমন-করে-বলছি সেটাই অনেকখানি। এর অর্থ অবশ্যই এ নয়, ব্যক্তিক নিবন্ধ শুধুই ভঙ্গিসর্বস্ব, বক্তব্যহীন, অন্তঃসারশূন্য। ব্যাপারটা বরং উল্টো। জীবনের অনেক সত্য, অনেক গভীর কথা ব্যক্তিগত প্রবন্ধে যত সহজে যত হৃদয়গ্রাহীভাবে বলা যায়, বস্তুগত প্রবন্ধে তা বলা দুরূহ। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যে দুটো করে

জন্মদিন, একটি নিজের অন্যটি বছরের প্রথম দিন, চার্লস ল্যাম্-এর New Year's Eve না পড়লে কী তা প্রতীয়মান হতো? অথবা কোন বাক্‌পটু আসর-জমানো যুবককে যদি অকস্মাৎ বলা হয়, 'ভাই এবার আপনার নিজের সম্পর্কে যা কিছু বলার বলুন', তখন সেই স্মার্ট যুবকের মনে হবে তাঁর ব্যক্তিত্বের বর্ণাঢ্য পোষাকের প্রত্যেকটি চড়া রঙের সুতো কে যেন একটি একটি করে খুলে নিচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্মমভাবে উদ্ভাসিত হবে তাঁর উলঙ্গ বিনশ্বর কম্পমান অস্তিত্ব; বাক্যনবীশ যুবকের এই অভিজ্ঞতার কথা জে. বি. প্রীস্টলীর All About Ourselves না পড়লে কী জানতে পারতাম? বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত বহু নিবন্ধেও একই বৈশিষ্ট্য, একই চরিত্রের উচ্চারণ। স্থানাভাবে বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ দিলাম না, প্রমাণ সংগ্রহের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিলাম। আপাততঃ রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে এ জাতীয় প্রবন্ধকে 'সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনা' আখ্যা দিয়ে বলতে পারি: ব্যক্তিগত প্রবন্ধ কোনো বিশেষ কথা বলবার স্পর্ধা রাখে না, প্রয়োজনের কথা বলার জন্য বা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা নয় বলে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ কবিতারই মতো মৌলিক সৃষ্টি, মানবমনের স্বচ্ছ দর্পণ হিসাবে সাহিত্যপাঠকের সুপ্রিয়।

সুতরাং রচনার রম্যতাই ব্যক্তিগত প্রবন্ধের প্রাথমিক শর্ত এবং এই হিসাবে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রম্য রচনা বা ফরাসী বেল লেত্যর শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু মনে রাখা দরকার, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রম্য রচনা হলেও রম্য রচনা মাত্রই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নয়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ খেয়ালী রচনা। সংগীতের ক্ষেত্রে খেয়াল গানে পারদর্শিতা লাভ যেমন দুশ্চর সাধনাসাপেক্ষ, সাহিত্যেও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মতো খেয়ালী রচনা দীর্ঘ সাধনার উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিষয়ে স্বাধীনতা, সুরে গীতলতা, স্বরে অন্তরঙ্গতা। এ-ধরনের প্রবন্ধে যুক্তি-তথ্যের কঙ্কাল সহজে চোখে পড়ে না, প্রবন্ধের রচনা-লাবণ্যে মন ভরে যায়। বক্তব্য পরিবেশনের আপাত-অসংলগ্নতার অন্তরালে লেখকের মানসিক সংহতি ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে আদ্যন্ত বিভাসিত করে রাখে।

বলেছি, এ জাতীয় প্রবন্ধ যে-কোন বিষয় নিয়ে লেখা যায়। এবং সামান্য ও দৃশ্যতঃ তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিস এ-জাতীয় লেখায় অসামান্য হয়ে দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, যে-জিনিস এ-ধরনের সামান্যকে অসামান্য করে তুলতে পারে তার নাম দৃষ্টিকোণ। চোখের দেখা নয়, দেখার চোখই ব্যক্তিগত প্রবন্ধের প্রাণ, তার আত্মা। কেকারব সুখশ্রাবী নয়, কিন্তু অবস্থা বিশেষে মন তাকে মিষ্টি

করে শুনতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে, এই উক্তির মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের শোনার কান, অন্যভাবে, দৃষ্টির দর্শন। রোদ-জল থেকে মাথা বাঁচাবার সামান্য ছাতা, কিন্তু সেই ছাতাই দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আকাশের দিকে, কবির কল্পনায় সে-আকাশ হয়ে যায় পৃথিবীর ছত্র, যার দণ্ড মাধ্যাকর্ষণ আর যা ধারণ করে আছেন স্বয়ং ভগবান। এই চোখের দেখাও যে অবস্থা বিশেষে বদলে যায়, দেখার চোখে তা-ও ধরা পড়ে: 'বসে দেখায় ও শুয়ে দেখায় angle of vision অনেকখানি বদলে যায়।' সামান্য দরোজার কড়া, কিন্তু সেই কড়া-নাড়ার ছন্দের তারতম্যে যে ডাকের ভাষার পরিবর্তন ঘটে সেকথা কী আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? আমাদের বাড়িতে সব ঘর আছে, নেই শুধু বাসরঘর, বাস্তবে যা এক-রজনীর সত্য, এ-কথাও আমরা জেনেছি একজন ব্যক্তিক প্রবন্ধের লেখকের কাছ থেকে।

জগৎ ও জীবনকে ভিন্ন চোখে দেখতে অভ্যস্ত লেখক প্রায়শঃই সুরসিক হন। তাঁর স্বভাব-রসবোধের প্রকাশ কখনও নির্মল শুভ্র হাস্যরসে, কখনও তির্যক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। দৃষ্টান্ত: রাজশেখর বসু, জ্যোতির্ময় ঘোষ, গোপাল হালদার, শিবরাম চক্রবর্তী ও পরিমল রায়ের রচনাবলি। জেঠামো নানাবিধ ও এক এক বিধ জেঠামোর নানারূপ, মোটা না হলে মানুষ রসিক হতে পারে না, উন্নত হিমালয়ের তুলনায় অবনতশির বিন্ধ্যই সংসারে একমাত্র সুখী বা সর্বদেহের মধ্যে দাঁতই একমাত্র ব্রাহ্মণতুল্য, দ্বিজ—ইত্যাদি সিদ্ধান্তের মধ্যে দৃষ্টিকোণের সঙ্গে স্বভাব-রসজ্ঞানের আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটেছে।

॥ তিন ॥

সাহিত্যের অনেক প্রকরণের মতো প্রবন্ধের আবির্ভাব-দিবস অজ্ঞাত, এবং তার বিকাশ ঘটেছে আমাদের অলক্ষ্যে, ধীরে ধীরে, ইতিহাসের নানা কালস্তরে। সন-তারিখের বিচারে ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের কোনো একটি দিনে ফরাসী লেখক মঁতেইন essais অভিধায় তাঁর কিছু গদ্য-রচনাকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তারপর শব্দটি ইংরেজীতে essay রূপ নিয়ে চলে আসে। ইংরেজীতে প্রথম essay লেখেন বেকন, ১৬১২ সালে, যদিও মঁতেইন-এর essais-এর সঙ্গে বেকনের লেখাগুলির চরিত্রগত পার্থক্য দুর্লক্ষ্য নয়। মঁতেইন-এর অধিকাংশ প্রবন্ধ অনেকাংশেই ব্যক্তিগত, বেকনের রচনা প্রধানতঃ বস্তুনিষ্ঠ। ইংরেজীতে বেকনের পর অ্যাডিসন, স্টীল, গোল্ডস্মিথ, হ্যাজলিট, ডি কুইন্সী,

ল্যাম্, স্টীভেনসন প্রমুখের হাতে essay বহুবর্ণিল বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের বাঙালী প্রবন্ধকাররা মূলতঃ এই ইংরেজ লেখকদের কাছ থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু যে-কথা বলছিলাম। দৃশ্যতঃ ষোড়শ শতকে essay-র জন্ম হলেও এই সাহিত্যপ্রকরণের প্রাচীনত্ব দূরবিস্তৃত। অন্ততঃ আধুনিক essay বা প্রবন্ধের আদিরূপের বহু নিদর্শন প্রাচীন বিশ্বসাহিত্যে বিদ্যমান। রোমীয় লেখক সেনেকার Epistles to Lucilias, হিব্রু সাহিত্যের জ্ঞানগর্ভ রচনাগুলি বা Old Testament এবং আমাদের পুরাণ-মহাভারতের বহু অংশকে পূর্ণতঃ না হলেও বহুলাংশে essay বলে চালানো যেতে পারে। এবং যে-ব্যক্তিগত প্রবন্ধ আমাদের বর্তমানে আলোচ্য, তারও আদিরূপের পরিচয় পাওয়া যাবে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতাব্দীর গ্রীক লেখক লুসিয়ান-এর A Slip of the Tongue in Salutation এবং চতুর্থ শতকের চীনা লেখক তাও-য়ুয়ান-মিঙ্-এর Home Again রচনা দু'টিতে।

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য থেকে ফিরে আসি বাংলা সাহিত্যে। আমাদের সাহিত্যে প্রবন্ধের আবির্ভাব উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের ইতিহাসধর্মী রচনায়, রামমোহন রায়ের ধর্মীয় ও বিতর্কমূলক নিবন্ধাবলিতে এবং 'দিগ্‌দর্শন', 'সমাচারদর্পণ', 'সম্বাদপ্রভাকর' প্রভৃতি প্রখ্যাত সাময়িক পত্রগুলির বহু রচনায় বাংলা প্রবন্ধের আদিরূপের সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু এই সমস্ত রচনাই তত্ত্ব- এবং অথবা তথ্য- প্রধান প্রবন্ধের উদাহরণ। বাংলা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আবির্ভাব গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কিছু কিছু লেখায় তার আভাস পরিলক্ষিত হলেও যথার্থ ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আত্মপ্রকাশ রাজনারায়ণ বসুর 'জেঠামো'তে, যা দিয়ে বর্তমান সংকলনের সূচনা এবং সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক রচনায়।

বাংলা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ইতিহাস চারটি পর্বে বিধৃত। প্রথম পর্বের কেন্দ্র-পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় পর্বের রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী, তৃতীয় পর্বে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতির্ময় রায়ের প্রাধান্য এবং চতুর্থ পর্ব সৈয়দ মুজতবা আলি থেকে সাম্প্রতিকতম লেখক পর্যন্ত বিস্তৃত। তুচ্ছ প্রসঙ্গ ও সামান্য জিনিসকে দৃষ্টিকোণের আলোকে তাৎপর্যময় ও অসামান্য করে তোলার ক্ষমতা বা এ-ধরনের প্রসঙ্গকে ঘিরে কবিকল্পনার স্বচ্ছন্দ বিহার—ব্যক্তিগত প্রবন্ধের এই ধরনের বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সমসাময়িক ও অল্পবিস্তর পরবর্তী রাজনারায়ণ বসু, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ লেখকদের প্রবন্ধে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধারা পরিণততর রূপ লাভ করে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর হাতে, সময়ের হিসাবে বর্তমান শতাব্দীর সূচনাতে। এই পর্বের গদ্যে যোজিত হলো নতুন মাত্রা: উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে এবং বর্ণিল ও ইঙ্গিতময় শব্দের ব্যবহারে সমকালীন প্রবন্ধ সাহিত্যে একই সঙ্গে এলো কাব্যের লাবণ্য এবং মনন-গদ্যের দীপ্তি। রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রমথ চৌধুরী আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন চলতি ভাষার ব্যবহারে এবং অনতিবিলম্বেই প্রমথ চৌধুরীর যুক্তিদীপ্র শাণিত বাগ্‌ভঙ্গি সেকালের বহু তরুণ লেখককে প্রভাবিত করল। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং অন্নদাশঙ্কর রায়। এবং শুধু এঁরা নন, এঁদেরও পরবর্তী বহু লেখকের গদ্যশৈলীর প্রেরণাভূমি যে প্রমথ চৌধুরী তৃতীয় পর্বের ইন্দ্রজিৎ বা জ্যোতির্ময় রায়ের এবং চতুর্থ পর্বের রঞ্জন বা নীলকণ্ঠের রচনায় তা সপ্রমাণ। তৃতীয় পর্বের অন্যতম প্রধান লেখক বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিগত (এবং অন্যতর) প্রবন্ধে রবীন্দ্র-নাথ ও প্রমথ চৌধুরীর মিশ্র স্পন্দন; কাব্যগন্ধী, শীতল অথচ প্রয়োজনবোধে শাণিত। ব্যক্তিক নিবন্ধকার হিসাবে বিশিষ্ট ইন্দ্রজিৎ ও বিমলাপ্রসাদের রচনা সম্পর্কেও মোটামুটি একই কথা বলা যায়। কিন্তু এঁদের রচনাবলি যুক্তি-ব্যঙ্গ-সরসতার দিকেই ঝোঁকে বেশি। কবি-স্বভাবে বুদ্ধদেবের সগোত্র সমকালীন আরও কিছু লেখক যে রবীন্দ্ররীতির ছায়ায় বড়ো হয়েছিলেন নবেন্দু বসুর এবং প্রবোধকুমার সান্যালের লেখা পড়লে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অন্য দিকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তথাকথিত সাধুভাষা ব্যবহার করলেও প্রমথনাথ বিশী প্রমথ চৌধুরীরই নিকটতম প্রতিবেশী। প্রমথ চৌধুরীর বাগ্‌ভঙ্গি যে সেকালে বাংলা গদ্যকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত সুকুমার রায়ের 'ক্যাবলের পত্র' তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সন-তারিখের হিসাবে চল্লিশের দশক বাংলা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের স্বর্ণযুগ। এই ধরনের প্রবন্ধের বিশিষ্ট নিদর্শনগুলির সৃষ্টি এই সময়েই। ইন্দ্রজিৎ-বুদ্ধদেব-বিমলাপ্রসাদের সৃষ্টিপ্রবাহ পরবর্তী দশকেও অব্যাহত ছিল। তাঁদের কিছু সংকলন-গ্রন্থের প্রকাশও পরবর্তী দশকের বিভিন্ন সময়ে, এবং পরিমল গোস্বামী ও গোপাল হালদারের মতো প্রবীণ লেখকও পঞ্চাশের দশকে তাঁদের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু একথা

অনস্বীকার্য যথার্থ ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধারা আগের তুলনায় কিছুটা রুদ্ধগতি হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে পঞ্চাশের দশকে সৈয়দ মুজতবা আলির আবির্ভাব ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে একটি বড়ো ঘটনা, কিন্তু অন্তরঙ্গতার স্নিগ্ধ উত্তাপ, কৌতুকপ্রবণ মন ও মজলিশি ঢঙের উপস্থিতি সত্ত্বেও মুজতবার 'পঞ্চতন্ত্র' বইটির বহু প্রবন্ধই ইন্দ্রজিৎ-বুদ্ধদেব-জ্যোতির্ময়ের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সগোত্র হতে পারেনি। বরং মুজতবার দেশজ-বিদেশী শব্দপ্রধান বৈঠকী রচনারীতি রম্য রচনা নামের ছত্রতলে কিছু তরল-চপল লেখার জন্ম দিয়ে সাহিত্যের ক্ষতি করেছিল সে-সময়। এই ধরনের রচনার আক্রমণ থেকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে চতুর্থ এবং সাম্প্রতিক পর্বের যে লেখকরা বাঁচিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কালপেঁচা, রঞ্জন ও নীলকণ্ঠ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বসূরি ইন্দ্রজিৎ-বুদ্ধদেব-বিমলাপ্রসাদের সঙ্গে এঁরা নিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখে যেতেন। প্রসঙ্গতঃ সে-সময় কলকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে কথিকা হিসাবে প্রচারিত রঞ্জনের বহু বিদগ্ধ নিবন্ধ (বর্তমান সংগ্রহের দৃষ্টান্তটিও) জনপ্রিয় হয়েছিল। এবং আমাদের দেশে রঞ্জনই একমাত্র মননশীল অথচ জনপ্রিয় বেতার-কথিকার প্রচারক, যাঁকে বীয়রব্যম ও প্রীস্টলীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কালপেঁচা ও রঞ্জন ছাড়া চতুর্থ পর্বের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে রমাপদ চৌধুরী (একদা পত্রনবীশ ছদ্মনামে লিখতেন), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (সুনন্দ ছদ্মনামে লিখতেন) এবং পূর্ণেন্দু পত্রী উল্লেখের দাবি রাখেন এবং আপাততঃ শেষোক্ত জনের রচনা দিয়ে বর্তমান সংকলনের পরিসমাপ্তি। সামগ্রিকভাবে চতুর্থ পর্বের লেখকরা রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবকে অধিকতর সার্থকতায় আত্মস্থ করে বাংলা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ঐতিহ্যকে নতুনতর আয়তন দিয়েছেন। এবং আশা করব আগামী দিনের লেখকদের প্রয়াসে বাংলা সাহিত্যের এই সমৃদ্ধ ধারা জোয়ারের ঐশ্বর্যে আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

॥ চার ॥

প্রায় সাতাশ বছর আগে 'হালকা মেঘের মেলা' নামে বাংলা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের প্রথম যে সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল তার সংকলক ও সম্পাদক ছিলাম আমি। বর্তমান গ্রন্থে সেই সংগ্রহের বহু প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হলেও চেহারায় চরিত্রে এটিকে নতুন বই বলা উচিত। এর ভূমিকাও নতুন। আগের

সংকলনের মতো বর্তমান সংগ্রহের অন্তর্গত দু'টি প্রবন্ধের শিরোনাম আমার দেওয়া : একটি জ্যোতির্ময় ঘোষের 'খিচুড়ি', অন্যটি যাযাবরের 'আধুনিকা'।

'নিজস্ব নির্জন' গ্রন্থের সম্পাদনা ও প্রকাশের পিছনে নাভানা প্রকাশনার অধ্যক্ষ কবি বিরাম মুখোপাধ্যায়ের অবিরল উৎসাহ সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়; বস্তুতঃ তিনি না থাকলে এ-বই বেরোত কিনা সন্দেহ। 'নাভানা' প্রিন্টিং-এর তরুণ ও সুযোগ্য কর্ণধার শ্রী কুনাল রায়কেও আমি এ-সূত্রে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এ-বইয়ের প্রকাশে প্রথম থেকে প্রণবরঞ্জন ঘোষ, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, শ্যামাপ্রসাদ দে, করুণাশঙ্কর রায় ও জ্যোৎস্না রায়-চৌধুরী উৎসাহ দেখিয়েছেন এবং নানাভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রী দে ও শ্রী রায় তাঁদের সংগ্রহভুক্ত অধুনা-দুষ্প্রাপ্য 'হালকা মেঘের মেলা' (আমার কাছেও যার কপি নেই) বইটির দুটি কপি আমাকে ব্যবহার করতে দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন। এঁদের সকলকে আমার হার্দিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। প্রুফ সংশোধনে সাহায্যের জন্য শ্রী দাশরথি মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মমতা চাকীকে এবং মুদ্রণকার্যে সহযোগিতার জন্য দি প্যারট প্রেসের শ্রী অসীম সাহাকে বিশেষ ধন্যবাদ। সংকলনের অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ তিনটির পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দানের জন্য বিশ্বভারতীকে এবং অন্যান্য প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণের অনুমতিদানের জন্য সংশ্লিষ্ট লেখক, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশকদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

জেঠামো

রাজনারায়ণ বসু

নৈয়ায়িকেরা অনেক পদার্থের লক্ষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের যদি জেঠামো শব্দের লক্ষণা করিতে হইত তাহা হইলে তাঁহারা মুশকিলে পড়িতেন। যেহেতু জেঠামো নানাবিধ ও এক একবিধ জেঠামি নানারূপ ধারণ করে। সামান্যতঃ জেঠামোর লক্ষণা করিতে গেলে ইহা বলা যাইতে পারে যে যাহা নিজের ক্ষমতার অতীত সে বিষয়ে কথা কওয়া জেঠামো। জেঠা নানা প্রকার। জেঠা কবি, জেঠা সমালোচক, জেঠা দার্শনিক, জেঠা বৈজ্ঞানিক, জেঠা পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী, জেঠা বক্তা, জেঠা রিফর্মর। জেঠা কবির বস্তুতঃ কবিত্বশক্তি নাই কিন্তু কতকগুলি শব্দাড়ম্বর দ্বারা লোককে জানাইতে চান, যে তিনি একজন প্রকৃত কবি। তাঁহাদের কবিতাতে 'ঘনঘটা', 'সৌদামিনী', 'নলিনীনায়ক', 'চাতকিনী', 'মৃদুল মৃদুল সমীর' সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করে। আজকাল জেঠা কবিদিগের জ্বালায় তিষ্ঠানো ভার হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল গুটিকতক শব্দ সংগ্রহ করিলে সমালোচনায় বিলক্ষণ জেঠামি করা যায়—সে সকল শব্দ 'ওজোগুণ' 'প্রসাদগুণ' 'প্রাঞ্জলতা' প্রভৃতি। জেঠা সমালোচকেরা আশু প্রতিপত্তি লাভ করিবার জন্য বড়ো বড়ো লেখককে গালি দিয়া থাকেন; যথা,—ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল ইত্যাদি। সকল প্রকার জেঠা অপেক্ষা দার্শনিক জেঠা সর্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্য যাহা কখনো নিরূপণ করিতে পারে না, যাহা ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, দার্শনিকেরা সেই সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া বিলক্ষণ জেঠামি করেন। যেন কতই বিজ্ঞ, যেন পৃথিবীর সকল তত্ত্বই বুঝিয়াছেন। দার্শনিকদের গ্রন্থ হইতে যদি জেঠামি বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে অল্পই অবশিষ্ট থাকে। তাঁহারা ঘটত্বাবচ্ছিন্ন, পটত্বাবচ্ছিন্ন, ইত্যাদি শব্দ দ্বারা কান ঝালাপালা করেন। বৈজ্ঞানিক জেঠা পূর্ব প্রকার বৈজ্ঞানিক মত প্রমাণসিদ্ধ হইলেও তাহা খণ্ডন করিয়া নাম লইবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগের মত জলবুদ্বুদের ন্যায় বৈজ্ঞানিক জগতে এক একবার উত্থিত হয়; আবার কিছুদিন পরে বিলীন হইয়া যায়। সকল বৈজ্ঞানিক জেঠা অপেক্ষা বাঙালী বৈজ্ঞানিক জেঠা আরও ভয়ানক।

তাঁহারা ইংরাজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হইতে উপাদান অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগের অজ্ঞ স্বদেশস্থ ব্যক্তিগণের নিকট বিলক্ষণ জ্যেষ্ঠতাতি ফলান। নিজে একটি কোনো নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতে পারেন না, কেবল ইউরোপীয় মহাজনদিগের নিকট ক্রয় করিয়া 'রিটেল' বিক্রয় করেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী জেঠা হাওয়ার উপর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। সামান্য নিদর্শন ধরিয়া তুলকালাম করিয়া তুলেন। এই শ্রেণীর জেঠারা বলেন যে বাল্মীকি হোমরের চুরি করিয়া রামায়ণ লিখিয়াছেন এবং ভগবদ্‌গীতা-প্রণেতা বাইবেল হইতে ভাব লইয়া গীতা রচনা করিয়াছেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী জেঠা প্রস্তরখণ্ডের উপর নৈসর্গিক কারণে যে সকল আঁজিবিজি পড়িয়াছে, তাহা পুরাকালের কোনো রাজার খোদিত আদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে যখন তাঁহার জেঠামো ধরা পড়ে তখন অপ্রতিভ হয়েন। তখন জেঠার পদ হইতে ছোটো খুড়োর পদে তাঁহাকে নামিতে হয়। বক্তৃতাতে যখন জেঠামি চলে এমন অল্প বিষয় আছে যাহাতে তদ্রূপ জেঠামি চলিতে পারে। নিমিষ বলিয়া এক পদার্থ আছে; অতি অল্প দুগ্ধ ফেনাইয়া ফেনাইয়া তাহা প্রস্তুত হয়। জেঠা বক্তার বক্তৃতা এই নিমিষের ন্যায়। সার অতি অল্পই থাকে, কিন্তু তিনি তাহা ফেনাইয়া ফেনাইয়া মস্ত করিয়া তুলেন। তিনি গুটিকতক পুরাতন পচা কথা লইয়া তিন ঘণ্টা কাটাইতে পারেন। জেঠা বক্তার বক্তৃতাতে এই কয়টি কথা থাকিবেই থাকিবে :—'পূর্ব পশ্চিম এক করা' 'হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত' 'জয়-পতাকা উড্ডীন' ইত্যাদি। তাঁহার বক্তৃতার শেষে 'উত্থান কর, জাগ্রত হও, আর কতকাল আলস্য-শয্যায় শয়ান থাকিবে' এই কথাগুলি চাইই চাই। কোনো কোনো জেঠা বক্তা নম্রতার ভান করিয়া বক্তৃতার প্রথমে বলেন যে 'যদ্যপিও এই বিষয় বলা আমার ক্ষমতার অতীত তথাপি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।' ইহা খুড়ামির আকারে জেঠামো। কোনো কোনো জেঠা বক্তা বক্তৃতার প্রারম্ভে বলেন যে 'আমি এ-বিষয়ে বলিতে প্রস্তুত হইবার সময় পাই নাই।' কিন্তু হয়তো বাড়ি হইতে সমস্ত বক্তৃতা মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন। আরও বলেন যে 'বন্ধুগণের অনুরোধে আমি এ বিষয় বলিতে আসিয়াছি' কিন্তু হয়তো বক্তৃতা করিবার লালসায় তাঁহার প্রাণ ছটফট করিতেছিল। ইহার পর জেঠা রিফরমর। জেঠা রিফরমররা সহরের বড়ো বড়ো সভায় রিফরমেশন ফলান। কথা শুনিয়া বোধহয় তাঁহারা রাতারাতি ভারতবর্ষকে বিলাত করিয়া তুলিবেন কিন্তু কাজে সব ফাঁকি। তাঁহাদিগের ছোটো ছোটো অনেক সভা আছে। সে সকল সভার

সাংবৎসরিক অধিবেশন মহা সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হয়, তাহাতে রাঙা মুখের বিলক্ষণ ছড়াছড়ি হইয়া থাকে ; কিন্তু মাসিক অধিবেশন হয় না কেন ইহা নর-লোকের বুদ্ধির অগম্য। তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন, স্ত্রীলোকের দুঃখে তাঁহাদিগের চক্ষে জল ধরে না, কিন্তু তাঁহাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকের বর্ণ পরিচয় হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তাঁহারা সামান্য লোকের সঙ্গে পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছা করেন না। বিলাতের বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। ইঁহারা কোনো একটি সামান্য কীর্তি করিলে যাহাতে তাঁহাদিগের নাম সংবাদপত্রে উঠে এইজন্য সম্পাদকদিগের বিলক্ষণ খোসামোদ করিয়া থাকেন। জেঠা রিফর্মরদের রিফর্মেশন প্রধানতঃ বোতলেই পর্যাপ্ত হয়। পূর্বে লোকের কোন উপজীবিকা না থাকিলে গুরুমহাশয় অথবা কবিরাজের ব্যবসা অবলম্বন করিত, এক্ষণে লোকের অন্য কোন জীবনোপায় না থাকিলে সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়েন। বিদ্যা যত না থাকুক তাহার অভাব জেঠামি দ্বারা পূরণ করেন। ইঁহারা সবজান্তা। এমন তত্ত্ব নাই যাহা উঁহারা অবগত নহেন। ইস্তক 'কানাইয়ে ঠেলা' হইতে নাগাত 'দণ্ডগ্রহণ' পর্যন্ত এমন বিষয় নাই যাহাতে ব্যাপকতা না করিতে পারেন। আমরা এই শ্রেণীভুক্ত জেঠা।

কিন্তু সকল জেঠা অপেক্ষা বিরক্তিকর বালক জেঠা ও মেয়ে জেঠা অথবা জেঠাইমা। বালক জেঠার জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়াছি! গলা টিপিলে দুধ বেরোয় অথচ ভারি ভারি বিষয়ে বিজ্ঞতা ফলাইতে চেষ্টা করে। ইহারা অল্প বয়সে চশমা ব্যবহার করে ও নস্য লয়। বালকদিগের সম্বন্ধে জেঠামি অত্যন্ত অনিষ্টকর। যে বালক জেঠিয়ে যায় তাহাদের আর ভদ্রস্থ নাই। তাহাদের লেখাপড়ার বিষয়ে জলাঞ্জলি। বাঙালী বালকেরা অন্য দেশের বালক অপেক্ষা শীঘ্র এঁচোড়ে পাকিয়া যায়। অন্য দেশীয় বালকেরা ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বালকবৎ ব্যবহার করে ; কিন্তু বাঙালী ঐ বয়সে পরম বিজ্ঞ হইয়া ওঠে ও বিলক্ষণ জেঠামি করে। নিতান্ত ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষে বড়ো বড়ো বিস্বাদ আম্র ফলিলে যেমন খারাপ, বালক জেঠারা তদ্রূপ। বালক জেঠাদিগের প্রায় এই দুর্দশা ঘটিয়া থাকে যে তাহারা প্রকৃত জেঠার বয়স প্রাপ্ত হইলে খুড়ার ন্যায় লোকের নিকট প্রতীয়মান হয় ; প্রকৃত বিজ্ঞতা কখনো লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এক্ষণে আমাদের দেশে মেয়ে জেঠার সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু মনে এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইতেছে যে আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষা যত বিস্তৃত হইবে ততই ঐ শ্রেণীর জেঠা বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষণেই বসন্ত-প্রারম্ভের কুসুমের

ভায় দুই একটি দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদিগের কোনো বন্ধু সেদিন আমাদিগের নিকট গল্প করিতেছিলেন যে, তিনি রেলের গাড়িতে একটি জেঠাইমার হস্তে পড়িয়াছিলেন। জেঠাইমা ধর্ম-সংস্কারের বিষয় কিছুই বুঝেন না কিন্তু সে বিষয়ে বিলক্ষণ জেঠাইমো করিতেছিলেন। আমাদিগের বন্ধুকে তিনি বিশেষরূপে আক্রমণ করিলেন, বন্ধু 'ত্রাহি মধুসূদন' করিতে লাগিলেন। কি ভাগ্য যে গাড়ি শীঘ্র আড্ডায় আসিয়া পোঁছিল, তা না হইলে তাঁর কি দশা হইত বলা যায় না। আমাদিগের আর একটি বন্ধু প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তিনি আমাদের নিকট একদিন গল্প করিতেছিলেন যে তাঁহার কোনো গ্রন্থ রচনার সময় তাঁহার কোনো সুহৃদ তাঁহার নিকট করযোড়ে বলিলেন যে, দোহাই তুমি এ গ্রন্থখানি রচনা করিও না। আমার বাড়িতে আমার শালী থাকেন, তিনি একজন শিক্ষিতা স্ত্রীলোক, তাঁহার জেঠাইমোতে আমার বাড়িতে তিষ্ঠানো ভার হইয়াছে। তোমার এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে তাঁহার জেঠাইমো আরও বৃদ্ধি পাইবে।

ঢেঁকি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে ঢেঁকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি ? পাখির মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম ? লাঙ্গুলকর্ণতুল্যমানা গজেন্দ্রগামিনী গাভীর মতো মরাইয়ে মুখ দিতাম ? নিশ্চয় আমি পারিতাম না—নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কৃষাণ আসিয়া আমার পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত, আর আমি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শৃঙ্গলাঙ্গুল লইয়া পলাইতাম। আর্যসভ্যতার অনন্ত মহিমায় সে ভয় নাই—ঢেঁকি আছে—ধান চাল হয়। আমি এই পরোপকার-নিরত ঢেঁকিকে আর্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে করি—আর্যসাহিত্য-আর্যদর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না। রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাণিনি, পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল করিতে পারে না। ঢেঁকিই আর্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বল-কারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী,—নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি ঢেঁকিশালে ? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্মসংস্কারে, রাজসভায়—কোথায় না ঢেঁকি আর্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে ? দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্যসভ্যতা মুক্তিলাভ করিল না, আজিও ভূত হইয়া রহিয়াছে। ভরসা আছে, কোনো ঢেঁকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে।

ঢেঁকির এই অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণানুসন্ধানে আমি বড়ো সমুৎসুক হইলাম। এ উনবিংশ শতাব্দী; বৈজ্ঞানিক সময়—অবশ্য, কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেঁকির এই কার্যদক্ষতা! এই পরোপকার মতি! এই Public Spirit! 'নাবস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ!' বিনা কারণে কি ইহা জন্মে ? অনুসন্ধানার্থ আমি ঢেঁকিশালে গেলাম।

দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে উঠিতেছে, বিরতি নাই। ভাবিলাম, মুহুর্মুহুঃ খানায় পড়াই কি এত মাহাত্ম্যের কারণ ? ঢেঁকি খানায় পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপকারে মতি ? এতটা Public Spirit ? ভাবিলাম,—না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেননা, আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই বেলা খানায় পড়িয়া

থাকেন, কিন্তু কই, তাঁহার তো কিছুমাত্র Public Spirit নাই! শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে তো তাঁহার পরোপকার কিছু দেখি না। আরও, মনের কথা লুকাইলে কি হইবে? আমিও—আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী স্বয়ং একদিন খানায় পড়িয়াছিলাম। দ্রাক্ষারসের বিকারবিশেষের সেবনে আমার সেই গর্তলোক-প্রাপ্তি ঘটে নাই—কারণান্তরে। প্রসন্ন গোয়ালিনী গোপাঙ্গনা-কুলকলঙ্কিনী, একদিন তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা ঊর্ধ্ব-পুচ্ছে ধাবমানা। কি ভাবিয়া মঙ্গলা ছুটিল, তা বলিতে পারি না, স্ত্রীজাতি ও গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব? কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার উভয় শৃঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য; তখন আমি কটিদেশ দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়া, সদর্পে বদ্ধপরিকর হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়মান। পশ্চাতে সেই ভীষণা ঘটোধ্নী রাক্ষসী। আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়! কাজেই দৌড়ের চোটে ওচট্ খাইয়া গড়াইতে গড়াইতে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে বিবরলোকপ্রাপ্তি। "আলুথালু কেশপাশ, মুখে না বহিছে শ্বাস"—হায়! তখন কি আমার হৃদয়-আকাশে Public Spirit-রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল? না হইয়াছিল, এমত নহে। তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বসুন্ধরা যদি গোশূন্যা হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খর্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধনিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বাঙালী-জাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শৃঙ্গভীতিশূন্য হইয়া দুগ্ধ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি হেতু আমার পরহিতকামনা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম, 'অয়ি দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর-নবনীত-পরিবেষ্টিতা গোপকন্যা! তুমি গরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউভুসি খাইতে থাকো, তুমি স্বয়ং ঘটোধ্নী হইয়া বহুতর দুগ্ধপোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে, কাহাকেও গুঁতাইও না।' প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মার্জনী হস্তে গ্রহণ করায়, সেদিন আমাকে পরহিতব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য, 'সাধারণ আত্মা' অর্থাৎ Public Spirit বিশেষতঃ কার্যদক্ষতা, এসকল খানায় পড়িলে হয় কিনা? যদি না হয়, তবে ঢেঁকির এ কার্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল? আমি এই কূটতর্কের মীমাংসার জন্য সন্দিহান চিত্তে ভাবিতেছিলাম, এমত সময় মধুর কণ্ঠে কে বলিল, 'চক্রবর্তী মহাশয়, হাঁ করিয়া কি ভাবিতেছ? ঢেঁকি কখনও দেখ নাই?'

চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিণী, মাতঙ্গিনী, দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে।

সে দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। হাতি দেখিতে গিয়া অন্ধ কেবল শুণ্ড দেখিয়াছিল, আমিও ঢেঁকির শুঁড় দেখিতেছিলাম। পিছনে যে দুই জনের দুই-খানি রাঙা পা ঢেঁকির পিঠে পড়িতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই। দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া লইল।

আমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল—কার্যকারণ সম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্যকিরণে প্রভাসিত হইল। ঐ তো ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ। ঐ রমণী-পাদপদ্ম। ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া ঢক ঢক কচ কচ। কত পরোপকারই করিতেছে। হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ। পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত-কোটি বাঙালীকে অন্ন দিতেছ—তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছ। এস মেয়েমানুষের শ্রীচরণ। তুমি ভালো করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়ো, আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া তোমায়—হায়। কি করিব? কাঁসার মল পরাই।

আর ভাই ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম ওরফে মেয়েলাথি পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভানো—নইলে কেবল কাঠ—দারুময়—গর্তে শুঁড় লুটাইয়া লেজ উঁচু করিয়া ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাকো। বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে ধান্য, পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙা পা—আবার শুনিতে পাই, তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে নাকি? ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমির হও? আর ভাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয়। দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারিজাত লোফে, অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া করে, মেঘে চড়ে, বিদ্যুৎ ধরে, রতি-রতিপতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে—তুমি নাকি ততক্ষণ কেবল ঘেচর ঘেচর করিয়া ধান ভানো। ধন্য সাধ্য ভাই তোমার!

ঢেঁকি কোনো উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম—একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি? ৺নসীবাবু সম্প্রতি ধান ভানিতে গিয়াছেন। নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙা চালাঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারী-বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে—ঘরখানির এমন অবস্থা যে, আর কেহ তাহার কামনা করিল না—সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি, কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে, সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম। আমি সেইখানে চারপায়ীর উপর পড়িয়া আফিং চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয়া

আসিল, জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। দেখিলাম, এ সংসারে কেবল ঢেঁকিশাল। বড়ো বড়ো ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশাল—তাহাতে বড়ো বড়ো ঢেঁকি গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি প্রজা-দিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া নূতন নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্নভোজন করিতেছেন, কোথাও আইনকারক ঢেঁকি মিনিট-রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া-ভাঙিয়া বাহির করিতেছে—আইন, বিচারক-ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস, ধনীর ধনান্ত ভালোমানুষের দেহান্ত। বাবু-ঢেঁকি বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছে পিলে, যকৃৎ : তাঁর গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছে—অনাহার। সর্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম। লেখক-ঢেঁকি সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুল বুক।

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি, কমলাশ্রমে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি; নেশায় গড়ে মনোদুঃখ-ধান্য পিষিয়া চাউল বাহির করিতেছি। মনে মনে অহংকার জন্মিল—এমন চাউল তো কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল, এ চাউল মনুষ্যলোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম—'অশ্বমনোরথে' স্বর্গে গিয়া দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "আপত্তি কি? পুরস্কার চাই কি?"

আমি। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা।

দেবরাজ। উর্বশী, মেনকা পাইবে না। আর যাহা চাহিবে, তাহা মর্ত্য-লোকেও তুমি পাইয়া থাক—আটটার হিসাবে।

আমি দুর্মুখ—বলিলাম, "কি ঠাকুর, অষ্টরম্ভা? সে কি আজকাল নর-লোকের পাবার যো আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।"

সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বখশিস হুকুম করিলেন, এক সের অমৃত, আর একঘণ্টার জন্য উর্বশীর সংগীত। চৈতন্য হইলে দেখিলাম, পাশে ঘটিতে এক সের দুগ্ধ, আর প্রসন্ন দাঁড়াইয়া চিৎকার করিতেছে—'নেশাখোর', 'বিটলে', 'পেটার্থী' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উর্বশীকে বলিলাম, "বাইজী, এক ঘণ্টা হইয়াছে, এখন বন্ধ করো।"

কোকিল

চন্দ্রনাথ বসু

লোকে বলে কোকিলের রূপ নাই, কোকিল কুৎসিত—কেননা কোকিল কালো। স্বীকার করি, নানা রঙে রঞ্জিত সুকোমল পক্ষ-বিশিষ্ট অনেক পক্ষী আছে—তাহারা কোকিল অপেক্ষা সুন্দর। তাহাদের মধ্যে অনেকের সৌন্দর্যে অপূর্ব কমনীয়তা, অনেকের সৌন্দর্যে জ্যোতি, অনেকের সৌন্দর্যে অপূর্ব কান্তি, অনেকের সৌন্দর্যে অপূর্ব মহিমাও লক্ষিত হয়। কোকিল কালো—অতএব কোকিলের সেরূপ সৌন্দর্য নাই কিন্তু কালো বলিয়াই কি কোকিল কুৎসিত? কালো জল সুন্দর, কালো মেঘ সুন্দর, কালো চুল সুন্দর। তবে কালো কোকিল সুন্দর নয় কেন? তুমি বলিবে—কেন তাহা বলিতে পারি না, তবে কুৎসিত দেখি, তাই বলি কালো কোকিল কুৎসিত। আমি বলি—তুমি সৌন্দর্য দেখিতে জানো না, তাই কালো কোকিলকে কুৎসিত দেখ। দেখ, কালো জল কালো বলিয়া সুন্দর নয়; তাহা হইলে এই যে কালো কালিতে লিখিতেছি, ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই হইত না। কালো জলে নক্ষত্র-খচিত নীল আকাশের ছবি উঠে বলিয়া কালো জল সুন্দর। তেমনি কালো মেঘ অমৃতবৎ বারি বর্ষণ করিয়া কালো জলের সহিত কথা কয় বলিয়া সুন্দর। আর কালো চুল সতীর পায় লুটায় বলিয়া সুন্দর। ভালোর সম্পর্কে থাকিয়াই কালো ভালো। ছেলে নাড়ীছেঁড়া ধন বলিয়াই জননীর চক্ষে তাহার কালো রঙ এত সুন্দর। কালো কোকিলের কি এমন কিছুই নাই, যাহার গুণে তাহাকে কুৎসিত না দেখিয়া সুন্দর দেখি? তুমি বলিবে—কিছুই তো নাই, থাকিলে তাহাকে কুৎসিত দেখিব কেন? আমিও এই কথার একটি মীমাংসা করিব বলিয়া আজ কোকিলের কথা পাড়িয়াছি।

কোকিল অনেক দিনাবধি কবিদিগের সম্পত্তি। কবিরা কোকিলকে লইয়া অনেক খেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোকিলকে চিনিতে পারেন নাই। তাই আজ কোকিল এত কুৎসিত পাখি। কবিরা বলেন যে, কোকিলের স্বরে বিষ বই আর কিছুই নাই—যে মধু আছে তাহাও বিষমাখা। কিন্তু কোকিলের স্বরে

বিষ বই কি আর কিছুই নাই ? সেই সুললিত, সুমধুর, সুঠাম, সর্বাঙ্গসুন্দর, সতেজ, হোমাগ্নিশিখার ন্যায় পূর্ণাবয়ব, স্বতঃ-উৎপন্ন, স্ফূর্তিবৎ কু-উ ধ্বনিতে কি বিষ থাকিতে পারে ? খলতাশূন্য, গ্লানিশূন্য, সরল বালক সমস্ত রাত্রি সুখের ঘুম ঘুমাইয়া, শেষ-নিশাতে দিবসের খেলার স্বপ্ন দেখিতেছে। গৃহপার্শ্বস্থ কাননে কোকিল কু-উ করিয়া উঠিল। বালক আহ্লাদে মাতিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া খেলা করিতে ছুটিল। কোকিল ডাকিয়াছে আর তাহাকে ধরে কে ? কোকিলের স্বরে বিষ কই ? কোকিলের স্বর তমসাচ্ছন্ন জগৎকে ফুটাইয়া দিল ; নিদ্রিত বিষাদমণ্ডিত দিঙ্মণ্ডলকে হাসাইয়া তুলিল ; সমস্ত শিরায় রক্তস্রোত ছুটাইয়া দিল ; সর্বশরীরে এক অপূর্ব আনন্দ-তড়িৎ হানিল। কোকিলে কু-উ ধ্বনি ঐন্দ্রজালিকের নিঃশ্বাস !

আবার বালককে ছাড়িয়া বাল-সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখ। তমসাবৃত সুদূর গগনপ্রান্ত ঈষৎ লাল রঙে রঞ্জিত হইয়াছে। অন্ধকারের প্রাণের ভিতর চোরের ন্যায় নিঃশব্দে এবং অলক্ষিতে একটু একটু করিয়া অস্পষ্ট আলোক প্রবেশ করিতেছে। এখানে ওখানে কোথায় কি যেন আস্তে আস্তে খুস্ খাস্ করিতেছে —ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন শূন্যে কোন একটা শব্দের নিস্তব্ধ রকম প্রতিধ্বনি শুনা গেল। যেন কানের কাছে একটা গাছের পাতা আস্তে আস্তে নড়িয়া উঠিল। যেন কোথায় কে রুদ্ধকণ্ঠে 'আব্', 'হাম্' এইরূপ একটা শব্দ করিল। নিদ্রিত মনুষ্য যেন গভীর সমুদ্রতল হইতে একটু একটু করিয়া উর্ধ্বে উঠিয়া সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসিয়া পড়িল—তাহার মুদ্রিত চক্ষের পল্লবের ভিতর একটু একটু আলো খেলা করিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটা ফুটিলো-ফুটিলো বোধ হইতেছে। এমন সময়ে যেন সমস্ত স্ফোটনোন্মুখী পৃথিবী-খানা কু-উ শব্দ করিয়া উঠিল,—আর একেবারে বনে পাখি পাখা ঝাড়া দিয়া উঠিল, গ্রামে মানুষ 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া উঠিল, পূর্বদিকে একটা প্রকাণ্ড রাঙা গোলা হুস্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, চারিদিক ফরসা হইয়া গেল। কালো কোকিল ব্রহ্মাণ্ডটাকে ফুটাইয়া দিল !

কোকিলের কু-উ স্বরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্ফোট একীভূত। সেই বিশাল স্ফোটের অপূর্ব সংগীত কোকিলের কালো কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়। জগতে যত কিছু অপূর্ব স্ফোট, অপূর্ব বিকাশ, অতুল উন্নতি আছে, সবই যেন কোকিলের অপূর্ব কু-উ ধ্বনি। প্রস্ফুটিত ফুল, প্রস্ফুটিত শিশু, প্রস্ফুটিত যুবা,—হোমরের

ইলিয়দ, কালিদাসের কুমার, সেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেথ, শেলীর স্কাইলার্ক, ফিদিয়সের যুপিতর,—বীরশ্রেষ্ঠ গর্দন, দয়াবতার হাউয়ার্ড, প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য, জ্ঞানোন্মত্ত শঙ্কর, ব্রহ্মাগুরূপী ব্যাস—সকলই এক এক অপূর্ব কু-উ ধ্বনি।

রসিকতা

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

এই বঙ্গদেশ রসিকতার সমুদ্রবিশেষ। পৌরাণিকেরা ক্ষীর লবণ প্রভৃতি সপ্ত সমুদ্রের বিবরণ লিখিয়াছেন। যদি তাঁহারা বঙ্গভূমির আধুনিক ইতিহাস দিব্য-নেত্রে পাঠ কবিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহাকে রস-সমুদ্র নাম দিয়া, পুরাণ-প্রসিদ্ধ ভূগোল-শাস্ত্রে সমুদ্রের সংখ্যা সাত না লিখিয়া আট লিখিতেন। জ্ঞানানন্দের অভিধানে বঙ্গের এক নাম দাস-নিবাস, আর এক নাম রস-বিলাস। কেন না, এদেশের সকলেরই ললাটপট্টে দাসত্বের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-রেখা এবং অধরে ও নয়নপ্রান্তে রসিকতার মধুরলাঞ্ছন, সকল সময়ে সমানরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পুত্রকন্যা কি ভ্রাতা ভগিনীর নাম রাখিতে হইবে,—বাঙালী তখনও রসিক। কারণ, পুত্রের নাম রসরাজ কি রসিকচন্দ্র, কন্যার নাম রসময়ী চৌধুরানী। ভ্রাতার নাম প্রাণনাথ দত্ত, কি রতিকান্ত রায়; ভগিনীর নাম অনঙ্গমঞ্জরী; নামে এইরূপ অসাধারণ রসিকতা পৃথিবীর আর কোন দেশে দৃষ্ট হইয়াছে?

দেশবিশেষের নামাবলী-পাঠ এক হিসাবে সেই দেশের প্রকৃতি পাঠ। বৃটনেরা জ্ঞানে গুণে, বৈজ্ঞানিকবলে এবং রাজনীতির কৌশলে আজিকালি সমস্ত সভ্যজগতে শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিলেও তাঁহারা কোনো একদিন যে গর্তে বাস করিতেন ও আম-মাংস ভালবাসিতেন, এবং এইক্ষণও তাঁহাদিগের বাস্তু-রাজ্যে ডারউইনের বিজ্ঞান-বিনোদিনী কল্পনা যে বিরাজ করিতে পারিতেছে, তাঁহাদিগের নামেই তাহার নিদর্শন। কারণ, যদিও তাঁহাদিগের মিল, মেকলে প্রভৃতি ঐতিহাসিকবর্গ পরকীয় জাতিচরিত ও সাহিত্যাদির সমালোচনায় ক্ষুরধারতীক্ষ্ণতা অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর পুরাণতম জাতিকেও অকুণ্ঠিত কণ্ঠে অসভ্য বলিয়া গালি দিতেছেন, এবং ভাষাতত্ত্বের ভাষ্যস্বরূপ দেবজনস্পৃহণীয় সংস্কৃত ভাষাকেও বিকটবুলি জ্ঞান করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে Fox (শৃগাল), Wolf (বৃক), Savage (বন্যবর্বর), Hogg (শূকর) ও Bad-cock (মন্দকুক্কুট) প্রভৃতি শ্রুতিমধুর ও মধুরার্থক নামসমূহ সাহিত্যে গ্রথিত ও

সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, এবং লোকে অদ্যাপি এই সকল নাম সাদরে গ্রহণ ও সসম্মানে ব্যবহার করিতেছে। স্বামী দিবসের পরিশ্রমের পর ক্লান্তকলেবরে গৃহে আসিতেছেন, গৃহলক্ষ্মী প্রেমভরে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছেন,—'হে শৃগাল, হে শৃগাল'। অথবা—'হে বৃক, হে বৃক'। পুনরপি বলিতেছি, কি মোহন ধ্বনি, কি মধুর! বঙ্গীয় কুলকামিনীরা ক্লান্তকলেবর কান্তকে 'হে শৃগাল', অথবা 'হে বৃক' বলিয়া সম্ভাষণ করেন না বটে, কেন না বাঙালী রসিক। কিন্তু রসিকতার অনুরোধে বাঙালীর নামাবলী যে মূর্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা পুরুষের শোভা পায় কি না এবং পুরুষের তাহাতে তৃপ্তিলাভ সম্ভব কি না, ইহা গভীর সন্দেহের বিষয়। অথবা ইহাতে সংশয় ও বিস্ময়ের কথা কি? যাঁহারা ভারত-উদ্ধারের জন্য আদ্ধার তালে গীত গাইতে পারেন, এবং তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া নাচনিচ্ছন্দের অশ্রাব্য কবিতায় জাতীয় হৃদয়ের মর্মনিহিত শোকবহ্নি উদ্গারণ করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বীরেন্দ্রকেশরী, সুরসিক ধুরন্ধর পুরুষদিগের নাম কামিনীকান্ত, যামিনীকান্ত, কুমুদিনীকান্ত ও বিনোদিনীকান্ত এবং রমণীমোহন ও সুন্দরীমোহন অথবা 'দলিতাঞ্জন পুঞ্জগঞ্জন' ও ভামিনীরঞ্জন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কবিসমাজের কীর্তিস্তম্ভ শেক্ষপীর কহিয়াছেন—

"নামে কি করে,
গোলাপ, যে নামে ডাক, সৌরভ বিতরে।"

আমরা অকবি, সুতরাং একথা আমরা মানিতে পারি না। আমাদিগের এই বিশ্বাস যে, নামে আর কিছু না করুক, উহা দেশীয় রুচি এবং সাময়িক প্রকৃতির অন্তস্থল পর্যন্ত প্রদর্শন করে। প্রাচীন আর্যবীরদিগের নাম ভরত, শত্রুঘ্ন, ভীষ্মার্জুন, বলদেব, বসুদেব, দুর্যোধন, ভীম; ঋষিদিগের নাম ব্যাস, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ;—শাস্ত্রকারদিগের নাম পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, কণাদ; এবং দেশস্থ সাধারণ ভদ্রলোকদিগের নাম শতানন্দ, শাকটায়ন। যখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি মাননীয় আর্যগণ বঙ্গে প্রথম সমাগত ও উপনিবিষ্ট হইলেন তখন এই বঙ্গেরই বাঙালীদিগের নাম শূরসেন ও বীরসেন, বিজয় ও বল্লাল এবং সেই সমাগত মহানুভবদিগের নাম দক্ষ, বেদগর্ভ, মকরন্দ ও বিরাট। তাহার পর যবন অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব সময়ে বঙ্গভূমি যখন অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন এবং সর্বথা অধোগতি প্রাপ্ত হইল, শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে ভাটা লাগিল, বিদ্যা-বুদ্ধি ও মহত্ত্বের গৌরব পরপাদুকা-লেহন জন্য নূতন গৌরবের

নিকট হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, তখন তাঁহাদিগের নাম হইল, আই, চাই, কচু, ঘেচু, বিক, কোক ইত্যাদি।* এইক্ষণ বহুদিনের পর বহুযুগের তপস্যার পর বিলাস-সমুদ্রে ভাসমান সুশিক্ষিত, সুসভ্য, সুরুচিসম্পন্ন বাঙালী বীরদিগের নাম হইয়াছে রমণী, কামিনী, মানিনী, ভামিনী, কুমুদিনী, বিনোদিনী, রাই-কিশোরী।† ইহার পর কোনোদিন হয়তো কোন এক সুরসিক বাঙালী ব্রজ-বিলাস যাত্রায় জয়দেবের গীত শুনিয়া আত্মজের নাম রাখিবেন,—"ললিত-লবঙ্গলতাবল্লভ" এবং অনুজের নাম রাখিবেন,—"প্রেমময়ী পদ-পঙ্কজ"। তিনকালের ত্রিবিধ রুচি, সুতরাং ত্রিবিধ নাম।

পূর্বে যেমন আমরা বাংলার ভারতউদ্ধাররত বীরভদ্রদিগের নামাবলী পাঠ করিয়াছি, যে সকল অমূল্য গ্রন্থের দ্বারা সেই ভারত উদ্ধার লাভ করিবে, পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা এস্থলে তাহারও দুই একটি নাম উল্লেখ করিতে পারি। বাঙালীর মস্তিষ্কসম্ভূত বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থমালার নাম চিন্তামণিদীধিতি, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, শব্দতত্ত্বকৌমুদী। এইক্ষণকার গ্রন্থ-সমূহের নাম--'হায় কি মজার শনিবার,' 'হায় কি রসের নূতন বাহার' ইত্যাদি। বঙ্গদেশ কাব্যের প্রিয়নিবাস, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রসসমূহের আকালিক উচ্ছ্বাসে এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একেবারে একসঙ্গে কবি হইয়া বসিয়াছে, এবং দুর্ভিক্ষ-দুঃখকাতরা ক্ষীণকলেবরা বঙ্গভূমি কাব্যের তটাভিঘাতী তরঙ্গতাড়নে এবং বঙ্গের কথার উৎপীড়নে অহোরাত্র থরথর কাঁপিতেছে। গ্রন্থকার চতুর্দশ বৎসরের বালক, শিক্ষকের গলগর্জনে বিদ্যালয়ে তাঁহার স্থান হইল না; গৃহিণী একাদশবর্ষীয়া বালিকা, শ্বশ্রূজনের নিষ্ঠুর গঞ্জনায় গার্হস্থ্যজীবনে তাঁহার চিত্ত রহিল না। অতএব উভয়ে মিলিয়া কবিতা লিখিলেন, 'হায় বৃথা আছি' অথবা 'হায় বৃথা কাঁদি'। অনুসন্ধান করিলে সপ্রমাণ হইবে যে, আধুনিক কবিতাপুঞ্জের অনেক কবিতাই এইরূপ রসলিপ্সু বালকবালিকার রসিকতার বিজৃম্ভণ।

* কুলাচার্যদিগের গ্রন্থে এইরূপ নামের অভাব নাই।

† এ-দেশের পুরুষদিগকে নামের সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে পুরুষেরা ইদানীং অনেকস্থলে এইরূপ সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হন; "অ' সুন্দরী! অ' বিনোদিনী!" আবার মেয়েরা মেয়ে-দিগকে ব্রজেন্দ্র ও সুরেন্দ্র বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কারণ, পুরুষের নাম সুন্দরীমোহন ও অবলার নাম ব্রজেন্দ্রকিশোরী কি সুরেন্দ্রবালা হইলে ইহা বই আর কিরূপে সম্বোধন হইতে পারে?

কেবল বালকবালিকারাই যে এই দোষে দোষী, এমন নহে। বৃদ্ধ এব বয়ঃপ্রাপ্ত তরুণদিগের মধ্যেও অনেকে এই রসবিকারের প্রবল স্রোতে পড়িয় ইদানীং হাবুডুবু খাইতেছেন। এদেশের একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অভিনব কবি আদিরসের কবিতা লিখিতে বড়ো ভালবাসেন। আদিরসের কবিত লিখিতে তাঁহার ক্ষমতাও আছে। ঐ প্রকার আদিরসের কবিতা নীতিবিগর্হিত বলিয়া অনেক সময়ে যার-পর-নাই অনিষ্টকর হইলেও ভাবের আবেগে এবং ভাষার পারিপাট্যে প্রায়শঃই পাঠকসমাজের একান্ত প্রীতিকর হইয়া থাকে। তিনি কবিতা লিখিয়াছেন,—'কেন দেখিলাম'। কবিতাটি সুন্দর ও সুখপাঠ এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তির লেখনীযোগ্য। অমন কবিতা ঠিক ঐরূপ উদ্দীপনী ভাষায় বাংলায় আর কেহ লিখিতে পারে কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁহার ছন্দানুবর্তনে ন্যূনতঃ একশত মস্তিষ্কশূন্য এবং শতাধিক রস-পরিচয়শূন্য অকর্মণ্য যুবা কবিতা লিখিয়াছেন,—'কেন চাহিলাম', 'কেন চাহিলে', 'কেন নাচিল নয়ন', 'কেন ঝাঁপিলে বদন'। এইভাবে যেন তেন প্রকারে অদ্যাপি অনন্তকোটি 'কেন' বাংলায় লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচলিত হইতেছে। এই 'কেন' এইরূপ রসিকতার রাজ্য ছাড়িয়া আর যে যায়, এমন ভরসা কি?

যে সময়ে যুবরাজ এদেশে পদার্পণ করিলেন, প্রফুল্ল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় আনন্দ-লহরী বিকিরণ করিয়া ভারতে ভারতসাম্রাজ্য সংস্থাপনের জন্য উপনীত হইলেন, তখন এদেশের কাব্যকণ্ঠে ভয়ানক এক কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল। যেই দুই তিনটি প্রকৃত কবি জাতীয় সম্মান রক্ষার অভিলাষে কবিতায় যুবরাজকে সম্ভাষণ করিলেন, অমনি কবিতার ককার-বোধ-বিরহিত সহস্র যুবা, যেন কি এক রসাবেশে আবিষ্ট হইয়া যুবরাজকে কবিতায় অঞ্চলের ধন, শ্বেতরতন বলিয়া চতুর্দিক হইতে সমস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। লোকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিল—ইহা কি? বঙ্গভূমির বাৎসল্যরস সহসা এইরূপ উছলিয়া উঠিল কেন? কিন্তু যেহেতু শুধু এক বাৎসল্যরসেই কবিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন হয় না এই নিমিত্ত বঙ্গের এক বয়োবৃদ্ধ পুরাতন কবি বঙ্গভূমিতে দর্প-সহকারে প্রবেশ করিয়া কবিতায় বর্ণনা করিলেন যে, ভারতমাতা জরতী হইলেও আজি রসভাবের উচ্ছলিত প্রবাহে পুনরায় যুবতী হইয়াছেন, এবং যৌবনের শোভা দেখাইয়া,—কেশে ফুল, কর্ণে দুল এবং কপোলে চূর্ণকুন্তল দুলাইয়া মদনমোহন নৃপনন্দনকে প্রেমভরে আহ্বান করিতেছেন,—অতএব যুবরাজ সানন্দে আসিয়া সমাগত হউন। এই কবিতা আমাদিগের কল্পিত প্রলাপ

নহে। ইহা লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত, ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং সহৃদয় পাঠকবর্গ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা রসের কথা। পঞ্চবিংশতি কোটি মনুষ্যের দগ্ধপ্রাণ ভারতমাতা বলিয়া যাঁহার নাম করিতেছে দেশে-বিদেশে শাস্ত্রার্থদর্শী সুধীপুরুষেরা যাঁহাকে সভ্যতা ও সামাজিক নীতির আদিজননী, পরমার্থতত্ত্বের রত্নখনি এবং সকল ভাষার ভাষা-প্রসবিনী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই আর্যাশ্রুপ্রবাহরূপা নর্মদা ও ভাগীরথীর পবিত্র-বারিবিধৌতা ভারতভূমিকে চটুলনয়না নবীন নায়িকা সাজাইয়া, তাঁহাকে রাজবেশে বিভূষিত নবীন নায়কের সঙ্গে সম্মিলিত করা সামান্য কবিত্বশক্তি এবং সামান্য রসিকতার পরিচয় নহে।

গগন-পটো

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

গগন-পটোকে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ; পথে ঘাটে দাঁড়াইয়া কতবার দেখিয়া থাকিবে। কিন্তু তোমরা সকলে তাহার গুণাগুণ জানো না, তাই আমাদিগকে আজ তোমাদের কাছে সেই পরিচিতের পরিচয় দিতে হইতেছে।

কারিগর লোক প্রায়ই একটু খামখেয়ালি হয়; কেহ বদ্ মেজাজের উপর খামখেয়ালি, আর কেহ বা রসখেপার উপর খামখেয়ালি। কিন্তু গগন-পটোর মত খামখেয়ালি রসখেপা লোক আর দুনিয়ায় নাই। সে কখনও কাহারও ফরমাস মত চিত্র করে না। আপনার মনে আপনার ঝোঁকে নিয়তই আঁকিতেছে, আর পুঁচিতেছে; কিন্তু যখন যেটা দাঁড় করাইবে, সেটা একেবারে চূড়ান্ত। যেমন রং তার তেমনি 'শেড্'; যেমন ভাব-ভঙ্গি, তেমনি অঙ্গ-সৌষ্ঠব! তাহাতেই বলিতেছিলাম, গগন-পটো খামখেয়ালি বটে, কিন্তু মস্ত কারিগর।

তবে গগনের অনেক সময় সময়-অসময়-বোধ নাই। প্রথম আলাপে সেই জন্য গগনের উপর বড়োই বিরক্ত হইতে হয়; কিন্তু তাহার পর ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝা যায়, লোকটা অসাময়িক হইলেও বদ্‌রসিক নহে; রসখেপা বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে লুকানো ছাপানো সহৃদয়তা বিলক্ষণ আছে। তবে সহিষ্ণুতা না থাকিলে, ঘনিষ্ঠতা না হইলে তাহার সেই ভাবটুকু কিন্তু বুঝিয়া উঠা ভার।

তুমি স্বজনের সদ্যোনাশে শোকে জর্জর, সংসার আঁধার দেখিতেছ, থাকিয়া থাকিয়া তলদেশে মেদিনী ঘুরিতেছে, বাতাসে হুহু করিয়া সেই স্বজনের নাম ধ্বনিত হইতেছে, বুকের ভিতর বামদিকে কে যেন কীলক পুঁতিয়া দিয়াছে,—ঘোরতর বিষাদে তুমি অবসন্ন হইয়াছ। আকুলস্বরা কুলকুলনাদিনী কল্লোলিনীর তীরে তুমি অবসাদে উপবিষ্ট হইয়া আছ। দূরে গগন-পটোর চিত্রপটে তোমার দৃষ্টি পড়িল। সে যেন তোমাকেই ভুলাইবে বলিয়া রং ফলাইয়া বসিয়াছিল; তুমি চাহিবা মাত্রই অমনই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার পটে আঁকিতে বসিয়া গেল। শোকগম্ভীর হৃদয় সহজেই এক-মনস্ক হয়,—তুমি একমনে সেই অপূর্ব চিত্র

দেখিতে লাগিলে। তোমার সেই স্বজনের সৌম্যমূর্তিই বা আঁকিবে। কিন্তু তা তো নয়।—ভীষণ-দংষ্ট্র একটা ভীষণ ব্যাঘ্র তাহাকে যেন কামড়াইয়া রহিয়াছে। তোমার বোধ হইল, সেই ব্যাঘ্র-দষ্ট ব্যক্তিই যেন তোমার স্বজন। তোমার বুকের শেল কে যেন নাড়িয়া দিল, তোমার মর্ম-জ্বালা হইল,—গগন-চিত্রকরকে মহানিষ্ঠুর স্থির করিয়া মহাবিরক্ত হইলে।

তুমি মুখ ফিরাইবে, এমন সময় চকিতের মধ্যে দেখিলে যে, চিত্রপটে আর সে ভয়ানক ব্যাঘ্র নাই, তোমার সেই ভূপাতিত বন্ধু সৌম্যমূর্তিতে গগনের পট শোভা করিতেছেন, আর একখানি সুন্দর হস্ত যেন তাঁহাকে আস্তে আস্তে কোথায় মন্দ মন্দ লইয়া যাইতেছে। তোমার প্রাণ যেন একটু শীতল হইল, তুমি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে ; ভাবিলে গগন-পটো খেপা হউক, আর যাই হউক—মনের কথা বুঝিতে পারে,—পোড়া মন একটু শীতল করিতে পারে। মনে যদি একবার ধারণা হয় যে, লোকটা সহৃদয় এবং তোমার ব্যথার ব্যথী, তাহা হইলেই তাহাকে ভালবাসিতে হয়। আর হৃদয় যখন শোকে তাপে গম্ভীর, তখন সেই ভালবাসাও এক দিনে—এক মুহূর্তে প্রগাঢ় হইয়া পড়ে। তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিলে যে, গগন তোমার ব্যথার ব্যথী, অমনই যেন তাহার উপর তোমার একটু ভালবাসা জন্মিল। তুমি নদীতীরস্থ শষ্প-শয্যায় শায়িত হইয়া একমনে, স্থিরনয়নে গগনের খাম্‌খেয়ালির কারিগরি পর্যালোচনা করিতে লাগিলে।

গগন আঁকিল—একটা বৃহৎ কুম্ভীর, সূচল মুখ, কর্কশ গাত্র, কণ্টকিত লাঙ্গুল, কপিশ বর্ণ, ভয়ংকর ভঙ্গি—সব ঠিক্‌ঠাক্ হুবহু,—যেন অগাধ নীল জলে সাঁতার দিতেছে। হঠাৎ কুম্ভীর দ্বিখণ্ডীকৃত হইল, গায়ের কাঁটাগুলি তুলার মত ফুলো ফুলো হইল, মুখ-কোণ সংযত হইল, রংটা একটু ঘোলা ঘোলা হইল। পরক্ষণেই দেখ, দুইটি নিরীহ মেষ পাশাপশি ঘেঁষাঘেঁষি সেই নীল প্রান্তরে শনৈঃ শনৈঃ বিচরণ করিতেছে। তুমি ভাবিতেছ, ভয়ংকর কুম্ভীর যমজ মেষশিশু হইল ; ভাবিতে না ভাবিতেই সে চিত্র নাই। সেই মেষদ্বয়ের স্থলে বিচিত্র বর্ণের বৃহৎ এক সদণ্ড পতাকা, খর খর বাতাসে যেন ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে। স্বজন-বিয়োগ-চিন্তা তোমার মন হইতে ক্ষণেকের তরে অন্তর্হিত হইল। বিষম রসখেপা গগন তোমাকে আপনার পাগলামির কীর্তি দেখাইয়া তোমাকে হাসাইল। তোমার সেই মলিন ম্লান মুখের অধরপ্রান্তে সেই অন্তরের হাসি ঈষৎ দেখা দিল। তুমি অন্তরে বলিলে, পাগলা পটোর ভিতরের কথাটা ঠিক—সংসারের সকলই ত

এইরূপ পরিবর্তনশীল, তা ঐ কেবল স্থাবর চিত্র আঁকিবে কেন?

এই চিন্তায় তুমি অন্যমনস্ক হইয়াছিলে,—দেখিলে সে বিচিত্র নিশান আর নাই,—মৃদু আভায় একটি স্থির চিতা যেন ধীরিধীরি জ্বলিতেছে। সেই চিতার মধ্যে অস্পষ্ট অবয়বে তোমার সেই স্বজনের শবমূর্তি। শবদেহ কিন্তু নিষ্প্রভ নহে,—সূর্যাস্ত-কালের পূর্বদিকের পাতলা মেঘের উপর ক্ষীণ রামধনুর ন্যায় একটু হাসি যেন সেই মুখ-প্রান্তে দেখা দিতেছে, চক্ষুর্দ্বয়ের প্রশান্ত শীতল জ্যোতিঃ গগনের চিত্রান্তরে যেন স্থাপিত রহিয়াছে। সে চিত্র গগনের আর এক অপূর্ব কীর্তি। স্বর্ণময়ী একটি দিব্যাঙ্গনা সতী-স্বভাব-সুলভ লজ্জায়, অথচ প্রৌঢ়া-প্রোষিতভর্তৃকার স্বামি-সমাগমের আগ্রহে এবং বনশোভিনী সদ্যঃ-কুসুমিতা বসন্তলতার প্রফুল্লতা-ভরে সেই চিতার সজীব, সহাস্য শব-দেহটিকে সুকোমল হস্ত-প্রসারণে আহ্বান করিতেছেন। সেই কাঞ্চনময়ী দিব্য মূর্তিতে তুমি তোমার বন্ধুর মৃতা পত্নীর মুখশ্রী লক্ষ্য করিলে;—সেইরূপ পুরু পুরু জোড়া ভ্রূ—যেন তেমনই করিয়াই নীচের দিকে নামানো আছে, সেই স্থির নয়নে যেন তেমনই করিয়াই জ্যোৎস্না মাখানো আছে।

উপর স্তরে দিব্যাঙ্গনা ভাসিয়া ভাসিয়া নিম্নস্তরের চিতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নিম্নস্তরের চিতাও শবদেহ লইয়া দিব্যাঙ্গনার দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল,—কাছাকাছি হইল, তোমার চক্ষুতে জল আসিল; চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলে সে সব আর কিছু নাই,—গগন-পটো নীল পটের এখানে সেখানে কেবল কাঁচা সোনার স্তবক আঁটিতেছে। আর তাহাতে জরদ, ধূমল, পাংশু কত বিচিত্র রঙের শেড্ দিতেছে। তুমি উঠিয়া বসিলে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে, এবার মুখ ফুটিয়া বলিয়া উঠিলে,—"গগন সকলকেই জানে,—সকলকেই চেনে; আমরা কিন্তু উহাকে কেহই চিনিতে পারিলাম না। দেখ, আমাদের সকল সংবাদই রাখে, আমরা কিন্তু উহার কিছুই জানি না।"

গগনের কার্যসাধন হইয়াছে। তাহার সহিত একবার ঘনিষ্ঠতা করিলেই সে তাহার অস্থাবর পট দেখাইয়া তোমার কিছু-না-কিছু ভাল করিবেই। হয় তোমার কবাট খুলিয়া দিবে, নয় তোমার শোকে সান্ত্বনা করিবে। কখনো হয়তো তোমার আনন্দের সংবর্ধনা করিবে, আবার কখনো হয়তো তোমাকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিবে। আজ সে তোমার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিয়াছে, তোমার মাথা হাল্‌কা হইয়াছে বটে,—এখন আর ঘুরিতেছে না; বাতাস এখনও হুহু করিতেছে—এখনও পিলুরাগিণীতে ভরিয়া আছে, কিন্তু

এখন তো আর তোমার বন্ধুর নাম করিয়া কাঁদিতেছে না। বুকে এখনও শেল বিঁধিয়া আছে বটে, কিন্তু তেমন করিয়া আর তো কেহ তাহাকে মোচড় দিতেছে না। গগনের কার্যসমাধা হইয়াছে। গগন তোমার শোকবহ্নির প্রখরতা নষ্ট করিয়াছে। তুমি এবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া দেখিলে, পশ্চিমের দিক্‌চক্রবাল ব্যাপিয়া ঘন সন্নিবেশিত শাল-বিটপাচ্ছাদিত পর্বতবেদীর উপর জ্বলন্ত কাঞ্চনরাগে এক অপূর্ব প্রতিমা দীপ্তি পাইতেছে। গগন-পটোর সেই এক প্রিয় প্রতিমা। মাস মাস ধরিয়া প্রত্যহই আঁকে, আর প্রত্যহই পুঁছিয়া ফেলে,—বিরক্তিও নাই তৃপ্তিও নাই।

ঐ প্রতিমা একখানি আশ্চর্য ছবি। গগন-পটো প্রায়ই প্রত্যহ আঁকে, আর আমরাও তো প্রায়ই প্রত্যহ দেখি, তবু নিত্যই নূতন। পুরাণের পুরাণ মহা-পুরাণকে নূতন করিয়া দেখাইতে গগন-পটো যেমন পটু, এমন আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু কেবল তাই বলিয়া যে পশ্চিমের প্রতিমা আশ্চর্য ছবি, তাহা নহে। ও এক আজগুবি কাণ্ড।—মুখ নাই অথচ দেখ কেমন হাসিতেছে। চোখ নাই, ভ্রূ নাই—তবু দেখ কেমন চোখ রাঙাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া রহিয়াছে। আর আশ্চর্যের আশ্চর্য—ঐ মধুর হাসিতে আর ঐ ভীষণ ভ্রূকুটিতে দেখ দেখি কেমন মাখামাখি, কেমন মেশামিশি। পৌরাণিকী অন্ধকারময়ী কালীমূর্তিতে একবার প্রসন্নাং স্মিতাননাং করালবদনাং দেখিয়াছ, আর একবার গগন-পটোর ঐ জ্বলন্ত চিত্রে ললিতে-ভৈরবে, কোমলে-ভীষণে অপূর্ব মিলন দেখ। ঐ দেখ কেমন অপূর্ব হাসি! ঢল ঢল তপ্ত কাঞ্চনসাগরে যেন অমৃতের লহরী উঠিল। ঐ দেখ কেমন রাগ! ব্রহ্ম-কোপানলে যেন খাণ্ডব-দাহ হইবে। ঐ দেখ নিঃশব্দ, তবু যেন তোমাকে স্বর্গের বার্তা ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিতেছে। চক্ষু নাই, তবু যেন তোমার মনের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। আর দেখ, নিশ্চল, সুস্থির—তথাপি যেন হাত তুলিয়া তোমাকে অভয়-দান করিতেছে, আশীর্বাদ করিতেছে। আইস, আমরা প্রণত হই। সঙ্গে সঙ্গে মহাশিল্পী গগন-চিত্রকরকে নমস্কার করি এবং তাহার ওস্তাদকে একবার দেখাইবার জন্য তাহার কাছে প্রার্থনা করি।

গগন-দাদা! তোমার খেপামিতে ক্ষান্ত দিয়া একবার আমাদের গুটিকত কথা শুন। গঙ্গার উপর তোমার প্রভাতছবি, পর্বত-পৃষ্ঠে তোমার এই সন্ধ্যার প্রতিমা, প্রাবৃটের সেই ঘনকৃষ্ণ সিংহাসন, নিদাঘের সেই রৌদ্রমূর্তি—ও সকল কারিগরি তোমার অনেকবার দেখিয়াছি। তোমার বিচিত্র পট দেখিয়া অনেক-বার জ্বলিয়াছি, পুড়িয়াছি, হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি; কিন্তু ঐ সকল বিচিত্র চিত্রে

আত্মহারা হই বটে, অথচ পরমার্থ পাই না, তুষ্টি হইলেও তৃপ্তি হয় না। না দাদা, আর খেপামি করিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। তোমার এইসকল ছায়াময়ী প্রতিমার অন্তরস্থ প্রতিমা আমাকে সেই সে দিনের মতো আর একবার দেখাও। তোমার সেই বিষম ভেল্কি আর একবার ভাঙিয়া দাও। এই ছায়া-বাজির ছায়া-পট একবার ক্ষণ-মুহূর্ত-জন্য সরাইয়া দাও।—আমি আর একবার তোমার সেই নীল, নীল, অতি নীল বাজিঘরের অভ্যন্তরস্থ তোমার ওস্তাদকে প্রাণ ভরিয়া দেখি। সে দিন তুমি দেখাইলে বটে, কিন্তু আমি যে কি দেখিলাম, তাহার কিছুই বুঝিলাম না। কোমলের কোমল অতি কোমল বংশীরবে আমার মোহ হইল; নীলমধ্যে অতি নীল দেখিতেছিলাম, সমস্ত জগৎ নীল আভায় প্রতিভাত হইল—আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর তুমি তোমার ছায়াপটে তুলারাশি ছড়াইয়া হাসিতে লাগিলে। না দাদা। তোমার পায়ে পড়ি, এবার আর ও সময়ে খেপামি করিও না; ভালো করিয়া তোমার ওস্তাদকে একবার দেখাও।

মোটা রসিকের প্রবন্ধ

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনাকে ভালোবাসা, আপনাকে বড়ো মনে করা, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া ঘোষের ঝি নিজের গরুর দুধকে দুধ বলিলে তাহা যে দুধ না হইয়া জলই হইবে, তাহার কোনও মানে নাই। যাহা সত্য, তাহা তুমি বলিলেও সত্য, না বলিলেও সত্য ; তবে কেহ বিচার করিয়া দেখিতে চাহিলে অবশ্যই তাহার বিচার করিবার অধিকার আছে। এ মুখবন্ধটুকুর তাৎপর্য ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মোটা না হইলে মানুষ রসিক হইতে পারে না। যাহারা রোগা, সরু, খিটখিটে বা পাতলা, তাহারা দুষ্ট হইতে পারে, পাজি হইতে পারে, কিন্তু রসিক হইতে পারে না। মোটা লোক দেখিলে, ইহার ভোঁদা বলে, হাঁদা বলে, গোবরগণেশ বলে—বলুক, তাহাতে মোটা মানুষের রসিকত্বই প্রতিপন্ন হয়, তাহাদের নিজের রসিকতার প্রমাণ হয় না। আগুন আপনি গরম, যে আগুনের কাছে যায়, সেও গরম হয়। মোটাদের বেলাও তাই ; মোটা আপনি রসিক, আর মোটার সংস্পর্শে যে আইসে, সেও তখন রসিক হইয়া ওঠে। রসের আধার মোটা, যে নীরস সেই শুষ্ক।

আমি নিজে কিঞ্চিৎ মোটা, আমার পেটের বেড় পৌনে চারি হাতের বেশি নয় ; তথাপি আমি রসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, একবারও দেখিলাম না যে, আমার দরজী আমার কাপড়ের মাপ নিতে আসিয়া না হাসিয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু আমি রসিক বলিয়াই যে মোটা মানুষ মাত্রেই রসিক কিংবা আমি মোটা বলিয়াই যে রসিক লোক হইলেই মোটা হইবে, তাহা বলিতেছি না। হইতে পারে আমার বেলায় এটা একটা দৈব সমাবেশ মাত্র, এবং এই সমাবেশ জন্য আমার এই স্বজাতি পক্ষপাত জন্মিয়া আমাকে অন্ধ করিয়াছে। কিন্তু যখন ইহার যুক্তি ও কারণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, তখন মোটার রসিকতা যে প্রাকৃতিক সাধারণ তত্ত্ব এবং স্থূল বিশেষের সমাবেশ নহে—ইহা কেন করিয়া না বলিব ?

স্মরণ করিয়া দেখো মোটা লোকে একটা কথা বলে, সহজে কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে না ; তাহার পর মনে করো, বিদ্রূপের শাসন হইতে গুরুতর শাসন নাই, রসিকতার আশঙ্কা অপেক্ষা বেশি ভয়ানক আশঙ্কা নাই। এই দুই কথা একত্র করিয়া বলো দেখি, কি দাঁড়াইলো ? মোটা লোকের সম্মান বেশি, আদর বেশি, মর্যাদা বেশি, ধন বেশি—কি নয় ? ভালো বস্ত্র, দামী জিনিস হইলেই তাহা একটু দুর্লভ হয় ; মোটা মানুষও দুর্লভ, এক স্থান হইতে অন্যস্থানে মোটা মানুষের আমদানি রপ্তানি করিতেও সময় বেশি চাই, বন্দোবস্ত পাকা গোছের হওয়া চাই। ইহাতে কি প্রতিপন্ন হয় না, যে মোটা মানুষ দামী, রসিকতা দামী, অতএব মোটা মানুষ রসিক।

জল হইতে রসের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক ; চপলতা হইতে রসিকতারও তাই, এবং বাঁদরামি হইতে মনুষ্যত্ব অধিক। বাঁদর বেশি মোটা না মানুষ বেশি মোটা ? আধেয়ের গৌরব থাকিলে আধারেরও গৌরব জানিতে হইবে, রসিক মানুষকে মোটা হইতে হইবে। সামান্য তৃণে যত দিন রস থাকে, ততদিন তাহা কাব্যের বস্তু, সৌন্দর্যের আধার ইত্যাদি ; তৃণ যখন শুষ্ক নীরস, লঘু, তখন উপহাসের বস্তু। মোটা-ই রসিক।

শুদ্ধ ধারে সকল বস্তু কাটা যায় না, শুধু ভারে সবই কাটা যায়, নিতান্ত পক্ষে থেঁতো করা যায়। যাহার রস আছে তাহার ভার আসে, রস আর ভার থাকিলেই মোটা। বৈষ্ণবদের গ্রন্থে যত রস আছে, তত আর কোথাও নাই ; বৈষ্ণবদের গোঁসাইরা যেমন মোটা, তেমন মোটাও ভূভারতে নাই ; শুদ্ধ রস আছে বলিয়াই তো ? রসিকের আর এক নাম রসগ্রাহী : আয়তন না থাকিলে কি গ্রহণ করা যায় ; বাস্তবিক মোটা না হইলে মোটা রসিক হইতেই পারে না।

চটুল চরণে চুটকি পরিয়া খেমটাওয়ালী নাচে, তাতে যদি রসিকতা ভরপুর হইত, তাহা হইলে মোটা মোটা দর্শককে আদর করিয়া আসরের সম্মুখে সকলের আগে বসাইয়া দিবার নিয়ম হইত না। মোটারাই সে প্রশস্ত আসরের ভারকেন্দ্র, সেই রস-জগতের সূর্য, সেই রস-কুরুক্ষেত্রের কুরুপাণ্ডব।

উপর্যুপরি কয়েকবার আবরণ বাদ দিয়া বিলক্ষণ মনোনিবেশপূর্বক পঞ্চানন্দের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। ইহার মধ্যে যে একটুকুও সরল স্থান নাই, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, ইহাতে

মোটা বুদ্ধির অভাব আছে। পাতলা বুদ্ধিতে কুলাইবে না, ইহাও আমার বিশ্বাস। কার্যটা বড়ো সামান্য নয়, গুরুতর কার্যে গুরুতর বুদ্ধিরও প্রয়োজন—আমার এই উপদেশটা গ্রহণ করিলে সুখের বিষয় হয়।*

* গ্রহণ করিয়া দরকার কি? মোটা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াই পঞ্চানন্দ আপ্যায়িত হইয়াছেন; নিত্য নিত্য এইরূপ পাইলে পঞ্চানন্দ সুচতুর লেখককে দেবতাদের মধ্যে আসন দিতে প্রস্তুত আছেন। এ প্রকার 'মোটা বুদ্ধি' দুর্লভ পদার্থ।

ন্যাসপাতি ও নবন্যাস

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

ফলে ন্যাসপাতি ও সাহিত্যে নবন্যাস, উভয়ই প্রায় একরূপ বলিয়া মালুম হয়। অধিক দূর 'উপমেয় উপমান' টানিয়া একটা উদ্ভট কাণ্ড করিতে চাহি না, ন্যাসপাতি খাইয়া ও নবন্যাস পড়িয়া যাহা বোধ হয়, তাহাই বলিলাম। মিষ্টান্ন, জলীয়, জ্বরের মুখে মুখরোচক, চিবাইতে ও চুষিতে ভালো;—ন্যাসপাতি চাটনীতে চলে। ন্যাসপতি আহারকালে উপাদেয়, কিন্তু আসল আহার্য নয়; নিছক ন্যাসপাতি খাইয়া মানুষ বাঁচে না; নয় কাহন ন্যাসপাতি চিবাইলেও ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না; কেবল দাঁত টকিয়া যায়।

নবন্যাসে ন্যাসপতির সব কয়টি গুণই বিদ্যমান;—মধুর, মোলায়েম, জলে ও অম্লে ভরা, নবন্যাস অধ্যয়নে উপাদেয়, কিন্তু আহার্য নয়, উহা মুখরোচক, আবার অল্পবিস্তর উত্তেজক। ন্যাসপাতি আহারের অপেক্ষা পানের অধিকতর মুখপ্রিয় 'পরম রমণীয়' চাট; নবন্যাসে 'নিমকি-গোছের' নেশা হয়। জ্বর-বেতার-জিহ্ব পীড়িত জনের নিকট ন্যাসপাতির নেহাত আদর; যৌবন-জোয়ারের ভরন্ত গাঙে ভাসন্ত-তরী ও উড়ন্ত-পাল যুবক-যুবতীর কাছে নবন্যাস 'নির্বাণ-মুক্তি'। ন্যাসপাতিতে রসের ন্যায় কষও আছে; নবন্যাসে 'রস-কষ' অবশ্য দুই-ই আছে। এদের উভয়েরই মধ্যে সার না থাকুক, শাঁস পর্যাপ্ত পরিমাণেই আছে; কিন্তু সে শাঁস খাইবার নয়, চিবাইয়া ও চুষিয়া ফেলিবার। শাঁস আছে, আঁশও আছে; কিন্তু আঁটি বড়-একটা নাই; যদি একটু থাকে, তাহা আঁশেরই একটা জটিল 'জড়িবুটি'।

ন্যাসপাতি যখন একটা ফল, তখন অবশ্যই তাহার প্রয়োজন আছে; নবন্যাস যখন সাহিত্যের অন্তর্গত, তখন নিশ্চয়ই তাহা প্রয়োজনীয়। তার প্রয়োজন প্রয়োজন হইলেও প্রয়োজনমাত্রেরই পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে, নির্দিষ্ট থাকা চাই। ন্যাসপাতি নিত্যপ্রয়োজনীয় নয়, উহার সাময়িক আবশ্যকতা। নব-ন্যাসেরও তাই। ন্যাসপাতি চিবাইয়া ও চুষিয়া ফেলো, কিন্তু গিলিও না। নব-ন্যাস পড়িবে, পড়ো; কিন্তু তাহাতে পড়িও না। আত্মস্থ ও অনাসক্ত থাকিয়া

উহা উপভোগ করিতে পায়, কিন্তু আত্মবিস্মৃত ও আসক্ত হইলেই বিপন্ন হইবে। মুখপ্রিয় পদার্থমাত্রেরই আকর্ষণ বড়ো বেশী, কিন্তু তাহাতে অতিরিক্ত আসক্তি অনাসক্তিই ঘটায়। ন্যাসপাতির মুখপ্রিয়তার মতো নবন্যাসের মনোজ্ঞতা আছে ; কিন্তু একের অতিরিক্ত যেমন উদর বিগড়ায়, অপরের অনিয়মিত অধ্যয়নে তেমনই মস্তিষ্ক মারা পড়ে।

নবন্যাসের নানারূপ ব্যাখ্যা। নবন্যাসের শিল্পনৈপুণ্য নিশ্চয়ই উচ্চ দরের। কিন্তু ন্যাসপাতি প্রস্তুত করিতেও প্রকৃতিদেবীর প্রচুর শিল্পনৈপুণ্য লাগিয়াছে। তবুও ন্যাসপাতি ন্যাসপাতি বই আর কিছুই নহে। নবন্যাসের বিশ্লেষক তাহাতে বিবিধ বৈচিত্র্য দেখাইতে পারেন ; তাহার অণু-পরমাণুর ভিতর হইতে এক-একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাহির করিতে পারেন ; নবন্যাসিক নিজে যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, সমালোচক তাহা 'সরেজমিনে' খাড়া করিতে পারেন ; এ সবই সত্য। এ সবই আবার শিল্পনৈপুণ্য। শিল্পীর শিল্প, যে পক্ষেই হউক, সর্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু কেবল শিল্পনৈপুণ্যে আর তাহার প্রশংসায় প্রকৃত সংসার চলে না, জীবন-যুদ্ধোপযোগী শিক্ষা, মনুষ্যত্ব-গঠনোপযোগী শিক্ষা হওয়া সম্ভবে না।

হইতে পারে, নবন্যাস কোনও কালে পূর্ণতায় পৌঁছিবে ; অথবা কোনো কোনো স্থলে প্রায় পৌঁছিয়াছে। কিন্তু সাধারণত নবন্যাস নিঙ্‌ড়াইয়া প্রধান-কল্পে কি পাওয়া যায় ?

পাওয়া যায় রমণী-হৃদয়। রমণী-হৃদয় নিশ্চয়ই অতি উত্তম পদার্থ। কিন্তু কেবল হৃদয়ই রমণীর যথাসর্বস্ব নয়। পরন্তু নবন্যাসে অখণ্ডভাবে রমণী-হৃদয়ের সবখানিও পাওয়া যায় না ; পাওয়া যায় কেবল সেই অংশটি, যে অংশটি দিয়া প্রেম করিতে হয়। রমণী-হৃদয়ের এই অংশ নবন্যাসের অধিনায়ক, উপপাদ্য ও একান্ত বিষয়ীভূত। তা এখনকার ইংরেজী বা ফরাসী নবেলই হউক, আর বাংলা নবন্যাসই হউক, রোমান্টিক বা রিয়ালিস্টিক নবেলই হউক। মনো-বিজ্ঞানের যতই বড়াই কর, আর মানব-প্রকৃতিবাদের যতই লড়াই কর,—তোমার অসীম লম্বাই-চৌড়াই ও গাম্ভীর্য সত্ত্বেও উহা প্রেমের অভিনয় বই আর কিছুই নয়। আর সেই পিরীতই বা কী ? প্রণয়, প্রেম, পরশমণি, ভালোবাসা, পূত, পবিত্র, উচ্চ, উত্তম। কিন্তু তাহাকে যত উচ্চেই উঠাও, আর তাহাতে যত পবিত্রতাই মিশাও,—তাহা সর্বথা শারীরিক,—শরীরের সহিত মনের যতটা সম্বন্ধ, তাহা (উপন্যাস অত্যুৎকৃষ্ট হইলে) সেই পরিমাণে মানসিক ; তাহা মোটের উপর যুবক-যুবতীর দৈহিক সম্বন্ধের স্বপ্ন, সোপান, সাধ, সোহাগ বা

আকাঙ্ক্ষা, এবং উত্তেজনা ;—তাহা পরেও নহে,—পরিণয়ের পূর্বেই প্রেম করা। কিন্তু কেবল প্রেম ও পরিণয়ে মনুষ্য-জীবনের সব লেঠা চুকিয়া যায় না, লেঠা সবে আরম্ভ হয়। অথচ নবন্যাসের কথা সেইখানেই শেষ। প্রথমত, প্রণয় ; তাহার পর পরিণয় ; বস! নিশ্চিন্ত। কিন্তু প্রণয় ও পরিণয় ব্যতীত প্রকৃত জীবনে আরও অসংখ্য ব্যাপার আছে, তাহা নবেলিস্টের নিকট অতি সাধারণ, অতএব উপেক্ষিত। কর্তব্যনিষ্ঠা, সংযম, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ, ব্রত, নিয়ম, বিনয়, নম্রতা, দৃঢ়তা, দয়া-দাক্ষিণ্য, সম্ভ্রম-জ্ঞান, এ সবই নবন্যাসিকের হিসাবে, রমণী-জীবনে অতি তুচ্ছ, সাধারণ ; সুতরাং সহজসাধ্য, তৃণাপেক্ষাও লঘু। নবেলী নায়ক-নায়িকার যাহা কিছু কঠোর কর্তব্য ও জীবনের কার্য, তাহা ভালোবাসা (সেকসুয়াল লাভ) ও তাহার আনুষঙ্গিক ভাব, আর ভাবুকতা। বিদেশীয়, বিজাতীয় ও বীভৎস ভাবে ভোর হইয়া, দু-দশ বার 'হরিবোল' দিলে, বা 'গৌরাঙ্গ' 'গৌরাঙ্গ' বলিলেই কিস্তি মাত। কোনও কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই। নবেল হিন্দুপন্থী। ঔপন্যাসিক আর্যভাবে ভোরপুর। আমরা এ আর্যামিকে অবজ্ঞা করি। এরূপ হুজুগে হিঁদুয়ানি আমরা চাই না। ইহা প্রবঞ্চনার নামান্তর, নহে তো খাঁটি প্রবঞ্চনা, কিন্তু ইহাও তবু আধুনিক নবন্যাসের নির্মল ও উৎকৃষ্ট অংশ। অধিকতর অপকৃষ্ট অংশের কথা আজ আর কিছু বলিলাম না।

তৈল

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

তৈল যে কি পদার্থ তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ—বাস্তবিক স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ, আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ করো অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি ? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে !

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমানরূপ স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান, যাহা বলের অসাধ্য যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্বশক্তিমান, তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না—উকিলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না—বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোনো কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে, আহাম্মুক হইলেও মাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গভর্নর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ, তৈল নহিলে জগতের কোন কার্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। তৈল থাকিলে তাহার কিছুই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে

স্নিগ্ধ করি তাহার নাম প্রণয়, যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার বা সৌজন্য, 'ফিলনথ্রপি', যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি, যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম নম্রতা বা মডেস্টি। চাকরবাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয়। সেই অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এই জন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্বি দিয়া থাকে। এইজন্যই যখন দুইজনের ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা-পুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে রাজায়-প্রজায় বিবাদ-বিসংবাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্বেই বলা গিয়াছে যে তৈল দিতে পারে সে সর্বশক্তিমান। কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে।

তৈলদ্বারা অগ্নি পর্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্তিমান।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয় তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাটসাহেব পর্যন্ত সকলেই তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিস নয় যে নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে সে-ই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র।

সময়—যে সময়েই হউক তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল—পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যেরূপেই হউক তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট ১।০ পাঁচসিকা বই আদায় করিতে পারিল না—একজন ইংরেজীওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০৲ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া একবিন্দু দিলে যত কার্য হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তি বিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনীশক্তি আছে যে তাহাতে সে

অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে তাহার তৈল আমার তৈল অপেক্ষা মূল্যবান। তাহার উপর যদি ধন থাকে তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামতো আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্র্যাক্‌টিক্যাল্ অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার—অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি বাছিয়া বাছিয়া কোন রায় বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপ্যাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহনিষেকের কালেজ খোলা হয়। অন্ততঃ উকিলি শিক্ষার নিমিত্ত ল কালেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালোই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতঃই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন—কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার, এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমত লেক্‌চার পাওয়া যায় না। যদিও কোনো রীতিমত কালেজ নাই তথাপি যাঁহার নিকট চাকরির বা প্রোমোশনের সুপারিশ মিলে তাদৃশ লোকের বাড়ি সদাসর্বদা গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙালীর বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই। সুতরাং বাঙালীর একমাত্র ভরসা তৈল—বাংলায় যে-কেহ কিছু করিয়াছেন সকলই তৈলের জোরে। বাঙালীদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়। এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড়ো লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এদেশে

হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়ার আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক! তাঁহাদের থু হইলে শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষে মনে রাখা উচিত এক তৈলে চাকা ঘোরে আর তৈলে মন ঘোরে।

কেকাধ্বনি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হঠাৎ গৃহপালিত ময়ূরের ডাক শুনিয়া আমার বন্ধু বলিয়া উঠিলেন, 'আমি ঐ ময়ূরের ডাক সহ্য করিতে পারি না; কবিরা কেকারবকে কেন যে তাঁহাদের কাব্যে স্থান দিয়াছেন বুঝিবার জো নাই।'

কবি যখন বসন্তের কুহুস্বর এবং বর্ষার কেকা, দুটাকেই সমান আদর দিয়াছেন, তখন হঠাৎ মনে হইতে পারে, কবির বুঝি বা কৈবল্যদশাপ্রাপ্তি হইয়াছে— তাঁহার কাছে ভালো ও মন্দ, ললিত ও কর্কশের ভেদ লুপ্ত।

কেবল কেকা কেন, ব্যাঙের ডাক এবং ঝিল্লির ঝংকারকে কেহ মধুর বলিতে পারে না। অথচ কবিরা এ শব্দগুলিকেও উপেক্ষা করেন নাই। প্রেয়সীর কণ্ঠস্বরের সহিত ইহাদের তুলনা করিতে সাহস পান নাই, কিন্তু ষড়্‌ঋতুর মহাসংগীতের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে সম্মান দিয়াছেন।

একপ্রকারের মিষ্টতা আছে, তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট। তাহা নিজের লালিত্য সপ্রমাণ করিতে মুহূর্তমাত্র সময় লয় না। ইন্দ্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য লইয়া মন তাহার সৌন্দর্য স্বীকার করিতে কিছুমাত্র তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নহে, ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া; এইজন্য মন তাহাকে অবজ্ঞা করে, বলে, ও নিতান্তই মিষ্ট, কেবলই মিষ্ট। অর্থাৎ উহার মিষ্টতা বুঝিতে অন্তঃকরণের কোনো প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বোঝা যায়। যাহারা গানের সমজদার এইজন্যই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমুক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা এই যে, মিষ্টগায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয়সভায় আনিয়া নিতান্ত সুলভ প্রশংসার দ্বারা অপমানিত করে, মার্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে না। যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না; সে বলে, 'আমাকে শুকনো পাট দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটা বুঝিব।' গানের উপযুক্ত সমজদার বলে, 'বাজে রস দিয়া গানের বাজে গৌরব বাড়াইয়ো না; আমাকে শুকনো মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি খুশি হইয়া ঠিক দামটি

ঢুকাইয়া দিব।' বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিসের মূল্য নামাইয়া দেয়।

যাহা সহজেই মিষ্ট তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলস্য আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না। অবিলম্বেই তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া মন বলে, 'আর কেন, ঢের হইয়াছে।'

এইজন্য যে লোক যে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে তাহার গোড়ার দিককার নিতান্ত সহজ ও ললিত অংশকে আর খাতির করে না। কারণ, সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে ; সেটুকুর দৌড় যে বেশিদূর নহে, তাহা সে বোঝে ; এইজন্যই তাহার অন্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বুঝিতে পারে, অথচ তখনও সে তাহার সীমা পায় না, এইজন্যই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমজদারের আনন্দকে সে একটা কিম্ভূত ব্যাপার বলিয়া মনে করে ; অনেক সময় তাহাকে কপটতার আড়ম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।

এইজন্যই সর্বপ্রকার কলাবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন এক পক্ষ বলে, 'তুমি কী বুঝিবে!' আর-এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, 'যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর-কেহ বুঝি বোঝে না!'

একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্য-সাধনের আনন্দ— এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতে চট করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।

এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে, অভ্যাসের সঙ্গে, ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গভীর তাহা আপাতত বহু লোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে, তাহার মধ্যে যে একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।

জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। 'ললিত-লবঙ্গলতা'র পার্শ্বে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক—

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্ ।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥

ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল, তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিতলবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড় করিয়া না দাঁড়ায়, সেইখানেই মন এইরূপ সৃজনের অবসর পায়। পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা, ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থানপতন আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যক্ষ নহে—তাহা নিগূঢ়; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া পায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুশি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্য তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সংগীত রচনা করে, সে সংগীত সমস্ত শব্দসংগীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, মনে হয়, যেন কান জুড়াইয়া গেল—কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে।

আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।

কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে সময়বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র, নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর-ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্য-পিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে, রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্য-ক্রেংকার ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান, কান তাহার মাধুর্য জানে না, মনই জানে। সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন

তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকখানি পায়, সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সঙ্গে কবির কেকারব এইজন্যই জড়িত। তাহা শ্রুতিমধুর বলিয়া পথিকবধূকে ব্যাকুল করে না, তাহা সমস্ত বর্ষার মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে; তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জলস্থল-আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়্‌ঋতু আপন পুষ্পপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্যশীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জা-মণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক-একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চকলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্পপল্লবেরই মতো প্রকৃতির নিগূঢ়স্পর্শাধীন। সেইজন্য যৌবনাবেশবিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কী কী সুরে বাজিতে থাকে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি বুঝিয়াছেন, জগতে ঋতু-আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগানো; ফুল-ফুটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক। তাই যে কেকারব বর্ষাঋতুর নিখাদ সুর, তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পড়ে।

বাজে কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়ে চলে, মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে পথে আপনার গোযান টানিয়া আনে সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।

এইজন্য চাণক্য ব্যক্তিবিশেষকে যে একেবারেই চুপ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, সেই কঠোর বিধানের কিছু পরিবর্তন করা যাইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় চাণক্যকথিত উক্ত ভদ্রলোক 'তাবচ্চ শোভতে' যাবৎ তিনি উচ্চ অঙ্গের কথা বলেন, যাবৎ তিনি আবহমান কালের পরীক্ষিত সর্বজনবিদিত সত্য-ঘোষণায় প্রবৃত্ত থাকেন; কিন্তু তখনই তাঁহার বিপদ যখনই তিনি সহজ কথা নিজের ভাষায় বলিবার চেষ্টা করেন।

যে লোক একটা বলিবার বিশেষ কথা না থাকিলে কোনো কথাই বলিতে পারে না, হয় বেদবাক্য বলে নয় চুপ করিয়া থাকে, হে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার সাহচর্য, তাহার প্রতিবেশ—

শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

পৃথিবীতে জিনিসমাত্রই প্রকাশধর্মী নয়। কয়লা আগুন না পাইলে জ্বলে না, স্ফটিক অকারণে ঝক্‌ঝক্ করে। কয়লায় বিস্তর কল চলে, স্ফটিক হার গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় পরাইবার জন্য। কয়লা আবশ্যক, স্ফটিক মূল্যবান।

এক-একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপ স্ফটিকের মতো অকারণ ঝল্‌মল্ করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে—তাহার কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যের আবশ্যক হয় না। তাহার নিকট হইতে কোনো বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরজ কাহারও থাকে না; সে অনায়াসে

আপনাকে আপনি দেদীপ্যমান করে, ইহা দেখিয়াই আনন্দ। মানুষ প্রকাশ এত ভালোবাসে, আলোক তাহার এত প্রিয় যে, আবশ্যককে বিসর্জন দিয়া, পেটের অন্ন ফেলিয়াও, উজ্জ্বলতার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এই গুণটি দেখিলে, মানুষ যে পতঙ্গশ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া যে জাতি অকারণে প্রাণ দিতে পারে, তাহার পরিচয় বিস্তারিত করিয়া দেওয়া বাহুল্য।

কিন্তু সকলেই পতঙ্গের ডানা লইয়া জন্মায় নাই। জ্যোতির মোহ সকলের নাই। অনেকেই বুদ্ধিমান, বিবেচক। গুহা দেখিলে তাঁহারা গভীরতার মধ্যে তলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আলো দেখিলে উপরে উড়িবার ব্যর্থ উদ্যোগমাত্রও করেন না। কাব্য দেখিলে ইঁহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কী আছে, গল্প শুনিলে অষ্টাদশ সংহিতার সহিত মিলাইয়া ইঁহারা ভূয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ ধর্মমতে দুয়ো বা বাহবা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসেন। যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, তাহার প্রতি ইঁহাদের কোনো লোভ নাই।

যাহারা আলোক-উপাসক, তাহারা এই সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। তাহারা ইঁহাদিগকে যে-সকল নামে অভিহিত করিয়াছে আমরা তাহার অনুমোদন করি না। বররুচি ইঁহাদিগকে অরসিক বলিয়াছেন, আমাদের মতে ইহা রুচিগর্হিত। আমরা ইঁহাদিগকে যাহা মনে করি তাহা মনেই রাখিয়া দিই। কিন্তু প্রাচীনেরা মুখ সামলাইয়া কথা কহিতেন না, তাহার পরিচয় একটি সংস্কৃত শ্লোকে পাই। ইহাতে বলা হইতেছে—সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়া ছিল, কোনো ভীল রমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল, যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র, তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনীয়তা-বিবেচনায় যাঁহারা সকল জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করেন, শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার বিকাশ যাঁহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, কবি বর্বর নারীর সহিত তাঁহাদের তুলনা দিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় কবি ইঁহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকিলেই ভালো করিতেন; কারণ, ইঁহারা ক্ষমতাশালী লোক, বিশেষতঃ, বিচারের ভার প্রায় ইঁহাদের হাতে। ইঁহারা গুরুমহাশয়ের কাজ করেন। যাঁহারা সরস্বতীর কাব্যকমলবনে বাস করেন, তাঁহারা তটবর্তী বেত্রবনবাসীদিগকে উদ্‌বেজিত না করুন, এই আমার প্রার্থনা।

সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা রাখে না। সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্মের কথা নহে, কর্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায়, ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া লন তবে তখনই ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছুই নাই। ইহা নিটোল মুক্তা এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।

ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উজ্জ্বল। ইহা একটি মায়াতরী; কল্পনার হাওয়ায় ইহার সজল মেঘনির্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহী হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিত বেগে একটি অপরূপ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর-কোনো বোঝা ইহাতে নাই।

টেনিসন যে Idle Tears, যে অকারণ অশ্রুবিন্দুর কথা বলিয়াছেন, মেঘদূত সেই বাজে চোখের জলের কাব্য। এই কথা শুনিয়া অনেকে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে উদ্যত হইবেন। অনেকে বলিবেন, যক্ষ যখন প্রভুশাপে তাহার প্রেয়সীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তখন মেঘদূতের অশ্রুধারাকে অকারণ বলিতেছেন কেন? আমি তর্ক করিতে চাই না, এ-সকল কথার আমি কোনো উত্তর দিব না। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ যে যক্ষের নির্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার ও-সমস্ত কালিদাসের বানানো, কাব্যরচনার ও একটা উপলক্ষ্যমাত্র। ঐ ভার বাঁধিয়া তিনি এই ইমারত গড়িয়াছেন; এখন আমরা ঐ ভারাটা ফেলিয়া দিব আসল কথা, 'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্' মন অকারণ বির বিকল হইয়া উঠে, কালিদাস অন্যত্র তাহা স্বীকার করিয়াছেন; আষাঢ়ের প্রথ দিনে অকস্মাৎ ঘনমেঘের ঘটা দেখিলে আমাদের মনে এক সৃষ্টিছাড়া বির জাগিয়া উঠে, মেঘদূত সেই অকারণ বিরহের অমূলক প্রলাপ। তা যদি হইত, তবে বিরহী মেঘকে ছাড়িয়া বিদ্যুৎকে দূত পাঠাইত। তবে পূর্বমেঘ এ রহিয়া-বসিয়া, এত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এত যূথীবন প্রফুল্ল করিয়া, এত জনপদবধূ উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টির কৃষ্ণকটাক্ষপাত লুটিয়া লইয়া চলিত না।

কাব্য পড়িবার সময়েও যদি হিসাবের খাতা খুলিয়া রাখিতেই হয়, যদি লাভ করিলাম, হাতে হাতে তাহার নিকাশ চুকাইয়া লইতেই হয়, তবে স্বীব

করিব, মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্য লাভ করিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনও মানুষ ছিল এবং তখনও আষাঢ়ের প্রথম দিন যথানিয়মে আসিত।

কিন্তু অসহিষ্ণু বররুচি যাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা কি এরূপ লাভকে লাভ বলিয়াই গণ্য করিবেন? ইহাতে কি জ্ঞানের বিস্তার, দেশের উন্নতি, চরিত্রের সংশোধন ঘটিবে? অতএব যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, হে চতুরানন, তাহা রসের কাব্যে রসিকদের জন্যই ঢাকা থাকুক—যাহা আবশ্যক, যাহা হিতকর, তাহার ঘোষণার বিরতি ও তাহার খরিদ্দারের অভাব হইবে না।

ছত্র-মহিমা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

শোন্ ভাই, আজ তোদের আমি ছত্রের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করব। বেশ মন দিয়ে শুনিস্।

আমি সে দিন বসে ভাবছিলাম যে, কি আশ্চর্য ব্যাপার, যে বাষ্পীয় যান, তাড়িত বার্তাবহ, ফনোগ্রাফ ইত্যাদির আবিষ্কর্তার নাম মানব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 'জ্বলন্ত অক্ষরে' লিখিত রয়েছে, অথচ ছত্র এমন একটা আশ্চর্য আবিষ্কার, তাহা প্রথম কাহার মস্তিষ্ক আশ্রয় করেছিল, সে সম্বন্ধে কোন বিবরণী নাই। সে কোন্ মৌলিক ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ, যাঁহার মস্তক থেকে এই ধারণার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হ'য়ে শেষে ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাহা কেহ জানে না! —হে অজ্ঞাত, অপরিখ্যাত মহর্ষি, তোমায় কোটি কোটি নমস্কার।

আমার মনে হয়, এই ভারতবর্ষই এই আবিষ্কারের জন্মভূমি। যে জন্মভূমি শব্দ নাটকে থাকলে পুলিশ সে নাটক অভিনয় করতে দিতে অনিচ্ছুক, এ সে জন্মভূমি নয়। ইহার মধ্যে রাজবিদ্বেষ নাই। এ অতি নিরীহ জন্মভূমি। আমার বলার উদ্দেশ্য যে, ভারতবর্ষেই ছাতির প্রথম আবিষ্কার হয়। কি? তার প্রমাণ চাও? কথা আরম্ভ না হ'তেই প্রমাণ? কি প্রমাণ—নৈলে আজ কোন কথা বিশ্বাস করবে না? আচ্ছা, প্রমাণ দিচ্ছি।

প্রথমতঃ, আমাদের দেশের চাষারা এই ছাতির আবিষ্কারের বহু পূর্ব হ'তে এক প্রকার টুপী ব্যবহার করত, তার নাম টোকা। তারপরে আমরা দেখি যে শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে রাজছত্র ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এবং সংস্কৃত ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিবে।

এ আবিষ্কার এত পুরাতন, কিন্তু আশ্চর্য! সুবিখ্যাত উদ্ভাবনগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ করি না। বাষ্পীয় যান বিপুল ভার বহন ক'রে, ক্ষণকালের মধ্যে যোজন অতিক্রম করে; কিন্তু সেটা তৈয়ার করবার সরঞ্জামটা ভেবে দেখ দেখি! কত মুদ্রা ব্যয়, কত কৌশল, কত পরিশ্রম দরকার হয় একখানি বাষ্পীয় যান তৈয়ার করবার জন্য; কিন্তু ছত্র একগাছি বেত, তাহার

উপরে সংলগ্ন কয়টি লোহার শিক, তাহার উপরে গজখানেক কাপড়। কি সহজ, সুসাধ্য, সুলভ।

অথচ তার উপকারিতা!—উঃ। যদি আমার বাসুকির সহস্র মুখ—অন্ততঃ স্বয়ম্ভুর চতুর্মুখ থাকিত ত একবার বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিতাম—একমুখে কি করিব!

বাষ্পীয় যান বিরাট ব্যাপার; কিন্তু সে একটি মাত্র কাজ করে। সে অল্প সময়ের মধ্যে কাছের জিনিস দূরে নিয়ে যায়। ছত্র এরূপ কোন ব্যাপার সংসাধন করে না। কিন্তু সে যা করে, তাহা—একাদিক্রমে চতুর্দশ পুরুষ সংসাধন করতে পারে না।

প্রথমতঃ দেখ বালকবৃন্দ! ছত্র মানুষের মাথা রক্ষা করে। ডারউইনাদি বৈজ্ঞানিকগণ মনুষ্যজাতি যে বানর জাতির চেয়ে উচ্চ জন্তু, তা সরলভাবে স্বীকার করেছেন। তাঁহাদিগের জয় হোক! যাক্, সে কথা যাক্। কি বলিতেছিলাম;—হাঁ হাঁ, মানুষ শ্রেষ্ঠ জন্তু আর—মনোযোগ দিয়ে শোন। কি প্রমাণ? প্রমাণ চাও?—কি, 'জন্তু' কথায় আপত্তি করিতেছ? উক্ত বৈজ্ঞানিক-গণ স্পষ্টভাবে ছাপার অক্ষরে লিখিয়াছেন যে মানব—এক জন্তু!—কি? এই বৈজ্ঞানিকগণ এক এক জন্তু! আমি জন্তু? অবশ্য মনুষ্য মাত্রেই যদি জন্তু হয়, তবে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও অধম পুরুষ—সকলেই জন্তু। কি হেসে উঠিলে যে!—ও! অধম পুরুষ নয়—প্রথম পুরুষ! বটে বটে!—ভুলিয়া গিয়াছিলাম। দেখ আমার বিশ্বাস, এই স্থানে বৈয়াকরণেরা একটু ভুল করেছেন। উত্তম, মধ্যম ও অধম পুরুষ—ইহাই বলা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, কেবল ভদ্রতার খাতিরে সেরূপ বলিতে পারেন নাই। উত্তম মানে ভাল (আমি চিরকালই ভাল,—হ'তেই হবে), তাহার পর তুমি মধ্যম (নিশ্চয়ই, নইলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা), আর বাকি সব (জনান্তিক) অধম;—শুদ্ধ ভদ্রতার খাতিরে প্রথম।

এর আবার প্রমাণ কি? ওঃ, তুমি সন্দেহ, প্রমাণ নহিলে বিশ্বাস করবে না—উত্তম। এই উক্তির প্রমাণ উক্ত বৈজ্ঞানিকগণ দিয়াছেন। প্রথমতঃ মানুষ ছাড়া অন্য কোন জন্তু রেঁধে খায় না। কুকুর রাঁধা জিনিস খায়; কিন্তু নিজে রেঁধে খায় কি? দ্বিতীয়তঃ, মানুষ ছাড়া অন্য কোন জন্তু হাসতে জানে না।—কি? কুকুর হাসে। না, তাকে হাসি বলে না। তাকে জিভ বের ক'রে থাকা বলে। মর্কটে-মর্কটে দাঁত খিঁচোয়—হাসে না। হাসি কাকে বলে?—হাসি বলে হাস্যকে।—অর্থাৎ?—অর্থাৎ কোন মনোভাবে দুটি ওষ্ঠপ্রান্ত সমভাবে কর্ণদ্বয়ের

দিকে প্রসারণের নাম হাস্য। দাঁত বেরোনো হাসির অঙ্গ নয়। তবে হাসতে গেলে দাঁত বেরোয় (অর্থাৎ যদি দাঁত থাকে)। তবে দেখলে, মানুষ হাসে, আর কোন জন্তু হাসে না। তৃতীয়তঃ, মানুষ অস্ত্র ব্যবহার করে, আর কোন জন্তু অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে না। চতুর্থতঃ, মানুষ কথা কইতে পারে, আর কোন জন্তু —কি ? টিয়া ? টিয়া কথা কয় না। শেখা বুলি উচ্চারণ করে মাত্র। টিয়া যদি কথা কয়, তা হ'লে গ্রামোফোনও কথা কয়।

মানুষ দু'পায়ে হাঁটে ;—পাখি ? তা যে বলবে, তা আগেই বুঝেছি। পাখি দু'পায়ে হাঁটে বটে, কিন্তু পক্ষহীন অন্য কোন জানোয়ার হাঁটে না। পঞ্চমতঃ, মানুষ গান গায়, আর কোন জন্তু গান গায় না। কি ? গাধা গান গায় ? তোমারই মত গায় বটে। তার উপর প্রমাণের সেরা প্রমাণ হচ্ছে—এটা কোন বৈজ্ঞানিক বলেন নি, আমি নিজে ভেবে বের করিছি।—প্রমাণের সেরা প্রমাণ শোন, কান উচ্চ ক'রে শোন। প্রমাণের সেরা প্রমাণ হচ্ছে মানুষ কবিতা লেখে, আর কোন জানোয়ার কবিতা লেখে না।

মুষড়ে গেলে। তবে স্বীকার কচ্ছ যে, মানুষ শ্রেষ্ঠ জানোয়ার! তার অব্যবহিত পরেই—মানুষের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হচ্ছে মাথা। তার আবার প্রমাণ কি ?—তার প্রমাণ মাথায় মস্তিষ্ক আছে, সে সমস্ত শরীরকে জ্বালায়। মাথা হচ্ছে শরীরটার রাজধানী, যেমন ভারতবর্ষের কলিকাতা। হাঁ—সেটা এখন দিল্লীতে উঠে গিয়েছে বটে। কি ? হাঁ, ঠিক বলেছ ভাই। মানুষের মাথা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ না হ'লে উপর দিকে থাকবে কেন ? তারও একটা প্রমাণ যে এই মুণ্ডটার মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই আছে। আর কোন অঙ্গে নেই। তার আরও একটা প্রমাণ হচ্ছে এই যে, অন্য কোন অঙ্গ কেটে নিলে মানুষ বাঁচে, কিন্তু মাথা কেটে নিলে মানুষ বাঁচে না। কি ?—কে বাঁচে না ?—মানুষ—মানুষ। বললাম না ?—ও! মাথা কেটে নিলে মানুষ কোন্‌টা—মাথাটা ? না অঙ্গটা ?—কূট। কূট। তুমি বড় গোলমাল কর। না হয় ও-প্রমাণটা ছেড়ে দিলাম।

তা হ'লে এতদূর পর্যন্ত প্রমাণ করেছি যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জন্তুর শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হচ্ছে—মাথা। এখন দেখ, ছাতি মানুষের মাথা রক্ষা করে, রেলগাড়িতে করে না, গ্রামোফোনও করে না ? পাগড়ি ? হাঁ, পাগড়ি কি মুকুট, মাথা ঠেকায় বটে, কিন্তু তারা সে রকমে মাথা রক্ষা করতে পারে না—যেমন ছাতিতে ঠেকায়। কি রকমে ?—নানা রকমে ?—নানা রকমে। শোন।

প্রথমতঃ ছাতি রৌদ্র নিবারণ করে, তজ্জন্যই ছত্রকে আতপত্র বলে,

পাগড়িতে, কি সোলার টুপিতে রৌদ্র নিবারণ করে, বাতাস বন্ধ করে বটে, কিন্তু তারা মাথার সঙ্গে এমন একটা নিকট ঘনিষ্ঠতা করে যে, মাথা নিজেই চটে গরম হয়ে ওঠে—বাহিরের রৌদ্রে সে প্রায় অত গরম হয় না। ছত্র মস্তক হ'তে সাহেবের আর্দালির মত—দূরে থাকিয়া এরূপ সসম্ভ্রমে মস্তককে রক্ষা করে যে, তাহাতে মস্তক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়।

তারপরে এই ছত্র—যা রৌদ্র নিবারণ করে, তাই আবার বৃষ্টি নিবারণ করে। ঠিক বিপরীত। রৌদ্র দাহ করে কিন্তু স্নিগ্ধ করে না। বৃষ্টি স্নিগ্ধ করে কিন্তু দাহ করে না। কিন্তু ছত্র—কি? দাহও করে না, স্নিগ্ধও করে না? তা করে না বটে কিন্তু উভয়কেই সমভাবে নিবারণ করে। তদুপরি যদি শিল পড়ে, ত সে দুর্যোগেও ছাতি মাথাকে সযত্নে ঘিরে রক্ষা করে। এমন এই এক ছাতি। তৃতীয়তঃ, ছাতি আরও এক কাজ করে। অভাবপক্ষে এই ছাতিকেই লাঠির আকারে পরিণত করা যায়। কুকুর, শেয়াল, এমন কি বাঘ পর্যন্ত এই ছত্র দিয়ে তাড়ান যায়। কি? বাঘ তাড়ান যায় না? তবে তোরা 'পশ্বাবলি' পড়িস্‌নি। তাতে কি আছে?—তাতে আছে যে কয়েকজন সাহেব মেম বনভোজন করতে যান, এমন সময়ে এক বাঘ এসে তাঁদের আক্রমণ করেন। সকলে এই বিপরীত বনভোজনের আয়োজন দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তখন এক প্রত্যুৎপন্নমতি সাহেব—একটা ছাতি নিয়ে বাঘের মুখের কাছে এরূপ ক্ষিপ্রভাবে খুলেছিলেন যে, ব্যাঘ্র মহোদয় এ নূতন যন্ত্রের অভ্যুদয়ে তৎক্ষণাৎ বিপরীত দিকে প্রস্থান করল। ছাতি না থাকলে সে দিন আর বনভোজন হ'ত না, হ'ত? কি রকম ক'রে? ও! সাহেবের বনভোজন না হ'য়ে বাঘের বনভোজন হ'ত।—বেশ বলিছিস্‌। নাতিনীরা চিরকাল দেখিছি নাতিশ্রেণীর চেয়ে রসিক হয়। আমি তার জন্য চিরকাল নাতির চেয়ে নাতিনীর পক্ষপাতী। —কিহে ভায়া, তুমি বিশ্বাস কর না? কি বিশ্বাস কর না? নাতিনী, না বাঘ? —এই গল্পটা?—কেন? বিশ্বাস করতে পারই না ভায়া। ও! তুমি বলছ—যে দিনে দুপুরে বাঘ এসে ওরকম আক্রমণ করে না। তবে কি রকম এসে আক্রমণ করে?—দিনে বাঘ আসে না! তবে শোন। আমি এক দিন ঘড়ি ধরে এগারটা বেজে সাড়ে চব্বিশ মিনিটে প্রাণনগরের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঠাকুরগাঁ থেকে আসছি, এমন সময়ে ঈশান-কোণে চেয়ে দেখলাম একটা ঝোপের ভিতরে একপাল বাঘ চ'রে বেড়াচ্ছে। কতগুলো? শ দুই তিন হবে!—কি? হ'তেই পারে না। আচ্ছা শ দু'তিন না হোক, ত্রিশ বত্রিশটা ত হবেই।—অসম্ভব? বাঘ পাল

বেঁধে বেড়ায় না ?—তবে ক'টা বাঘ ছিল তুমি বলতে চাও ?—পাঁচটা ? দুটো ? একটা ? তাও নয় ? তবে ঝোপের মধ্যে কি যেন একটা নড়েছিল।—কি হাসছ যে ! নড়েও নি ? তুমি ত ভায়া বেজায় নাস্তিক ! কিন্তু বনভোজনের গল্পটা সত্য ?—মাথা নাড়ছ যে ? প্রমাণ চাও ? তবে শোন। এতক্ষণ সেটা দেই নি ! শুনলে মুষড়ে যাবে। তবে শোন। সেদিন আমিও সে বনভোজনে গিয়েছিলাম। কেন গিয়েছিলাম ?—দেখ ভায়া, জেরা ক'র না। ধ'রে নাও গিয়েছিলাম। Let it be granted। হাঁ, এটা postulate।—কি ? মাথা নাড়ছ যে ?—আচ্ছা ভায়া, বিশ্বাস করলেই বা ! আচ্ছা, না হয় ছাতিতে বাঘ তাড়ান যায় না। কুকুর শেয়াল ত তাড়ান যায় ?—তা হ'লেই হ'ল !

অতএব ছত্র সবল আকারে যষ্টিরূপেই পরিণত হয় ; এবং সে যষ্টি দ্বারা আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় কার্যই সম্পন্ন হয়। কি ? ছাতি দিয়ে আক্রমণ করা যায় না ? খুব যায় ! আচ্ছা, ছাতি নিয়ে আয়, আমি তোদের একবার 'ছাতি পেটা' ক'রে দেই। শীঘ্রই মীমাংসা হয়ে যাবে। সব কথারই তর্ক।—হাঁ, বলে, যেতে দে !

ছত্র আর কি করে ? ছাতা মুড়ে গাছতলায় মাথার নিচে বালিস ক'রে শোয়া যায় !—বালি'শর কাজ ঠিক হয় না বটে। তা না হৌক, কিছু হয় ত।

আর একটি ছত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে—সে শ্রেণী বিশেষের কাছে। সে শ্রেণীটি অধমর্ণ সম্প্রদায়। তারা যখন অঙ্গীকৃত ঋণ পরিশোধ করা সম্বন্ধে হতাশ ভাব অবলম্বন করে—তখন মহাজনের বাটীর সম্মুখ দিয়ে যেতে এই ছত্রই তাদের লজ্জা নিবারণ করে। যে দিকে মহাজন, সেই দিকে ছত্রটি কৌশল সহকারে ফিরালে সেই ঋণীর মনে অনেক শান্তির আবির্ভাব হয়—যা হরিনামে হয় না।

একেবারে এত গুণ কার ?—অথচ দাম একটি মুদ্রা মাত্র। এত সহজ, এত সুন্দর ! মানুষও কৃতজ্ঞভাবে ছত্রের যথোচিত আদর করে। তাই সে তাকে মাথায় ক'রে রেখেছে। ছত্র সম্মানের চিহ্ন। তাই পুরাকালে ভারতবর্ষে রৌদ্র বৃষ্টি না লাগলেও স্বাধীন রাজার মাথার উপর রাজছত্র বিরাজ করত, এবং এখনও করে, তাই 'একছত্র ভূপতি'—সম্মানের বিশেষণ। হে ছত্র, তোমায় কোটি কোটি নমস্কার।

আমার মনে হয় যে, পৃথিবীর ছত্র ঐ আকাশ। শুদ্ধ তার দামটা দেখা যায়

না। কিন্তু দণ্ড আছে। সে দণ্ডটি কি ? সে দণ্ডটি মাধ্যাকর্ষণ। ঐ বিরাট দিগন্ত-ব্যাপী, নক্ষত্রখচিত মহাছত্র, এই বিপুল মেদিনীকে ধ্বংসের গ্রাস থেকে রক্ষা করছে।

সে ছত্রধারী স্বয়ং ভগবান।

ফাল্গুন

প্রমথ চৌধুরী

আমাদের দেশে কোনো কিছুরই হঠাৎ বদল হয় না, ঋতুরও নয়। বর্ষা কেবল কখনো-কখনো বিনা নোটিশে একেবারে হুড়দ্দুম ক'রে এসে গ্রীষ্মের রাজ্য জবরদখল ক'রে নেয়। ও ঋতুর চরিত্র কিন্তু আমাদের ধাতের সঙ্গে মেলে না। প্রাচীন কবিরা বলে গেছেন, বর্ষা আসে দিগ্‌বিজয়ী যোদ্ধার মতো—আকাশে জয়ঢাক বাজিয়ে, বিদ্যুতের নিশান উড়িয়ে, অজস্র বরুণাস্ত্র বর্ষণ ক'রে, এবং দেখতে-না-দেখতে আসমুদ্রহিমালয় সমগ্র দেশটার উপর একছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। এক বর্ষাকে বাদ দিলে, বাকি পাঁচটা ঋতু যে ঠিক কবে আসে আর কবে যায়, তা এক জ্যোতিষী ছাড়া আর-কেউ বলতে পারেন না। আমাদের ছয় রাগের মধ্যে এক মেঘ ছাড়া আর-পাঁচটি যেমন এক সুর থেকে আর-একটিতে বেমালুমভাবে গড়িয়ে যায়—আমাদের স্বদেশী পঞ্চঋতুও তেমনি ভূমিষ্ঠ হয় গোপনে, ক্রমবিকশিত হয় অলক্ষিতে, ক্রমবিলীন হয় পরঋতুতে।

ইউরোপ কিন্তু ক্রমবিকাশের জগৎ নয়। সে-দেশের প্রকৃতি লাফিয়ে চলে, এক ঋতু থেকে আর-এক ঋতুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে; বছরে চারবার নবকলেবর ধারণ করে, নবমূর্তিতে দেখা দেয়। তাদের প্রতিটির রূপ যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি স্পষ্ট। যাঁর চোখ আছে তিনিই দেখতে পান যে, বিলেতের চারটি ঋতু চতুর্বর্ণ। মৃত্যুর স্পর্শে বহু যে এক হয়, আর প্রাণের স্পর্শে এক যে বহু হয়, এ সত্য সে-দেশে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে শীতের রঙ তুষার-গৌর, সকল বর্ণের সমষ্টি; আর বসন্তের রঙ ইন্দ্রধনুর, সকল বর্ণের ব্যষ্টি। তারপর নিদাঘের রঙ ঘন সবুজ, আর শরতের গাঢ় বেগনি। বিলেতি ঋতুর চেহারা শুধু আলাদা নয়, তাদের আসা-যাওয়ার ভঙ্গিও বিভিন্ন।

সেদেশে বসন্ত শীতের শব-শীতল কোল থেকে রাতারাতি গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে—মহাদেবের যোগভঙ্গ করবার জন্য মদনসখা বসন্ত যেভাবে একদিন অকস্মাৎ হিমাচলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোনো-এক সুপ্রভাতে ঘুম ভেঙে চোখ মেলে, হঠাৎ দেখা যায় যে, রাস্তির গাছ মাথায় একরাশ ফুল প'রে

দাঁড়িয়ে হাসছে ; অথচ তাদের পরনে একটিও পাতা নেই। সে রাজ্যে বসন্তরাজ তাঁর আগমনবার্তা আকাশের নীল পত্রে সাতরাঙা ফুলের হরফে এমন স্পষ্ট এমন উজ্জ্বল ক'রে ছাপিয়ে দেন যে, সে বিজ্ঞাপন—মানুষের কথা ছেড়ে দিন—পশুপক্ষীরও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

ইউরোপের প্রকৃতির যেমন ক্রমবিকাশ নেই, তেমনি ক্রমবিলয়ও নেই ; শরৎও সে দেশে কালক্রমে জরাজীর্ণ হ'য়ে অলক্ষিতে শিশিরের কোলে দেহত্যাগ করে না। সেদেশে শরৎ তার শেষ-উইল—পাণ্ডুলিপিতে নয়, রক্তাক্ষরে লিখে রেখে যায় ; কেননা, মৃত্যুর স্পর্শে তার—পিত্ত নয়, রক্ত প্রকুপিত হয়ে ওঠে। প্রদীপ যেমন নেভবার আগে জ্বলে ওঠে, শরতের তাম্রপত্রও তেমনি ঝরবার আগে অগ্নিবর্ণ হ'য়ে ওঠে। তখন দেখতে মনে হয়, অস্পৃশ্য শত্রুর নির্মম আলিঙ্গন হ'তে আত্মরক্ষা করবার জন্য প্রকৃতিসুন্দরী যেন রাজপুত রমণীর মতো স্বহস্তে চিতারচনা ক'রে সোল্লাসে অগ্নিপ্রবেশ করছেন।

২

এদেশে ঋতুর গমনাগমনটি অলক্ষিত হলেও তার পূর্ণাবতারটি ইতিপূর্বে আমাদের নয়নগোচর হ'ত। কিন্তু আজ যে ফাল্গুন মাসের পনেরো তারিখ, এ সুখবর পাঁজি না দেখলে জানতে পেতুম না। চোখের সুমুখে দেখছি তা বসন্তের চেহারা নয়, একটা মিশ্রঋতুর—শীত ও বর্ষার—যুগলমূর্তি। আর এদের পরস্পরের মধ্যে পালায়-পালায় চলছে সন্ধি ও বিগ্রহ। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও শীত ও বর্ষার দাম্পত্যবন্ধন এভাবে চিরস্থায়ী হওয়াটা আমার মতে মোটেই ইচ্ছনীয় নয়। কেননা, এহেন অসবর্ণ-বিবাহের ফলে শুধু সংকীর্ণবর্ণ দিবানিশার জন্ম হবে।

এই ব্যাপার দেখে আমার মনে ভয় হয় যে, হয়তো বসন্ত ঋতুর খাতা থেকে নাম কাটিয়ে চিরদিনের মতো এদেশ থেকে সরে পড়ল। এ পৃথিবীটি অতিশয় প্রাচীন হয়ে পড়েছে ; হয়তো সেই কারণে বসন্ত এটিকে ত্যাগ ক'রে এই বিশ্বের এমন-কোনো নবীন পৃথিবীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, যেখানে ফুলের গন্ধে পত্রের বর্ণে পাখির গানে বায়ুর স্পর্শে আজও নরনারীর হৃদয় আনন্দে আকুল হয়ে ওঠে।

আমরা আমাদের জীবনটা এমন দৈনিক ক'রে তুলেছি যে, ঋতুর কথা দূরে থাক, মাস-পক্ষের বিভাগটারও আমাদের কাছে কোনো প্রভেদ নেই। আমাদের

কাছে শীতের দিনও কাজের দিন, বসন্তের দিনও তাই ; এবং অমাবস্যাও ঘুমোবার রাত, পূর্ণিমাও তাই। যে জাত মনের আপিস কামাই করতে জানে না, তার কাছে বসন্তের অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই, কোনো সার্থকতা নেই —বরং ও একটা অনর্থেরই মধ্যে ; কেননা, ও-ঋতুর ধর্মই হচ্ছে মানুষের মন-ভোলানো, তার কাজ-ভোলানো। আর আমরা সব ভুলতে সব ছাড়তে রাজি আছি, এক কাজ ছাড়া ; কেননা, অর্থ যদি কোথাও থাকে তো ঐ কাজেই আছে। বসন্তে প্রকৃতিসুন্দরী নেপথ্যবিধান করেন ; সে সাজগোজ দেখবার যদি কোনো চোখ না থাকে, তাহলে কার জন্যই-বা নবীন পাতার রঙিন শাড়ি পরা, কার জন্যই-বা ফুলের অলংকার ধারণ, আর কার জন্যই-বা তরুণ আলোর অরুণ হাসি হাসা ? তার চাইতে চোখের জল ফেলা ভালো। অর্থাৎ এ অবস্থায় শীতের পাশে বর্ষাই মানায় ভালো। শুনতে পাই কোনো ইউরোপীয় দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন যে, মানব-সভ্যতার তিনটি স্তর আছে। প্রথম আসে শ্রুতির যুগ, তারপর দর্শনের,তারপর বিজ্ঞানের। একথা যদি সত্য হয় তো আমরা বাঙালীরা, আর যেখানেই থাকি মধ্যযুগে নেই ; আমাদের বর্তমান অবস্থা হয় সভ্যতার প্রথম অবস্থা, নয় শেষ অবস্থা। আমাদের এ যুগ যে দর্শনের যুগ নয়, তার প্রমাণ—আমরা চোখে কিছুই দেখি নে ; কিন্তু হয় সবই জানি, নয় সবই শুনি। এ অবস্থায় প্রকৃতি যে আমাদের প্রতি অভিমান ক'রে তাঁর বাসন্তী মূর্তি লুকিয়ে ফেলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি।

৩

আমি এইমাত্র বলেছি যে, এ যুগে আমরা হয় সব জানি, নয় সব শুনি। কিন্তু সত্যকথা এই যে, আমরা একালে যা-কিছু জানি সেসব শুনেই জানি—অর্থাৎ দেখে কিংবা ঠেকে নয় ; তার কারণ আমাদের কোনো কিছু দেখবার আকাঙ্ক্ষা নেই—আর সব-তাতেই ঠেকবার আশঙ্কা আছে।

এই বসন্তের কথাটাও আমাদের শোনা-কথা ও একটা গুজব মাত্র। বসন্তের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যের পাকা খাতার ভিতর পাই, কচি পাতার ভিতর নয়। আর বইয়ে যে বসন্তের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়—তা কস্মিন্‌কালেও এ ভূ-ভারতে ছিলো কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার বৈধ কারণ আছে।

গীতগোবিন্দে জয়দেব বসন্তের যে রূপবর্ণনা করেছেন, যে রূপ বাংলার কেউ কখনো দেখেনি। প্রথমতঃ, মলয় সমীরণ যদি সোজাপথে সিধে বয়, তাহলে

বাংলা দেশের পায়ের নিচে দিয়ে চলে যাবে, তার গায়ে লাগবে না। আর যদি তর্কের খাতিরে ধ'রেই নেওয়া যায় যে, সে বাতাস উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে, অর্থাৎ পথ ভুলে, বঙ্গভূমির গায়েই এসে ঢ'লে পড়ে, তাহলেও লবঙ্গলতাকে তা কখনোই পরিশীলিত করতে পারে না। তার কারণ, লবঙ্গ গাছে ফলে কি তলায় ঝোলে, তা আমাদের কারও জানা নেই। আর হোক-না সে লতা, তার এদেশে দোদুল্যমান হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই এবং ছিলো না। সংস্কৃত আলংকারিকেরা "কাবেরীতীরে কালাগুরুতরু"র উল্লেখে ঘোরতর আপত্তি করেছেন, কেননা ও-বাক্যটি যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন—প্রকৃত নয়। কাবেরীতীরে যে কালাগুরুতরু কালেভদ্রেও জন্মাতে পারে না, একথা জোর ক'রে আমরা বলতে পারি নে; অপরপক্ষে, অজয়ের তীরে লবঙ্গলতার আবির্ভাব এবং প্রাদুর্ভাব যে একেবারেই অসম্ভব, সেকথা বঙ্গভূমির বীরভূমির সঙ্গে যাঁর চাক্ষুষ পরিচয় আছে তিনিই জানেন। ঐ এক উদাহরণ থেকেই অনুমান, এমনকি প্রমাণ পর্যন্ত করা যায় যে, জয়দেবের বসন্তবর্ণনা কাল্পনিক—অর্থাৎ সাদা ভাষায় যাকে বলে অলীক। যার প্রথম কথাই মিথ্যে, তার কোনো কথায় বিশ্বাস করা যায় না; অতএব ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে এই কবি-বর্ণিত বসন্ত আগাগোড়া মনগড়া।

জয়দেব যখন নিজের চোখে দেখে বর্ণনা করেন নি, তখন তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের বই থেকে বসন্তের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন; এবং কবিপরম্পরায় আমরাও তাই ক'রে আসছি। সুতরাং এ সন্দেহ স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, বসন্তঋতু একটা কবিপ্রসিদ্ধি মাত্র; ও-বস্তুর বাস্তবিক কোনো অস্তিত্ব নেই। রমণীর পদতাড়নার অপেক্ষা না রেখে অশোক যে ফুল ফোটায়, তার গায়ে যে আলতার রঙ দেখা দেয়, এবং ললনাদের মুখমদ্যসিক্ত না হ'লেও বকুল ফুলের মুখে যে মদের গন্ধ পাওয়া যায়—এ কথা আমরা সকলেই জানি। এ দুটি কবিপ্রসিদ্ধির মূলে আছে মানুষের ঔচিত্য-জ্ঞান। প্রকৃতির যথার্থ কার্যকারণের সন্ধান পেলেই বৈজ্ঞানিক কৃতার্থ হন; কিন্তু কবি কল্পনা করেন তাই, যা হওয়া উচিত ছিলো। কবির উক্তি হচ্ছে প্রকৃতির যুক্তির প্রতিবাদ। কবি চান সুন্দর, প্রকৃতি দেন তার বদলে সত্য। একজন ইংরেজ কবি বলেছেন যে সত্য ও সুন্দর একই বস্তু—কিন্তু সে শুধু বৈজ্ঞানিকদের মুখ বন্ধ করবার জন্য। তাঁর মনের কথা এই যে, যা সত্য তা অবশ্য সুন্দর নয়, কিন্তু যা সুন্দর তা অবশ্যই সত্য—অর্থাৎ তার সত্য হওয়া উচিত ছিলো। তাই আমার

মনে হয় পৃথিবীতে বসন্ত ঋতু থাকা উচিত—এই ধারণাবশতঃ সেকালের কবিরা কল্পনাবলে উক্ত ঋতুর সৃষ্টি করেছেন। বসন্তের সকল উপাদানই তাঁরা মন-অঙ্কে সংগ্রহ ক'রে প্রকৃতির গায়ে তা বসিয়ে দিয়েছেন।

৪

আমাদের এ অনুমানের স্পষ্ট প্রমাণ সংস্কৃত কাব্যে পাওয়া যায়, কেননা পুরাকালে কবিরা সকলেই স্পষ্টবাদী ছিলেন। সেকালে তাঁদের বিশ্বাস ছিলো যে সকল সত্যই বক্তব্য, সে সত্য মনেরই হোক আর দেহেরই হোক। অবশ্য একালের রুচির সঙ্গে সেকালের রুচির কোনো মিল নেই ; সেকালে সুরুচির পরিচয় ছিলো কথা ভালো ক'রে বলায়, একালে ও-গুণের পরিচয় চুপ ক'রে থাকায়। নীরবতা যে কবির ধর্ম, এ জ্ঞান সেকালে জন্মে নি। সুতরাং দেখা থাক, তাঁদের কাব্য থেকে বসন্তের জন্মকথা উদ্ধার করা যায় কি না।

সংস্কৃত মতে বসন্ত মদন-সখা। মনসিজের দর্শনলাভের জন্য মানুষকে প্রকৃতির দ্বারস্থ হ'তে হয় না। কেননা, মন যার জন্মস্থান, তার সাক্ষাৎ মনেই মেলে।

ও-বস্তুর আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গে মনের দেশের অপূর্ব রূপান্তর ঘটে। তখন সে রাজ্যে ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, আকাশ-বাতাস বর্ণে গন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে। মানুষের স্বভাবই এই যে, সে বাইরের বস্তুকে অন্তরে আব অন্তরের বস্তুকে বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই ভিতর-বাইরের সমন্বয় করাটাই আত্মার ধর্ম। সুতরাং মনসিজের প্রভাবে মানুষের মনে যে রূপরাজ্যের সৃষ্টি হয়, তারই প্রতিমূর্তি স্বরূপে বসন্ত ঋতু কল্পিত হয়েছে ; আসলে ও-ঋতুর কোনো অস্তিত্ব নেই। এর একটি অকাট্য প্রমাণ আছে। যে শক্তির বলে মনো-রাজ্যের এমন রূপান্তর ঘটে, সে হচ্ছে যৌবনের শক্তি। তাই আমরা বসন্তকে প্রকৃতির যৌবনকাল বলি, অথচ একথা আমরা কেউ ভাবিনে যে, জন্মাবামাত্র যৌবন কারও দেহ আশ্রয় করে না ; অথচ পয়লা ফাল্গুন যে বসন্তের জন্মতিথি, এ কথা সকলেই জানি। অতএব দাঁড়ালো এই যে, বসন্ত প্রকৃতির রাজ্যে একটা আরোপিত ঋতু।

আমার এসব যুক্তি যদিও সুযুক্তি না হয়, তাহলেও আমাদের মেনে নিতে হবে যে, বসন্ত মানুষের মনঃকল্পিত ; নচেৎ আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, বসন্ত ও মনোজ উভয়ে সমধর্মী হ'লেও উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

বলা বাহুল্য, এ কথা মানার অর্থ সংস্কৃতে যাকে বলে দ্বৈতবাদ এবং ইংরেজীতে প্যারালালিজম্—সেই বাতিল দর্শনকে গ্রাহ্য করা। সে তো অসম্ভব। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন যে, বসন্তের অস্তিত্বই প্রকৃত এবং তার প্রভাবেই মনে যে বিকার উপস্থিত হয়, তারই নাম মনসিজ। এ তো পাকা জড়বাদ, অতএব বিনা বিচারে অগ্রাহ্য।

আমার শেষ কথা এই যে, পৃথিবীতে বসন্তের যখন কোনোকালে অস্তিত্ব ছিলো না, তখন সে অস্তিত্বের কোনোকালে লোপ হ'তে পারে না। আমরা ও-বস্তু যদি হারাই, তবে তা আমাদের অমনোযোগের দরুন। যে জিনিস মানুষের মন-গড়া, তা মানুষের মন দিয়েই খাড়া রাখতে হয়। পূর্ব-কবিরা কায়মনোবাক্যে যে রূপের ঋতু গড়ে তুলেছেন, সেটিকে হেলায় হারানো বুদ্ধির কাজ নয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বস্তুগত্যা প্রকৃতিকে মানুষের দাসী করেছেন, তখন কবিদের কর্তব্য হচ্ছে কল্পনার সাহায্যে তাঁর দেবীত্ব রক্ষা করা। এবং এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হ'লে তাঁর মূর্তির পূজা করতে হবে ; কেননা, পূজা না পেলে দেবদেবীরা যে অন্তর্ধান হন, এ সত্য তো ভুবনবিখ্যাত। দেবতা যে মন্ত্রাত্মক। আর এ পূজা যে অবশ্যকর্তব্য তার কারণ, বসন্ত যদি অতঃপর আমাদের অন্তরে লাট খেয়ে যায়, তাহলে সরস্বতীর সেবকেরা নিশ্চয়ই স্ফীত হ'য়ে উঠবে, তাতে ক'রে বঙ্গসাহিত্যের জীবনসংশয় ঘটতে পারে। এ স্থলে সাহিত্যসমাজকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একালে আমরা যাকে সরস্বতী-পূজা বলি, আদিতে তা ছিলো বসন্তোৎসব।

হুঁকা কলিকা বনাম চুরট সিগ্‌রেট

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল দেখিতেছি হুঁকা-কলিকার বদলে চুরট সিগ্‌রেট বিড়ি বার্ডসাই-এর বেশি বেশি চল হইতেছে। এমন কি, যাঁহারা কখনও হুঁকায় মুখ দেন না, তাঁহারাও ফ্যাশানের খাতিরে সিগ্‌রেট টানিতেছেন, এরূপ দৃশ্যও বিরল নহে। যুক্তি-তর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, তুলনায় সমালোচনা, প্রভৃতিও হইতে দেখি। যথা—

শৌখিন ছোকরা বাবুরা বলেন,—হুঁকা-কলিকায় ফৈজত ঢের, বড় লেঠা, নানান নটখটি ; তামাক-টিকা চাই, হুঁকা-কলিকা চাই ; তামাক হয়তো ভ্যালসা, টিকা হয়তো ভিজা, খোল দিয়া হয়তো জল পড়ে, নল্‌চে হয়তো বন্ধ, কলিকা হয়তো ভাঙা, জলটা হয়তো ঝাল হইয়া গিয়াছে,—ঠিকরে হয়তো কোথায় পড়িয়া গিয়াছে—অনেক অসুবিধা পোহাইতে হয়, অনেক সময় অপব্যয় হয়, হাত নোংরা হয়, যা'র তা'র হুঁকায় খাইতে গা ঘিনঘিন করে, মশারি বিছানা পোড়ে, দাড়িতে আগুন ধরে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর—এক প্যাকেট হাওয়া-গাড়ি সিগ্‌রেট ও এক বাক্স ভুয়ানি-মার্কা দিয়াশলাই পকেটে রাখ, বস্‌, রাজারও রায়ত নও, মহাজনেরও খাতক নও। তোফা আরাম, যত ইচ্ছা জ্বালো আর খাও। (প্রায় 'ঢালো আর খাও'-এর ধাক্কা!) এই সম্বল লইয়া চাই কি দক্ষিণমেরু আবিষ্কারে (দক্ষিণদ্বারেরই কাছাকাছি) গেলেও আটক নাই।

পক্ষান্তরে সিগ্‌রেটের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। ডাক্তার চুনীবাবু হয়তো বলিবেন, সিগ্‌রেটে স্বাস্থ্যের হানিকর অনেক রকম জিনিস থাকে। কিন্তু একথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহারই মতো বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ স্বচ্ছন্দে অকুতোভয়ে সুস্থশরীরে খোশমেজাজে বাহালতবিয়তে সিগ্‌রেট টানিতেছেন, তাহাও দেখিতেছি। হুঁকায় যেভাবে তামাকু খাওয়া হয়, মাখা তামাকুকে যেভাবে নরম করিয়া ফেলা হয়, জলের ভিতর দিয়া টানিবার সময় ইহার বিষাক্ত ভাগকে যেভাবে কাবু করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ইহার উগ্রতা অনেকটা কমিয়া যায়, সুতরাং মাদকতা শক্তিও

অনেকটা নষ্ট হয়, ইত্যাদি যুক্তিও প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ হইল বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব, আমরা অব্যবসায়ী, এসব কথা আমাদের মুখে ভালো শুনাইবে না। সাবেক গুড়ুক খাওয়া ও হালের সিগ্‌রেট টানা—এ দুটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। বিজ্ঞানের স্বাস্থ্যতত্ত্বের নজির তুলিব না, বা সুরুচির দোহাই দিব না। আশা করি, এই মন্তব্য সুধী-সমাজে নিরপেক্ষ ও অপক্ষপাতী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আমার মনে হয়, এই দুইটি সামান্য ব্যাপারের তুলনায় সমালোচনা করিলে ভারতীয় সভ্যতা ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভেদটা বেশ ফুটিয়া উঠে। অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের ন্যায়, এক্ষেত্রেও ভারতীয় সমাজতন্ত্রতা ও ইউরোপীয় ব্যক্তিতন্ত্রতা স্পষ্টীভূত। কথাটা খোলসা করিয়া বুঝাইতেছি।

প্রথমতঃ দেখুন, সিগ্‌রেটে সবই তৈয়ারি থাকে, কিছু করাকর্মার দরকার হয় না, ঠিক যেন হোটেলে খাওয়া। অতএব ইউরোপীয় সমাজের স্পষ্ট ছায়া। তাহার পর সিগ্‌রেট একা একা টানিতে হয়, কাহাকেও ভাগ দেওয়া চলে না।* নিজের পকেট হইতে সিগ্‌রেট-কেস ও দিয়াশলাই-এর বাক্স বাহির করিলাম, নিজে দিয়াশলাই জ্বালিলাম। নিজে সিগ্‌রেট ধরাইলাম (স্বয়ংসিদ্ধ যাহাকে বলে), তারপর নিজে হুস হুস করিয়া টানিলাম, আর নিঃশেষ করিয়া টানিতে টানিতে যখন ঠোঁটে ঈষৎ উত্তাপ অনুভব করিলাম, তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম ; বস্ আপৎশান্তি। কাহারও তোয়াক্কা নাই, কাহারও খাতির নাই, কাহারও মুখাপেক্ষা নাই, দশজনকে ভাগ দেওয়া নাই। পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গের লাভ—ধূমের যন্ত্রণা, দুর্গন্ধের লাঞ্ছনা ও ক্বচিৎ উড়ো ছাই গায়ে পড়া। ইউরোপীয় সমাজের স্ব-স্ব-প্রধান ভাবের হুবহু নকল। অবশ্য সিগ্‌রেট-কেস হইতে বাহির করিয়া এক-একটি সিগ্‌রেট পার্শ্বস্থ ভদ্রলোকদিগকে দিয়াশলাই সমেত offer করা যায় বটে, কিন্তু এক হুঁকায় বা এক কলিকায় তামাক খাওয়ার মতো ইহাতে তেমন হৃদ্যতা হয় কি ? হুঁকা বা কলিকা যেমন অসংকোচে গ্রহণ করা হয়, সিগ্‌রেট তেমনভাবে গ্রহণ করিতে যেন কেমন একটা দীনতা প্রকাশ হয়।

* কোনো কোনো স্থলে একটি সিগ্‌রেট দুই ইয়ারকে টানিতে দেখিয়াছি—কিন্তু আশা করি আমার পাঠকবর্গের মধ্যে এমন লোক কেহ নাই।

আর তামাকু—এক কলিকা তামাকু অনেকক্ষণ পোড়ে, বহু লোক প্রতিপালন হয়, সিগ্‌রেট এক মিনিটে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, একজন বই খাইতে পারে না। তামাকু এক কলিকা সাজো, তৈয়ারি তামাকু দশজনকে পরিবেষণ কর, অপরিচিত লোকও চাহিয়া খাইবে, লজ্জা বা সংকোচ করিবে না, মানের হানি হইবে না। ইতর জাতি হইলে কলিকা খুলিয়া প্রসাদ দাও, জাতিভেদের কঠিন নিয়মও তামাকুর কল্যাণে কতকটা শিথিল হইয়া যায়—যেমন 'কয়লাকো ময়লা ছোট্টে যব আগ্ করে পরবেশ'। তামাকু সাজিবার সময় কেহ বা হুঁকার জল ফিরাইল, কেহ বা নল্‌চেয় ছিঁচকে দিল, কেহ বা ঠিকরের চেষ্টায় গেল, কেহ বা টিকে ধরাইল, কেহ বা কড়া ও নরম তামাকু ঠিকমত মিশাইয়া লইল, কেহ বা তামাক সাজিল, কেহ বা কলিকায় ফুঁ দিল, কেহ বা আমপাতার নল তৈয়ারি করিল, সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছে—ঠিক হিন্দু পরিবারের তথা হিন্দু-সমাজের প্রতিরূপ। ফল কথা, ইহাতে কেমন সৌহার্দ্য, কেমন হৃদ্যতা, কেমন অন্তরঙ্গতা, কেমন সামাজিকতা, কেমন 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভাব, বলুন দেখি ?

তবে দৈবাৎ দুই একজন লোক দেখা যায় বটে, তাঁহারা অপরের উচ্ছিষ্ট হুঁকায়, এমন কি অপরের টানা কলিকায়, খান না—যেমন অনেকে স্বপাক ছাড়া আহার করেন না। সেটা অবশ্য নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা, স্পর্শদোষ-পরিহারের উৎকট চেষ্টা, অথবা বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক ব্যাসিলাস্-নিবারণের বিধিমত ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার, অতএব ধর্তব্য নহে, ফরশি আলবোলা গড়াগড়া গুড়গুড়ির বেলায় এরূপ বারোইয়ারি ভাব থাকে না বটে, ওসব যন্ত্রও নিজস্ব (বা reserved)—কিন্তু সেটা বড়োমানুষি, আমিরি। বঙ্কিমচন্দ্র পদ-গৌরব ও বংশ-গৌরবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেবেন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকান্ত রায়, রমণবাবু, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি ধনীদিগের প্রসঙ্গে আলবোলা গড়গড়া সটকার গুণ গাহিয়াছেন। আমরা 'রামচাঁদ শ্যামচাঁদের' মত সাধারণ গৃহস্থের কথাই বলিতেছি।*

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গুড়ুকের পূর্ববর্ণিত সামাজিকতা গুণ থাকাতে কেহ বাড়ি আসিলে আমরা তাহাকে তামাকু সাজিয়া দিয়া অভ্যর্থনা করি।

* ইষ্টমন্ত্রজপ ও পাড়ার বারোইয়ারি পূজায় যে প্রভেদ, ফরশি গড়গড়া গুড়গুড়িতে ও হুঁকায় সেই প্রভেদ। ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্।

(ইদানীং চা ও সিগ্রেট এই সনাতনী প্রথার লোপ করিতে বসিয়াছে।) অতএব যাঁহারা প্রাচীন সমাজের পক্ষপাতী, আশা করি, তাঁহারা পূজার বাজারে স্বদেশী মেলায় এক আধ সের ফৌজদারী বালাখানার মিঠেকড়া তামাকু কিনিয়া পল্লীভবনে ফিরিবেন ও দশজন প্রতিবেশীকে খাওয়াইয়া, হিন্দু গৃহস্থের কর্তব্য পালন করিবেন। বলা বাহুল্য, আমার এই অনুরোধ খাঁটি নিঃস্বার্থ পরোপকার—কেন না, 'জনম অবধি হম' ও-রস-বঞ্চিতা। তথাপি যেমন—

"অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্।
অনধিগত-পরিমলা হি হরতি দৃশং মালতীমালা॥"

তেমনি অজ্ঞাতস্বাদ হইলেও মশলাদার তামাকু ঘ্রাণেই আমাকে মশগুল করিয়াছে। আর শাস্ত্রেও আছে—ঘ্রাণেই অর্ধভোজন।

প্র্যাক্‌টিক্যাল

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইঁহারা প্র্যাকৃটিক্যাল, অর্থাৎ পরম সাবধানী এক একটি বিজ্ঞ বক, ঝোপ না বুঝিয়া কোপ মারেন না, এবং কোপ দেখিলেই ঝোপে লুকান। সর্বদাই সতর্ক এবং সন্দিহান, ছাতা ঘাড়ে, খাতা হাতে, মাথায় গোল-টুপি, পকেটে ছুরি কাঁচি, দড়াদড়ি, কাগজপত্র, এবং একখণ্ড নামের আদ্যক্ষরযুক্ত রুমাল মুখ বাড়াইয়া। দলের কেহ কেহ এখন চোখে চশমাও দেন এবং চশমার উপর দিয়া ভিন্ন দেখেন না। লোকের নাকের উপর যখন খাতা ধরেন, তখন অবিচলন পক্ষে চশমায় অনেকটা সহায়তা করে। একে ত স্বভাবতঃই চক্ষুলজ্জা ইঁহাদের কম, তাহার উপরে কাচের চশমা, সোনায় সোহাগা!

সাধারণের নিকট প্র্যাকৃটিক্যাল বলিয়াই ইঁহারা আপনাদের পরিচয় দেন, সুতরাং আমরাও তাহাই দিলাম। মা বীণাপাণির সহিত বিমাতৃসম্বন্ধ জ্ঞাপনার্থেই নাকি ইঁহারা এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ এমন দুর্নাম না রটনা করে যে, ইঁহাদিগকে নিংড়াইয়া এক বিন্দু রস বাহির করা যাইতে পারে। কবিতা পড়েন না, কাব্যালাপ করেন না, আকাশে চাঁদ উঠিলে এবং উঠানে ঘাস গজাইলে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকেন, প্রেয়সীর প্রেমে মজেন না, উদরের বাহিরে বুঝেন না,—অন্ততঃ বুঝিবার কিছু আছে স্বীকার করেন না, এবং আপনার বাহিরে বুঝদার বলিয়া কাহাকেও মানেন না। প্র্যাকৃটিক্যালের এই সব লক্ষণ। তবে গোপনে প্রেয়সীকে কে কি পত্র লেখেন, এবং তাহাতে কখন কি রস থাকে না থাকে, সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে অক্ষম। এ পর্যন্ত তো কোনও প্রেয়সী আমাদের কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার প্র্যাকৃটিক্যাল প্রেয়ানের চিঠিপত্র দেখিতে পাঠান নাই। বোধ করি, পৃথিবীতে এরূপ সাধারণ হিতৈষিণী প্রেয়সী নিতান্ত বিরলা। কিন্তু যেরূপ দিনকাল পড়িতেছে, এরূপ গুণসম্পন্না প্রেয়সীর ঐকান্তিক আবশ্যক সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না।

কবির প্রতি প্র্যাকৃটিক্যালদিগের পিঠ-থাবড়ানো ভাব। যেন কবিত্ব ছেলে-মানুষি বই আর কিছুই নয়, কবি কেবল নির্বোধের নামান্তর মাত্র। সুতরাং

বিজ্ঞ প্র্যাক্‌টিক্যালগণ কি করেন? তাঁহারা উপেক্ষাভরে একটু মুচ্‌কিয়া হাসেন, পিঠ থাবড়াইয়া বিজ্ঞতাসহকারে উপদেশ দেন, যথাসাধ্য পৃথিবীর হিতেচ্ছায় জ্যোৎস্না, ফুল, পাখি, বাতাসকে বিদায় দিতে অনুরোধ করেন। ছন্দে যদি একান্তই লিখিতেই বাসনা থাকে, ম্যাঞ্চেস্টারের দুরভিসন্ধি, বিলাতী পার্লামেন্টে বাঙালী প্রতিনিধি, রেলের গাড়িতে তৃতীয়শ্রেণীর আরোহীদের দুর্দশা, কত ধানে কত চাল, কত প্র্যাক্‌টিক্যাল বুদ্ধিতে কি পরিমাণে কার্যসিদ্ধি, এবং জ্যোৎস্না মলয় ইত্যাদি সৃজনে বিধাতা অতিবুদ্ধি প্র্যাক্‌টিক্যালগণের কার্যসিদ্ধি পথে কত দুস্তর বাধা-বিঘ্ন অর্পণ করিয়াছেন, এবং কাজের লোক প্র্যাক্‌টিক্যালের এই সকল বিধাতৃ-বিহিত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কিরূপে অসাধ্য সাধন করেন, এই সকল হৃদয়োত্তেজক হিতকর বিষয়ের অবতারণা করুন।

অকূল সংসারে বাধাবিঘ্নের এইরূপ দারুণ প্রতিপত্তি হওয়ায় প্র্যাক্‌টিক্যাল-দিগের সময়ের বড়ো টানাটানি, এমন কি, লোক দেখিলে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পর্যন্ত থাকে না। হাতে কাজ কত! ঘড়ি খুলিতে বন্ধ করিতেই দিনে এমন কত সময় যায়! ইহার উপর আবার পকেটসাৎ করিতে সময় লাগে! আলস্য নাকি ইঁহাদের স্বভাবের নিতান্ত বিরুদ্ধ, তাই রক্ষা। এক দণ্ড ইঁহারা স্থির হইয়া থাকেন না, নাকে-মুখে-চোখে কাজের হিসাব ফেনাইয়া উঠে। অবোধ লোকে ঠাহরায়, ইঁহারা আপনার কথায় পাঁচ কাহন। কিন্তু অহংকার ইঁহাদের এমনি অস্বাভাবিক যে, আত্মগোপন না করিয়া থাকিতে পারেন না, কেবল গোপনকার্যে তাদৃশী ব্যুৎপত্তি না থাকায়, আপনাকেই বারবার বাহির করিয়া বসেন। কিন্তু পাঠকেরা মনে রাখিবেন, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছাপূর্বক আদবেই নহে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, প্র্যাক্‌টিক্যাল শব্দে আমরা বিষয়বুদ্ধির প্রতি আক্রমণ করিতেছি। কিন্তু এরূপ অভিসন্ধি আমাদের কুত্রাপি নাই। সকল প্রকার ভান এবং অতির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি। কবিত্বের সহিত সেন্টিমেন্ট্যালের যেরূপ সম্বন্ধ, বিষয়-বুদ্ধির সহিত প্র্যাক্‌টিক্যালেরও প্রায় সেই সম্বন্ধ। প্র্যাক্‌টিক্যাল হওয়া একদল লোকের ফ্যাশান। হাঁক-ডাক-দৌড়াদৌড়ি করিয়া কাজের ভানে আপনাকে এবং অন্যকে প্রবঞ্চিত করাই ইঁহাদের কাজ। কাজ যে কখনও কিছু হয় না এমন নয়, কিন্তু গর্জনই প্রবল। অতি সহজসাধ্য কাজও খুব গুরুতর

করিয়া না করিলে চলে না। সেন্টিমেন্ট্যালের মতো ইঁহাদেরও একরূপ অস্বাভাবিক ছট্‌ফটানি দেখা যায়। প্রভেদের মধ্যে একদল কবিয়ানা করে, অপর দল কাজীয়ানা।

প্রেম ও ডাণ্ডা

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেজে ঘষে রূপ আর ধ'রে-বেঁধে প্রেম—এটা নাকি হবার জো নেই। কিন্তু আমার মনে হয় এত বড়ো মিথ্যে কথা দুনিয়ায় খুব কমই পাচার হয়েছে। মেজে ঘষে যদি রূপ না ফুটতো তাহলে তো আমাদের থিয়েটারগুলি একেবারে অচল হয়ে যেতো। এই দেখ না আমাদের খেঁদী সুন্দরীকে। ইনি যখন আলুচেরা চোখগুলিতে সুর্মা লাগিয়ে, চুলগুলি ফুলিয়ে দিয়ে কপালের পরিমাণ ঢেকে ফেলে জেঁাকের মতো ঠোঁট দুখানিতে তরল আলতা লাগিয়ে সুমুখে এসে দাঁড়ান, তখন সাক্ষাৎ দুর্বাসার দশ বছরের তপস্যা ভেঙে যাবার যোগাড় হ'য়ে যায়। অরূপের মধ্যে রূপ ফোটানো এই তো সৃষ্টির গোড়ার কথা।

আর তারপর ধ'রে-বেঁধে প্রেম। হয় না বলছো? বলি, জাহাঙ্গীর বাদশা যখন নূরজাহান বিবিকে বর্ধমান থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেন তখন ব্যাপারটা যে খুব নন-ভায়োলেন্ট রকমের হয়নি একথা ইতিহাসে তো লেখে। বেগম-সাহেবা যে প্রথমটা চ'টে একেবারে লাল হয়ে তাঁর সতীত্ব প্রমাণ করেছিলেন, এ প্রমাণও পাওয়া যায়। কিন্তু তিন দিন যেতে না যেতে রাগের লালটুকু যে প্রেমের গোলাপীতে পরিণত হয়েছিলো, এ-কথা তো আর অস্বীকার করবার জো নেই। ম্যাদামারা ভালোমানুষ স্বামীর স্ত্রী দজ্জাল, আর দস্যি স্বামীর স্ত্রী হয় একেবারে মেনী বেড়ালটির মতো পতিব্রতা—কেন বলো দেখি? স্বামী যেখানে মডারেট, স্ত্রী সেখানে একদম সাফ্রেজিট।

রাজনীতিতে যেমন দুটো রাস্তা—মডারেট আর এক্সট্রিমিস্ট, প্রেমনীতিতেও ঠিক তাই। এ-কালের মডারেট প্রেমিকেরা লতানে চুলে সিঁথি কেটে প্রেমিকার পানে কাতর দৃষ্টি হানতে হানতে কবিতার খাতা বোঝাই করেন; আর সেকালের এক্সট্রিমিস্ট প্রেমিকেরা, বেড়ালে যেমন ক'রে ইঁদুর ধরে, তেমনি প্রেমিকাকে বগলে পুরে ঘোড়ায় চ'ড়ে পগার পার হতেন। ছিঁচকাঁদুনে প্রেমের চেয়ে যে মিলিটারী প্রেমটা জমতো ভালো, তার সাক্ষী ইতিহাস আর পুরাণ।

আমাদের প্রপিতামহীরা যে প্রপিতামহদের সঙ্গে চিতায় পুড়ে স্বর্গে চ'লে যেতেন সেটা শুধু স্বর্গে গিয়েও ঐ মিঠে মিঠে জবরদস্তিটুকু পাবার লোভে। বিশ্বাস না হয় গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ।

* * *

রাজনীতির দিকেও চেয়ে দেখ না। সেখানেও প্রেম আদায় করবার জন্যে মন্ত্র হচ্ছে জবরদস্তি। ওয়াশিংটন যদি কাঁদুনি গেয়ে বলতেন যে আমেরিকা স্বাধীন ক'রে না দিলে তিনি মনের দুঃখে সাতরাত্রি উপোস ক'রে মারা যাবেন, না হয় গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তা'হলে আজ আমেরিকার দুঃখে শেয়ালকুকুর কাঁদতো। আজ যে ইংরেজ আমেরিকার সঙ্গে প্রেমে পড়বার জন্যে এত ব্যস্ত তার মূলে হচ্ছে ঐ ওয়াশিংটনের ডাণ্ডা। তাল বুঝে ঐ ডাণ্ডা লাগাতে পারলে, নবদ্বার ভেদ ক'রে প্রেমের প্রবাহ ছুটবেই ছুটবে।

নামতত্ত্ব

রাজশেখর বসু

হরিনাম নয়, সাধারণ বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের নামের কথা বলিতেছি।

কবি যাহাই বলুন, নাম নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস নয়। পুত্রকন্যার নামকরণের সময় অনেকেই মাথা ঘামাইয়া থাকেন। অতএব নাম লইয়া একটু আলোচনা করা নিরর্থক হইবে না।

প্রথম প্রশ্ন—বাঙালীর সংক্ষিপ্ত নাম কিরকম হওয়া উচিত। মিস্টার ব্রাউনের নকলে মিস্টার ব্যানার্জি চলিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক হাজার আছেন। এত বড়ো গোষ্ঠীর প্রত্যেকে যদি মিস্টার ব্যানার্জি হইতে চান তবে লোক-চেনা মুশকিল। বিলাতী প্রথার অন্ধ অনুকরণে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। পাড়াগাঁয়ে বা অন্তরঙ্গগণের মধ্যে বাঁড়ুজ্যে-মশায় চলিতে পারে, কারণ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে লোক-চেনা সহজ। কিন্তু সর্বসাধারণের কাছে বাঁড়ুজ্যে বলিলে ব্যক্তি-বিশেষকে বোঝায় না। সুরেন্দ্রবাবু বরং ভালো। সুরেন্দ্রের সংখ্যা অনেক হইলেও বোধ হয় বাঁড়ুজ্যের সংখ্যা অপেক্ষা কম। যদি নামের বিশেষ করা বাঞ্ছনীয় হয় তবে নামকরণের সময় সুরেন্দ্রের পরিবর্তে অন্য কোনও অসাধারণ নাম রাখা যাইতে পারে। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেশি রকম রূপান্তরিত করা অসম্ভব। বাঁড়ুজ্যে, ব্যানার্জি, বনারজি—বড়ো জোর বানরজি। সুরেন্দ্রবাবুতে অরুচি হইলে মিস্টার সুরেন্দ্র বা শ্রীযুত সুরেন্দ্র বা সুরেন্দ্রজী চলিতে পারে। কেউ হয়তো বলিবেন—বাপের নাম মিস্টার সুরেন্দ্র আর ছেলের নাম মিস্টার রমেশ ইহা বড়ো বিসদৃশ; মিস্টার ব্রাউনের পুত্র মিস্টার ব্ল্যাক—এ রকম বিলাতী নজির নাই। বাপের নাম বজায় রাখার উদ্দেশ্য সাধু; কিন্তু তাহা অন্য উপায়েও হইতে পারে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশে পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যোগ করার রীতি আছে। বংশ-গত পদবীটা ছাড়িতে বলিতেছি না, পুরা নাম বলিবার সময় ব্যবহার করিতে পারেন। মিস্টার সুরেন্দ্র যদি স্বনামে জগদ্বিখ্যাত হন তবে বংশপরিচয় না দিলেও চলিবে। কালিদাস পাঁড়ে ছিলেন কি চৌবে ছিলেন, সক্রেটিস কোন

কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহা এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু সেজন্য কোনও ক্ষতি হয় নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—নাম শ্রীযুক্ত না শ্রীহীন হইবে। এই জটিল বিষয় লইয়া অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। শ্রী-বিরোধী বলেন—শ্রী-অর্থে ভাগ্যবান, নিজের নামে যোগ করিলে সৌভাগ্যগর্ব প্রকাশ পায়; আর অক্ষরটিও নিষ্প্রয়োজন বোঝা মাত্র। শ্রীর আদিম অর্থ যাহাই হউক সাধারণে এখন গতানুগতিক ভাবেই ব্যবহার করে, অতএব গর্বের অপবাদ নিতান্ত ভিত্তিহীন। যিনি অনাবশ্যক বোধে ভার কমাইতে চান তিনি শ্রী বর্জন করিতে পারেন। তবে অনেকে যেসব ভারি ভারি বোঝা নামের সঙ্গে যোগ করিবার জন্য লালায়িত তাহার তুলনায় শ্রী-অক্ষরটি নগণ্য।

তাহার পর সমস্যা নামের গঠন লইয়া। বাঙালী পুরুষের নাম প্রায় দুই শব্দ-বিশিষ্ট, যথা—নরেন্দ্র-নাথ, নরেন্দ্র-কৃষ্ণ। দুই শব্দ কি সমাসবদ্ধ না পৃথক? ষষ্ঠীতৎপুরুষে নরেন্দ্রনাথও তদ্রূপ, অর্থাৎ রাজার রাজা তস্য রাজা। নরেন্দ্রকৃষ্ণ বোধ হয় দ্বন্দ্ব সমাস, অর্থাৎ ইনি নরেন্দ্র বটেন কৃষ্ণও বটেন। নরেন্দ্রলাল সংস্কৃত-ফারসীর খিচুড়ি, ভাবার্থ বোধ হয় নরেন্দ্র নামক দুলাল। নিবারণচন্দ্র বোঝা যায় না, হয়তো আন্নাকালীর পুং সংস্করণ। মোট কথা, লোকে ব্যাকরণ অভিধান দেখিয়া নাম রাখে না, শুনিতে ভালো হইলেই হইল। রাজা-মহারাজেরা গালভরা নাম চান, যথা জগদিন্দ্রনারায়ণ, ক্ষৌণীশ-চন্দ্র। কিন্তু তাঁহারা বিলাতী অভিজাতবর্গের তুলনায় অনেক অল্পে তুষ্ট। George Fitzpatrick Fitzgerald Marmaduke Baron Figgins—এরকম নাম এখনও এদেশে চলে নাই। উড়িষ্যায় আছে বটে—শ্রীনন্দনন্দন হরিচন্দন ভ্রমরবর রায়। সুখের বিষয় আজকাল অনেক বাঙালী ছোটোখাটো নাম পছন্দ করিতেছেন।

বাঙালী বিদ্যাভিমানী শৌখিন জাতি। শরীরে আর্যরক্তের যতই অভাব থাকুক, বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক নাম বাঙালীর যত আছে অন্য জাতির বোধ হয় তত নাই। তথাপি অর্থবিভ্রাট অনেক দেখা যায়। মন্মথর পুত্র সন্মথ, শ্রীপতির পুত্র সাতকড়িপতি, তারাপদর ভাই হীরাপদ, রাজকৃষ্ণের ভাই ধীরাজকৃষ্ণ দুর্লভ নয়।

আর এক ভাবিবার বিষয়—নামের ব্যঞ্জনা বা Connotation। যেসকল নাম অনেক দিন হইতে চলিতেছে তাহা শুনিলে মনে কোনও রূপ ভাবের উদ্রেক

হয় না। নরেন্দ্রনাথ বা এককড়ি শুনিলে মনে আসে না নামধারী বড়োলোক বা কাঙাল। রমণীমোহন সুপ্রচলিত সেজন্য অতি নিরীহ, কিন্তু মহিলামোহন শুনিলে lady-killer মনে আসে। অনিলকুমার নাম বোধহয় রামায়ণে নাই, সেজন্য ইহা এখন শৌখিন নামরূপে গণ্য হইয়াছে, কিন্তু পবননন্দন নাম হইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দুরূহ। কালিদাসী সেকেলে হইলেও অচল নয়, কালী-নন্দিনীর বিবাহের আশা কম, নাম শুনিলেই মনে আসিবে রক্ষাকালীর বাচ্চা। অতএব নামকরণের সময় ভাবার্থের উপর একটু দৃষ্টি রাখা ভালো। আজকাল পুরুষের মোলায়েম নাম অতিমাত্রায় চলিতেছে। রমণী, কামিনী, সরোজ, শিশির, নলিনী, অমিয় ইত্যাদি নাম পুরুষরা অনেক দিন হইতে বেদখল করিয়াছেন, এখন আবার কুসুম, মৃণাল, জ্যোৎস্না লইয়া টানাটানি করিতেছেন। চলন হইয়া গেলে অবশ্য সকল নামের ব্যঞ্জনা লোপ পায় কিন্তু কোমল নারীজনোচিত নামের বাহুল্য দেখিয়া বোধ হয় বাঙালী পিতামাতা পুত্র-সন্তানকে কমলবিলাসী সুকুমার করিতে চান।

পুরুষের নাম একটু জবরদস্ত হইলেই ভালো হয়। ঘটোৎকচ বা খড়্‌গেশ্বর নাম রাখিতে বলি না, কিন্তু যাহা আমরণ নানা অবস্থায় ব্যবহার করিতে হইবে তাহা একটু টেকসই গরদখোর হওয়া দরকার। উপন্যাসের নায়ক তরুণকুমার হইতে পারেন, কারণ কাহিনী শেষ হইলে তাঁহার বয়স আর বাড়িবে না। কিন্তু জীবন্ত তরুণকুমারের বয়স বাড়িয়া গেলে নামটা আর খাপ খায় না। বালকের নাম চঞ্চলকুমার হইলে বেমানান হয় না, কিন্তু উক্ত নামধারী যদি চল্লিশ পার হইয়া মোটা থপথপে হইয়া পড়েন তবে চিন্তার কথা। জ্যোৎস্নাকুমার কবি বা গায়ক হইলে মানায়, কিন্তু চামড়ার দালালি বা পুলিশ কোর্টে ওকালতি তাঁহার সাজে না।

মেয়েদের বেলা বোধ হয় এতটা ভাবিবার দরকার নাই। তাঁহারা সুরূপা, কুরূপা, বালিকা, বৃদ্ধা যাহাই হউন, নামটা তাঁহাদের অঙ্গের অলংকার বা বেনারসী শাড়ির মতোই সর্বাবস্থায় সহনীয়।

কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে আর একদিক হইতে কিছু ভাবিবার আছে। কিছু-কাল পূর্বে এক মাসিক পত্রিকায় প্রশ্ন উঠিয়াছিল—মেয়েদের যেমন নামের আগে মিস বা মিসেস যোগ হয় বাঙালী মহিলার নামে সেরূপ কিছু হইবে কিনা। অবিবাহিতা বাঙালী মেয়ের নামের আগে আজকাল কুমারী লেখা হয়, কিন্তু বিবাহিতার বিশেষণ দেখা যায় না। ভারতের কয়েকটি প্রদেশে

সধবাসূচক শ্রীমতি বা সৌভাগ্যবতী চলিতেছে। জিজ্ঞাসা করি—কুমারী বা বা সধবা বা বিধবাসূচক বিশেষণের কিছুমাত্র দরকার আছে কি ? পুরুষের বেলা তো না হইলেও চলে। স্ত্রীজাতি কি নিলামের মাল যে নামের সঙ্গে for sale অথবা sold টিকিট মারা থাকিবে ? বিলাতী প্রথার কারণ বোধহয় এই যে বিলাতী সমাজে নারীর উপযাচিকা হইয়া পতিপ্রার্থনা করিবার রীতি এখনও তেমন চলে নাই, সেজন্য পুরুষ বিবাহিত কিনা তাহা নারীর না জানিলেও চলে। কিন্তু বিবাহার্থী পুরুষ আগেই জানিতে চায় নারী অনূঢ়া কিনা। এদেশে অধিকাংশ বিবাহই ভালোরকম খোঁজখবর লইয়া সম্পাদিত হয়, সেজন্য নারীর নামে মার্কা দেওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক।

পরিশেষে আর একটি কথা নিবেদন করি। বাঙালী মহিলা দ্বিজবর্ণা হইলে দেবী লেখেন। যাঁহারা দ্বিজা নহেন তাঁহারা সেকালে দাসী লিখিতেন, এখন স্বামীর পদবী বা অনূঢ়া হইলে পিতৃপদবী লেখেন। যাঁহারা দ্বিজাতির দেবত্বের দাবি করেন তাঁহারা দেবী লিখুন, কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যে সকল মহিলা বংশগত শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করেন না তাঁহারা কেন নামের শেষে দেবী লিখিয়া দ্বিজেতরা নারী হইতে পৃথক গণ্ডিতে থাকিবেন ? অবশ্য নারী মাত্রই যদি দেবী হন তবে আপত্তির কারণ নাই, বরং একটা সুবিধা হইতে পারে। অনাত্মীয়া অথচ সুপরিচিতা মহিলাকে মাসী পিসী দিদি বউদিদি বলিয়া অথবা নাম ধরিয়া ডাকা চলে। কিন্তু অল্পপরিচিতার সঙ্গে হঠাৎ সম্বন্ধ পাতানো যায় না, কেবল নাম ধরিয়া ডাকাও বেয়াদবি। যদি নামের সঙ্গে দেবী যোগ করিয়া ডাকার প্রচলন হয় তবে বাংলা কথাবার্তায় শ্রুতিকটু মিস আর মিসিস বাদ দেওয়া চলে। কুমারী বা বিবাহিতা তরুণী বা বৃদ্ধা যাহাই হউন, 'শুনছেন অমুকা দেবী' বলিয়া ডাকিলে দোষ কি ?

গণেশ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

সর্ববিঘ্নহর ও সর্বসিদ্ধিদাতা ব'লে যে দেবতাটি হিন্দুর পূজা-পার্বণে সর্বাগ্রে পূজা পান, তাঁর 'গণেশ' নামেই পরিচয় যে তিনি 'গণ' অর্থাৎ জনসঙ্ঘের দেবতা। এ থেকে যেন কেউ অনুমান না করেন যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজের যাঁরা মাথা, তাঁরা জনসঙ্ঘের উপর অশেষ ভক্তিমান ও প্রীতিমান ছিলেন। যেমন আর সব সমাজের মাথা, তেমনি তাঁরাও সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তিকে ভক্তি করতেন না, ভয় করতেন। 'গণেশ' দেবতাটির আদিম পরিকল্পনায় এর বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আদিতে 'গণেশ' ছিলেন কর্মসিদ্ধির দেবতা নয়, কর্মবিঘ্নের দেবতা। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির মতে এঁর দৃষ্টি পড়লে রাজার ছেলে রাজ্য পায় না, কুমারীর বিয়ে হয় না, বেদজ্ঞ আচার্যত্ব পান না, ছাত্রের বিদ্যা হয় না, বণিক ব্যবসায়ে লাভ করতে পারে না, চাষীর ক্ষেতে ফসল ফলে না। এই জন্যই 'গণেশে'র অনেক প্রাচীন পাথরের মূর্তিতে দেখা যায় যে, শিল্পী তাঁকে অতি ভয়ানক চেহারা দিয়ে গড়েছে। এবং গণেশের যে পূজা, তা ছিলো এই ভয়ংকর দেবতাটিকে শান্ত রাখবার জন্য ; তিনি কাজকর্মের উপর দৃষ্টি না দেন, সেজন্য ঘুষের ব্যবস্থা। গণ-শক্তির উপর প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কর্তাদের মনোভাব কি ছিল, তা গণেশের নরশরীরের উপর জানোয়ারের মাথার কল্পনাতেই প্রকাশ।

কিন্তু এ মনোভাব প্রাচীন হিন্দুর একচেটিয়া নয়। সকল সভ্যতা ও সমাজের কর্তারাই জনসঙ্ঘকে 'লম্বোদর গজানন' ব'লেই জেনেছেন। ওর হাত-পা মানুষের, কিন্তু ওর কাঁধের উপর যে মাথাটি তা মানুষের নয়, মনুষ্যেতর জীবের। আর ওর উদর এত প্রকাণ্ড যে, তাকে যথার্থ ভরাতে হ'লে, যাদের কাঁধের উপর মানুষের মাথা, তাদের সুখ-সুবিধার উপকরণ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং সব দেশের যারা বুদ্ধিমান লোক, তারা, মগজে মানুষের বুদ্ধির পরিবর্তে জানোয়ারের নির্বুদ্ধিতা রয়েছে ভরসায়, ওর বিরাট উদরের যতটা খালি রেখে সারা যায়, সেই চেষ্টা ক'রে এসেছে। সেইজন্য কখনও তাকে অঙ্কুশে ক্লিষ্ট, কখনও বা খোসামোদে তুষ্ট করতে হয়েছে। কারণ আদিকাল থেকে একাল

পর্যন্ত কোনও 'পলিটিশ্যানের পলিটিক্যাল খেলা' এ-দেবতাটির সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয়নি। অথচ সে সাহায্য পেতে হবে বিশেষ খরচের মধ্যে না গিয়ে। অর্থাৎ গণদেবতার পূজায় ভোগের উপকরণের দৈন্য সকলেই মন্ত্রের বহরে পূরণ করেছে;—'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা,' 'গণবাণীই ভগবদ্বাণী,' 'সুরাজ থেকে স্বরাজ শ্রেষ্ঠ,' 'জননায়ক হচ্ছে জনসেবক,' ইত্যাদি। এবং সকলেই 'লম্বোদর গজেন্দ্রবদনে'র সৌন্দর্যবর্ণনায় শ্লোক রচনা ক'রে তাকে তোষামোদে খুসি করেছে।

যারা গণদেবতাকে খোসামোদে ভুলিয়ে নিজের কাজ হাসিল করতে চায় না, চায় ঐ দেবতাটির নিজের হিত—তাদের এ কথা মেনে নেওয়াই ভালো যে, এ দেবতার মানুষের শরীরের উপর গজমুণ্ডের কল্পনা একেবারে মিথ্যা কল্পনা নয়। কোন শনির কুদৃষ্টিতে এর নরমুণ্ড খসেছে সে ঝগড়া আজ নিরর্থক। কোন দেবতার শুভদৃষ্টি এর মুণ্ডকে মানুষের মাথায় পরিণত করবে, সেইটি জানাই প্রয়োজন। কারণ, খোসামুদেরা যাই বলুক, মানুষের কাঁধে হাতির মাথা সুন্দর নয়, নিতান্ত অশোভন।

যে দেবতার সুদৃষ্টি এই অঘটন ঘটাতে পারে, তিনি হচ্ছেন বীণাপাণি, যিনি জ্ঞানের দেবতা। এক জ্ঞানের শক্তি ছাড়া গজমুণ্ডকে নরমুণ্ডে পরিবর্তনের ক্ষমতা আর কিছুরই নেই। সুতরাং গণদেবতার যারা হিতকামী, তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এই দেবতাটির মাথার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের তড়িৎ সঞ্চালন করা। জনসঙ্ঘকে সভ্যতার ভারবাহী মাত্র না রেখে, সভ্যতার ফলভোগী করতে হ'লে, প্রথম প্রয়োজন জনসাধারণকে জ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা।—আকাশে বিস্তৃত বিশ্ব ও তার জটিল কার্যকারণজাল, কালে প্রসৃত মানুষের বিচিত্র ইতিহাস, ও এই দেশ ও কালের মধ্যে বর্তমান মানুষের গতি ও পরিণতির জ্ঞান, আজকের দিনের পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের, এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ, ধন উৎপাদন ও বিতরণের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এমন অদ্ভুত জটিল ও বহুবিস্তৃত হ'য়ে উঠছে যে, অজ্ঞান জনসাধারণকে মাঝে মাঝে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে বুদ্ধিমান লোকের নিজের হিত খুব সম্ভব হ'লেও, জনসাধারণের হিত একেবারেই সম্ভব নয়। বাইরের পরামর্শে গড়া ঐ সব সাময়িক উত্তেজনার দল, সঙ্ঘের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের অন্তর্দৃষ্টির অভাবে ক্রমাগত ভেঙে যায়; আর যতদিন টিকে থাকে, ততদিনও ঐ পরামর্শদাতাদের ক্রীড়নক হ'য়েই থাকে।

জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে তার নিজের হিতের পথ নিজেকে চিনতে শেখানো কেবল বহুকষ্টসাধ্য ও অনেক সময়সাপেক্ষ নয়, ঐ দীর্ঘ ঘোরানো পথ ছেড়ে, খাড়া সরল পথে তার হিতচেষ্টার প্রলোভন দমন করাও দুঃসাধ্য। এই নিরন্ন বঞ্চিত মানুষের দলকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে, কেবলমাত্র সংখ্যার জোরে তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করিয়ে দিতে কোন জন-হিতৈষীর না লোভ হয়! কিন্তু, মানুষের প্রকৃতি ও সমাজের গতির দিকে চেয়ে এ লোভ দমন করতে হবে। অজ্ঞান মানুষের খুব বড়ো দলও চক্ষুষ্মান মানুষের ছোটো দলের বিরুদ্ধে অনেক দিন দাঁড়াতে পারে না। এবং পৃথিবীর সব দেশে যে অল্পসংখ্যক লোক জনসাধারণের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের বিরোধী মনে ক'রে তাকে চেপে রেখেছে, তারা আর যা ই হোক, অতি কৌশলী ও বুদ্ধিমান লোক। এদের সঙ্গে লড়তে হ'লে, ভেবে না বুঝলে একদিন ঠেকে শিখতে হবে যে, সরল পথই সোজা পথ নয়।

কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার এইটিই একমাত্র, এমন কি প্রধান প্রয়োজন নয়। জ্ঞান যে বাহুতে বল দেয়, জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠ ফল নয়; জ্ঞানের চরম ফল যে তা চোখে আলো দেয়। জনসাধারণের চোখে জ্ঞানের সেই আলো আনতে হবে, যাতে সে মানুষের সভ্যতার যা সব অমূল্য সৃষ্টি,—তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তার কাব্যকলা—তার মূল্য জানতে পারে। জনসাধারণ যে বঞ্চিত, সে কেবল অন্ন থেকে বঞ্চিত ব'লে নয়, তার দুর্ভাগ্য যে সভ্যতার এই সব অমৃত থেকে সে বঞ্চিত। জনসাধারণকে যে শেখাবে একমাত্র অন্নই তার লক্ষ্য, মনে সে তার হিতৈষী হলেও, কাজে তার স্থান জনসাধারণের বঞ্চকের দলে। পৃথিবীর যে সব দেশে আজ জনসঙ্ঘ মাথা তুলছে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারেই তা সম্ভব হয়েছে। তার কারণ কেবল এই নয় যে, শিক্ষার গুণে পৃথিবীর হালচাল বুঝতে পেরে জনসাধারণ জীবনযুদ্ধে জয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছে। এর একটি প্রধান কারণ সংখ্যার অনুপাতে জনসাধারণের সমাজে শক্তিলাভের যা গুরুতর বাধা, অর্থাৎ সভ্যতালোপের আশঙ্কা, শিক্ষিত জন-সাধারণের বিরুদ্ধে সে বাধার ভিত্তি ক্রমশঃই দুর্বল হ'য়ে আসে। জনসাধারণের বিরুদ্ধে আভিজাত্যের স্বার্থের বাধা সভ্য মানুষের মনের এই আশঙ্কার বলেই এত প্রবল। এই আশঙ্কার মধ্যে যা সত্য আছে, তা যতটা দূর হবে, জনসাধারণের শক্তিলাভের পথের বাধাও ততটা ভেঙে পড়বে। উদর-সর্বস্ব

গজমুণ্ডধারী গণদেবের অভ্যুত্থান স্বার্থান্ধ মানুষ ছাড়া অন্য মানুষের কাছেও বিপৎপাত ব'লেই গণ্য হবে। গণদেবতা যেদিন নরদেহ নিয়ে আসবে, সেদিন তার বিজয়যাত্রার পথ কেউ রুখতে পারবে না।

ক্যাবলের পত্র

সুকুমার রায়

শ্রীমান বাঞ্ছারাম উন্নতিশীলেষু—

তুমি যে আমার কোনো চিঠি পাওনি তার একটা কারণ এই যে আমি তোমায় চিঠি লিখিনি। কারণ ছাড়া যখন কার্য হয় না, তখন চিঠি না লেখবারও অবিশ্যি একটা কারণ থাকা উচিত। তবে কিনা; চিঠি না লেখাটাকে কার্য বলে ধরা যায় কিনা, সেটা একটু ভাবা দরকার। কিছু না করাটাও যদি একটা কাজ হয়, তবে তোমরা পৃথিবীতে কেজো মানুষ আর অকেজো মানুষ বলে যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছ সেটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে পড়ে। তোমরা করেছ বলছি এইজন্যে যে ও দ্বন্দ্বটিকে আমি বরাবরই অস্বীকার করে এসেছি। আমার ধারণা এই যে, আমসত্ত্ব হলেই যেমন আমের আমসত্ত্ব, তেমনি মানুষ মানেই কাজের লোক। ক্রিয়া এবং অস্তিত্ব এ দুটোর মধ্যে তফাতটা কেবল কৃ-ধাতু আর অস্-ধাতুর তফাত, আর ব্যাকরণ মতে সব ধাতুই ক্রিয়াবাচক। "আমি আছি" এই তত্ত্বটিকে ফুটিয়ে বলার নাম কার্য এবং প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মই এই যে সে আপনাকে প্রকাশ করে, অর্থাৎ ফুটিয়ে বলে। জলকে ফোটাতে হলে তাকে আগুনে চড়িয়ে গরম করতে হয় কিন্তু তাই বলে ফুলকে ফোটাবার পক্ষেও উপায়টি খুব প্রশস্ত নাও হতে পারে। জীবনটাকে কাজের মধ্যে নিয়ে যাঁরা চব্বিশঘন্টা টানাটানি করেন, তাঁরা এই সহজ কথাটি বোঝেন না, ওতে করে জীবনটা ফুটে বেরোয় না, কেবল প্রাণটাই ছুটে বেরোয়।

উপনিষদ্ বলেছেন আত্মা অব্যয়, আর ব্যাকরণেও দেখতে পাই যে অব্যয়ের রূপ নেই। কিন্তু জীবনের একটা রূপ আছে, সেটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ। কেন না, জীবনের ক্রিয়া সমাপ্ত হলেই মৃত্যু এবং মৃত্যুটা আর যাই হোক সেটা জীবন নয়। অসমাপিকা হলেও ক্রিয়াপদটি অকর্মক নয়, কারণ ওর একটি উদ্দিষ্ট কর্ম আছে এবং সেই কর্মটিই হচ্ছে আর্ট। রোসো, আগেই তর্ক কোরো না। আর্ট কাকে বলছি সেইটে আগে বুঝবার চেষ্টা কর। তুমি বলতে চাচ্ছ যে বিজ্ঞান পলিটিক্স্ বা ফিলসফি প্রভৃতি ভারি-ভারি কর্মগুলো কি কর্ম নয়?

আমার মতে ওগুলো হচ্ছে ক্রিয়ার উপসর্গ মাত্র। "উপসর্গস্য যোগেন" ক্রিয়ার অর্থ যে ওলট-পালট হয়ে যায়, এটা ব্যাকরণের বিজ্ঞতা এবং সংসারের অভিজ্ঞতা এই দুই তরফেরই সাক্ষী। জীবনের ক্রিয়ার উপর ওরা মোচড় দেয়, কিন্তু কোথাও আঁচড় দিতে পারে না। জীবনের উপর আঁচড় দেওয়া অর্থাৎ আপনার ছাপ এঁকে দেওয়া, অর্থাৎ এককথায় নতুন করে রূপ সৃষ্টি করা, এই জিনিসটাই হচ্ছে আর্ট অর্থাৎ ব্যর্গ্‌সঁ যাকে বলেছেন ক্রিয়েটিভ ইভোলিউশন।

আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে বাঙলা দেশে কেউ ব্যাকরণ পড়ে না এবং পড়তে জানে না। অর্থাৎ আমাদের দেশে রসবোধ ছাড়াও আর একটি বোধের বিশেষ অভাব রয়েছে, সেটা ঐতিহাসিক বোধ নয়, সেটা হচ্ছে মুগ্ধবোধ। তার কারণ, আমাদের দেশে ইতিহাসের মালমশলা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন, মাল এবং মশলার পার্থক্য তাঁরা বোঝেন না। ব্যাকরণের মধ্যে তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মশলা দেখেন কিন্তু ইতিহাসের মাল দেখতে পান না। অথচ এটা অস্বীকার করবার জো নেই যে ও-বস্তুটি হচ্ছে জাতীয় খোশখেয়ালের আস্ত একটি তোষাখানা। সকলেই জানি, ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সব চাইতে বড় তফাত হচ্ছে আকারের তফাত। অর্থাৎ তারা আত্মসর্বস্ব আর আমরা আত্মাসর্বস্ব: ওদের টাকা মাত্র ভরসা, আমাদের টাকা মাত্র ফরসা। ইংরেজের ব্যাকরণে ও আচরণে ফার্স্ট পারসন্‌ হচ্ছেন আমি এবং আমরা। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাকরণটাও বেদাঙ্গ, সুতরাং তাতে পরমার্থ না থাকুক পরমার্থতত্ত্বের কোনো অভাব নেই। তাই আমাদের প্রথম পুরুষ হচ্ছেন ইনি এঁরা তাঁরা। এর মধ্যে দীনতা থাকলেও কোনো রকম হীনতা নেই, কারণ আমি ব্যক্তিটিকে আমরা বরাবর উত্তমপুরুষ বলেই প্রচার করে আসছি। এইখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের আসল তফাত। ওরা অহঙ্কারী বলেই স্বার্থপর হয়ে থাকে, আর আমরা পরার্থপর বলেই অহঙ্কার করিতে পারি।

অধ্যাপক কিউমূরে তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, মিথ্যেটাই হল সাহিত্যের আসল সৃষ্টি—কেন না, সত্যকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। কেবল এইটুকু না বলে তিনি আরো বলতে পারতেন যে, আর্টের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যেটা সৃষ্টিছাড়া সেইটেকে সৃষ্টি করা। বিজ্ঞানের সব সত্যিই যে সত্যি এইটে দেখানোই হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যবসা। সত্যিটার যে কোনো সত্তা নেই আর মিথ্যেটা যে মিথ্যে নয়, এইটেই হচ্ছে দর্শনের সাক্ষী। কেবল আর্টের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সত্য-মিথ্যার স্বত্বসাবস্তের কোনো বালাই নেই, কেন না সাহিত্য হচ্ছে সত্য-মিথ্যার

সব্যসাচী। অর্থাৎ এক কথায় বিজ্ঞান না পড়েই বোঝা যায়, দর্শন পড়লেও বোঝা যায় না, আর সাহিত্যের বেলা বোঝাপড়ার কোনো প্রয়োজনই হয় না। একেই আমি বলেছিলুম, "সাহিত্যের অনাসক্তি"। দুর্ভাগ্যক্রমে কথাটা কারও প্রাণে লাগেনি অর্থাৎ কানে লাগেনি। কেন না, আমাদের দেশের বয়ঃপ্রাপ্ত পণ্ডিতেরাও পড়াশোনা করেন না, তাঁরা কেবল লেখাপড়াই করে থাকেন। আর তাতে করে যে জিনিসটা গজায় সেটা আক্কেল নয়, সেটা হয় টাক নয় টিকি, অর্থাৎ হয় নাস্তিকতা নয় অদ্বৈতবাদ।

দেখ কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে পড়ল। কথা বলবার একটা মস্ত অসুবিধে এই যে বেশি কথা বললে কেউ শুনতে চায় না, আবার অল্পের মধ্যে সংকীর্ণ করে বললে কেউ বুঝতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, অল্প কথার মধ্যে যতটা বাহুল্য থাকে, বেশি কথায় ততটা থাকে না। তাই সাহিত্যের একটা বড় কাজ হচ্ছে সামান্য কথাকে চালিয়ে-চালিয়ে অর্থাৎ এক্সারসাইজ করিয়ে, তার বাহুল্য নষ্ট করা। এক্ষেত্রে যাঁরা সংযমের উপদেশ দিতে আসেন, তাঁদের এই সহজ তত্ত্বটি বুঝিয়ে বলা একেবারেই অসম্ভব যে সাহিত্যের শব্দকে মেরে ভাষাকে জব্দ করা যায়, কিন্তু এ কাজটি সম্যকরূপে যমের উপযুক্ত হলেও তাকে সংযম বলা চলে না।

আমাদের গুরুমশাইরা বলেন যে ভাষাটার বাড়াবাড়ি হলে তার গুরুত্ব থাকে না, কেন না তাতে করে ভাষাটা হয় ভাসা-ভাসা, অর্থাৎ হাল্কা। ও-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ভাষার মধ্যে যে জিনিসটা যথার্থই ভাসে, অর্থাৎ আপনাকে প্রকাশ করে, তাকে ডুবিয়ে দিলে যে ডোবা সাহিত্যের, অর্থাৎ বোবা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাকে শোভন বলা আর মূর্খ বলা একই কথা, কেন না সে "কিঞ্চিন্ন ভাষতে"। ওর মধ্যে আরেকটু কথা আছে, সেটা আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনলুম না। সে কথাটা এই যে, যে-টাকা বাজে সেই টাকাই চলে, যেটা বাজে না সেটা অচল ; সুতরাং সাহিত্যের বাজারে বাজে কথাই চলে ভালো অর্থাৎ সেই কথাটাই চলে যার শব্দের জোর আছে। তুমি ভাবছ এটা নেহাত বাজে কথা। তা হওয়া খুবই সম্ভব, কেন না কথাটা সত্যি।

আমার একটি প্রবন্ধে আমি বলেছিলুন যে, সাহিত্যের উক্তির মধ্যে যুক্তি থাকলেই তার মুক্তি হয় না, তাতে সাহিত্যের বিস্তার হতে পারে কিন্তু তার নিস্তার হওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি আমি এই কথাটির একটি চমৎকার উদাহরণ আবিষ্কার করেছি। 'পল্লীসাহিত্য' বলে একটা কথা আমি অনেকদিন ধরে শুনে

আসছি কিন্তু ও বস্তুটা যে কি তা আমার জানা নেই, অর্থাৎ কাল পর্যন্ত জান ছিল না। সেইজন্য কাশীরাম পণ্ডিতের পল্লীসাহিত্য প্রবন্ধটি আমি আগ্রহ কে অর্থাৎ নিজের পয়সা খরচ করে কিনে এনেছিলুম। কিন্তু প্রবন্ধটি পাঠ কে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, ওতে করে আসল যে কথাটি বলা হচ্ছে, সেট ওর মধ্যে কোথাও বলা হয়নি। বলা কথাটির অর্থই হচ্ছে কিছু কথা বলা, কিং কথার উপর অসামান্য বলপ্রয়োগ করলেই যে বলা কাজটি খুব ভালো কে সম্পন্ন হয়, আমার অন্তত এরকম বিশ্বাস নেই। সাহিত্যকে তাজা করবার জন্ পণ্ডিতমশাই যে রকম তেজ প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর প্রবন্ধটিকে পল্লীসাহিত না বলে মল্লীসাহিত্য অর্থাৎ মেয়েলি কুস্তির সাহিত্য বলা উচিত ছিল, কেন না ওর মধ্যে প্রতাপের চাইতে প্রলাপের মাত্রাই বেশি।

পণ্ডিতমশাই বলতে চান যে সাহিত্যটাকে শহরের বদ্ধবাতাসে আবদ্ধ ন রেখে, তাকে "সহজ সুস্থ পল্লীজীবনের সংস্পর্শে আনা প্রয়োজন" অর্থাৎ তাবে ঘন-ঘন হাওয়া খেতে পাড়াগাঁয়ে পাঠানো দরকার। পণ্ডিতমশাই বলেন "আমি মনে করি ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব।" প্রস্তাবের মাঝখানে "আমি মনে করি" বলে উত্তম পুরুষের অবতারণা করলেই যে প্রস্তাবটা উত্তম হয়ে পড়ে এরকম যুক্তির জন্য ন্যায়শাস্ত্রে অনেক উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা আছে। পণ্ডিতমশাই ভরসা করেন যে তাঁর ব্যবস্থামতো চললে পরে সাহিত্যের ভাব এবং ভাষা হৃষ্ট এবং পুষ্ট হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঠিক তার উল্টো। শহুরে সাহিত্যকে গ্রামের হাওয়া খাইয়ে গ্রাম-ফেড করে পুষতে গেলে যে জিনিসটা পুষ্টিলাভ করে, সেটা "গ্রামার" নয়, সেটা হচ্ছে গ্রাম্যতা।

ব্যর্গ্‌সঁ বলেছেন, মানুষের হাত পা কাটলেও সে বেঁচে ওঠে, কিন্তু তার মুড়োটা কেটে ফেললে আর সে বাঁচতে পারে না। মাথাটা যে ঘাড়ের উপর থাকে, ঘাড়ের পক্ষে তা আপত্তিকর সন্দেহ নেই। কিন্তু ও বস্তুটি যদি ওখানে না থাকত তা হলে তাতে করে দেহটা লঘু হলেও আপত্তিটা আরো গুরুতর হত। কতকগুলো ইংরিজি-পড়া মাথাকে বাংলা সাহিত্যের ঘাড়ের উপর বসতে দেখে, পণ্ডিতমশাই তার মুণ্ডপাত করতে চান, কিন্তু এটা তিনি ভেবে দেখেননি যে তাতে করে তাঁর নিজের প্রবন্ধকেই তিনি কবন্ধ করে ফেলেছেন। যাহোক প্রবন্ধের একটা গুণ আছে, সেটা আমি অস্বীকার করিনে, সেটা এই যে, সাহিত্য বলতে পণ্ডিতমশাই কী বোঝেন সেটা না বুঝলেও, তিনি কী না বোঝেন সেটা ওতে খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যায়।

আমার কোনো-কোনো সমালোচক বলেন যে, আমার ভাষাটা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার অর্থ বোধ হয় এই যে, আমার লেখা পড়লে তাঁদের প্রাণটা জ্বলে কিন্তু জল হয় না। তাই শুনলুম সেদিন একজন আক্ষেপ করে বলেছেন যে আমার কথাগুলো নাকি "সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না"। বোঝা যে যায় না এই কথাটুকু একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্য, কেননা সংসারের কোনো বোঝাই আপনা থেকে যায় না, তাকে কষ্ট করে বয়ে নিতে হয়। কিন্তু সহজ বুদ্ধি বস্তুটা যে কী, সেটা আমি আজ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারলুম না। আমার বরাবর ধারণা এই যে, বুদ্ধি জিনিসটাই সহজ অর্থাৎ ও বস্তুটি ভগবান যাকে দেন তাকে জন্মের সঙ্গেই দিয়ে দেন। এবিষয়ে যাঁদের কিছু কমতি আছে তাঁরা বোধহয় এইটে বোঝেন না যে ঐ অভাবদোষটা তাঁদের স্বভাবদোষ।

—ক্যাবল

স্টোভ

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বর্তমান সভ্যতার, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক হলো স্টোভ। নানা পথ দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এই প্রবন্ধে গোটাকয়েক পথের নির্দেশ থাকবে। সভ্যতার পথগুলি স্বর্গাভিমুখী পথের মতন বাঁকা ও বন্ধুর কিন্তু সেজন্যে আমি দায়ী নই। অনেক পথই বাঁকাচোরা, ধরা পড়েছে শুধু সারপেনটাইন লেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে বাঁকের মুখের চিহ্নগুলি সুস্পষ্ট। এখন বর্তমান সভ্যতা বলতে আমরা রুশিয়ার ইতিহাস এবং স্ত্রী-পুরুষের নতুন সামাজিক সম্বন্ধ বুঝি। স্টোভের সঙ্গে একাধারে রুশিয়ার ও অন্যধারে স্ত্রী-পুরুষের নতুন সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। এই দুমুখো যোগাযোগ দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। ছোটো কাজের মধ্যেই যেমন মানুষের চরিত্র ফুটে উঠে, তেমনি ছোট্ট একটি যন্ত্রে কিংবা অনুষ্ঠানের মধ্যে সভ্যতার রূপ মূর্ত হয়। ছোটোকেও শ্রদ্ধা করতে হয়, বিজ্ঞানের মারফত আমাদের সে শিক্ষা হয়েছে। নচেৎ পরমাণু ও ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম এক হতো না।

প্রথমে রুশিয়ার কথাই ধরা যাক। রুশিয়া আমাদের চা কেনে, অত বড়ো খরিদ্দারকে আমাদের ভালোবাসতেই হয়। রুশিয়াকে ভারত-সরকার বরাবরই ভয় ক'রে এসেছে, তাই রুশ-প্রীতি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আধুনিক বাংলা সাহিত্য রুশ-সাহিত্যের কাছে ঋণী। আমি নিজে জানি রবীন্দ্রনাথ তুর্গেনিভ ভালো ক'রে পড়েছেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন এ তথ্যটি লক্ষ করেছেন দেখে অনেক তরুণ সাহিত্যিক আশ্বস্ত হয়েছেন। আমার যুবা বয়স থেকে 'সেন ব্রাদার্স' পুস্তক-বিক্রেতার দৌলতে বাঙালী যুবক সম্প্রদায় তুর্গেনিভ, টলস্টয়, গোগল, পুশকিন, গর্কীর অনুবাদ পড়তে সুরু করে। (তারপর আমাদের সাহিত্যের নরুইজীয়ান যুগ আসে)। সত্যই রুশিয়ান নভেল আমাদের ভালো লাগতো। মানুষ, বিশেষতঃ দলিত ও পতিত মানুষের (উভয় লিঙ্গের) প্রতি অমন প্রগাঢ় সহানুভূতি আমাদের অতি সহজেই আচ্ছন্ন করতো। সব সাহিত্যেই সহানুভূতির প্রয়োজন, নচেৎ সাহিত্যই হয় না। ইংরাজী সাহিত্যেও আছে কিন্তু

সেটা এত সংযত এবং এত দেশকাল ও শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে তার সহজ স্ফূরণ সেখানে অসম্ভব। স্কটের রোমাঞ্চ তোলার অদ্ভুত ক্ষমতা, ডিকেন্সের ভাবালুতা ও হাসাবার শক্তি, থ্যাকারের অদ্ভুত লিখনভঙ্গি সে অভাব পূরণ করতে পারতো না। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল আমাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন ক'রে দিয়েছিলেন। আমরা বাঙালী, চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের অবতার, সাহিত্য আমাদের বৈষ্ণবী, চরিত্র আমাদের ভাবপ্রবণ, চণ্ডীদাসের উক্তিই হলো আমাদের ধর্মের মূলকথা, আমরা এক কথায় humanist, আমাদের দেবতা নর-নারায়ণ, বিবেকানন্দের দেবতা দরিদ্র-নারায়ণ এই নর-নারায়ণের অংশ মাত্র। আমরা দেখলাম যে রুশ সাহিত্যও এই আদর্শ ও এই ধর্মের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। অতএব রুশ সাহিত্য আমাদের ধাতে ব'সে গেল। আর সমগ্র ভারতবাসীই-ত রুশজাতির মতো পতিত ও দলিত !

এই মানবকতা (কি বিশ্রী কথা !) যে ভাবে রুশ সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছিলো সেটি আমাদের নিতান্তই মনোজ্ঞ। রুশ সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার মধ্যে নিষ্ফলতা, ছটফটানি, অস্বাভাবিকতা ও অসংযম প্রভৃতি দোষগুলি পর্যন্ত যেন আমাদেরই। এবং আমাদের ব'লেই সে-দোষগুলিকে আমরা বড়োই স্নেহ করতাম।

আমরা ভাবতাম—এ-দোষগুলি আমাদের ইচ্ছাকৃত নয় : এ দোষ সমাজের, রাষ্ট্রের, অতএব দোষমুক্তির প্রতি নিজেদের দায়িত্বের অপেক্ষা পরের দায়িত্বই বেশি। ইতিমধ্যে, পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা যেমন বলেন 'কি করা', করবো আর কি ? কথা কইবো, কেবল কথা কইবো। বড়ো বড়ো বিষয়ে কথা কইবো, যেমন আত্মা, স্বদেশ, ভগবান, স্বাধীনতা, সমাজ, শাসন-তন্ত্র, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, জগতের যাবতীয় সমস্যা। কথা কইবো হ্যামলেটের মতোন, কিংবা তাঁর রুশিয়ান বংশধর আইভানফ, রাজারফ, নেলুডফ, লেভিনের মতোন। অর্থাৎ সবই হবে প্রাণের কথা, ফরাসীরা যেভাবে কথা কয় সেভাবে নয় ; কথা কইবার জন্য নয়, সবই সমস্যা নিরাকরণের জন্য। তবে সমস্যা যে কালে গুরু-গম্ভীর, ভাষাও তখন হবে অস্পষ্ট, point-of view-ও হবে হ্যামলেটের মতোন subjective। এই হ্যামলেটিয়ানার রুশিয়ান সংস্করণই হলো, বিনয় সরকারের ভাষায়, নয়া বাংলার অর্থাৎ ১৯০৫ সালের পরের যুগের বাংলার গোড়াপত্তন।

কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের মূল কথাটি বাদ পড়লো। সেটি হলো, কথার

সঙ্গে চা-পান, অনর্গল কথার সঙ্গে অনর্গল চা-পান। সেই সঙ্গে সিগারেট। এই সময় অলিতে গলিতে চা-এর দোকান খোলা হয়; সকালে বিকেলে আড্ডা, বাজে আড্ডা নয়, সে আড্ডায় যেসব বিষয় আলোচনা হতো সে বিষয় এখন 'পরিচয়ে'র বৈঠকেও রোজ আলোচিত হয় না। এই চা-ই হলো আমাদের সেই যুগের প্রধান খাদ্য। ঠিক যেমন রুশিয়ানদের, রুশ নায়ক-নায়িকাদের ছিলো। রুশদের ছিলো 'সামোভার', আমাদের ছিলো খোলা উনুন। সামোভারের হিস্ হিস্ শব্দ সাহিত্যের বস্তু, আমাদের ছিলো ঐ শব্দের অভাব। খোলা উনুনের ধোঁয়া নিয়ে সাহিত্য হয় না। একটা শব্দের অভাব আমরা বড়োই অনুভব করতাম। গুড়গুড়ি আমরা পরিত্যাগ করেছিলাম, চায়ের পেয়ালাতে আর কতটুকু কবিত্ব সম্ভব! জোর জাপানী কবিতা। আজ স্টোভের দৌলতে শব্দের অভাব পূরণ হয়েছে ব'লেই আমরা কম্যুনিজ্‌ম্ পর্যন্ত গলাধঃকরণ করতে প্রস্তুত হয়েছি। গত পঁচিশ বছরের বাংলা তথা ভারতের যৌবনের ইতিহাস হলো দেশাত্মবোধ থেকে কম্যুনিজমে পরিণতি। সেই পরিণতির চিহ্ন হলো খোলা উনুনের পরিবর্তে স্টোভের প্রসার। একজন চক্ষুষ্মান বিদেশী পর্যটক নব্য রুশিয়ান সমাজ সম্বন্ধে লিখেছেন,— "রুশিয়ায় আজ তিনটে জিনিসের প্রচার দেখে বোঝা যায় যে রুশিয়ানরা একদম বদ্‌লে গিয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতে স্টোভ, প্রত্যেক যুবক-যুবতীর হাতে attache case কিংবা wallet, প্রত্যেক সহরবাসীর মুখে পাইপ ও গ্রামবাসীর মুখে সূর্যমুখীর বিচি।" আমাদের দেশে স্টোভ এসেছে, যদিও silencer আসেনি, attache case-এ আসছে, ফাউনটেন পেন ও বিড়ি এসে গিয়েছে। বাকিটা আসতে কত দেরি পাঠক নিজেই বুঝবেন। "ভারত তবু কই"-এর উত্তর বোধহয় এত দিনে মিললো। রুশিয়ার মতোন এই গ্রাম-প্রধান পঞ্চায়েৎ-শাসিত নিরক্ষর, ধর্মপ্রাণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিপীড়িত দেশের সুদিন এসেছে—শপথ ক'রে বলতে পারি—নচেৎ স্টোভ আসতো না। ওধারে রুশিয়া, এধারে ভারতবর্ষ, দুই মহাদেশ মিলে হবে নতুন জগৎ। তখন লীগ অব নেশনস নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। স্টোভের পাশে বসে গা ঘামলেই world state আপনা থেকে তৈরি হবে। ওয়েলস্ সাহেব এই স্টোভের নামে এক মহাকাব্য লিখতে পারতেন, যদি না তিনি হতেন—'what a bourgeois!'

এতটা যা লিখলাম তা হলো খাঁটি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস; অর্থাৎ পাকা ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত সাবধানী সিদ্ধান্ত। ভবিষ্যৎ বাণীটুকু রুশিয়ান আদর্শ-

বাদ ও হিন্দুর দিব্যদর্শনের সংমিশ্রণ। স্টোভের মূল্য নির্ধারণ এইবার করবো। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতবর্ষের বর্তমান সভ্যতায় স্টোভটি স্বাস্থ্যের চিহ্ন, না রোগের চিহ্ন? যদি স্বাস্থ্যের চিহ্ন হয়, তা হলে স্টোভ কিনবো, দেশের লোককে কেনাবো, যদি অস্বাস্থ্যের চিহ্ন হয় তাহলে ট্যারিফ বোর্ডের কাছে ভিক্ষা চাইবো, দেশী স্টোভ-ব্যবসা রক্ষা করতে। তাহলে স্টোভটা অহিন্দু যন্ত্র বলতে হিন্দু-সভাকে বাধ্য করবো। অন্যান্য উপায়ও আছে। এক চটকায় দেখতে গেলে মনে হয় যে স্টোভ আমাদের অনেক উপকার করেছে—বিশেষতঃ পুরুষজাতির। বাড়ির মেয়েদের আর রান্নাঘরে যেতে হয় না, তাঁদের শাড়িতে ধোঁয়ার গন্ধ থাকে না, ড্রয়িংরুমে একই শাড়িতে আসতে পারেন, এতে গৃহকর্তার ও তাঁর বন্ধুদের সৌন্দর্যজ্ঞান অটুক থাকে, পয়সার সাশ্রয় হয়, বাড়িরও লক্ষ্মীশ্রী থাকে।

স্টোভ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হবার জন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ মধুরতর হ'য়ে উঠেছে। পূর্বে ছিল অন্দর-মহলের একপ্রান্তে রান্নাঘর এবং সে ঘর নিতান্তই অপরিচ্ছন্ন। রান্নাবান্নার জন্য যতটা সময় লাগতো যত শ্রম খরচ হতো তার অনুপাতে কাজ হয়তো ততটা পরিপাটি হতো না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ দুর্লভ হতো, যখন সাক্ষাৎ হতো তখন পট্টবস্ত্রের পরিবর্তে বসনের হরিদ্রা-রঞ্জনে বুভুক্ষু হৃদয়ও রঙিয়ে উঠতো না। এখন বিকেলের জলখাবার আধঘন্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়, রান্নাঘরে না গিয়ে ড্রয়িংরুমের পাশেই সে কাজ সম্ভব হয়। Theoretically, বাদামভাজা, পেস্তার বরফী প্রভৃতি (সবগুলির নাম জানবার জন্য মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যের বদলে মণীন্দ্রলালের নভেল পড়তে পাঠিকা-বর্গকে অনুরোধ করছি) শৌখিন টুকিটাকি স্টোভেতেই প্রস্তুত হ'তে পারে। খোলা উনুন আর চিংড়ীর কাটলেট এ দুটো পরস্পর-বিরোধী। সেইজন্য আজকালকার বিধবা শাশুড়িরা বৌমাদের স্টোভ কিনে দিয়ে হিন্দু পরিবারের শান্তি রক্ষা করেন। ভূদেববাবু যদি আজ সশরীরে জীবিত থাকতেন, তিনি অন্য শরীরে এখনও বর্তমান, তাহলে পারিবারিক প্রবন্ধের নতুন সংস্করণে শাশুড়িকে বৌমাদের স্টোভ কিনে দিতে এবং বৌমাদের সেই স্টোভে রেঁধে দেবরবৃন্দকে খাওয়াতে বলতেন,—এটি শপথ ক'রে বলতে পারি না, কেননা ভূদেববাবুর আদর্শ পরিবারে স্বামীর বন্ধুদের জন্য চিংড়ী মাছের কাটলেট ক'রে, ফলসা রং-এর শাড়ি প'রে, সেই কাটলেট হাতে নিয়ে, মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে ড্রয়িংরুমে আপ্যায়িত করবার সুযোগ মিলতো না। মোদ্দা কথা এই, ভূদেব-বাবুর আদর্শ পরিবার না মিললেও, আজকালকার আদর্শ পরিবারে সে সুযোগ

মেলে। ভগবানকে ধন্যবাদ, এ সুযোগ আমরা পাচ্ছি। স্বামী আজকাল জমিদার নন, স্ত্রীও শুধু প্রজা নন, সম্বন্ধটিও মালেকানা সম্পত্তির নয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ও সঙ্গ আজকাল বহুবচনে। সেটা কাম্য। যদি তাই হয়, তাহলে স্টোভের গুণগান করতেই হয়। স্টোভ এই ভদ্র যুগের, এই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার যুগের টোটেম ; নিদর্শন কিংবা প্রতীকের চেয়েও বেশি।

কিন্তু সত্য ব'লে একটা জিনিস আছে, তার খাতির করতেই হয়। এই সত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিলো আমার মাসিমার বাড়ি, দ্বিতীয়-বার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, ঠিক হাসপাতালে নয়, মর্গে (Morgue)। এ দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মাসিমার বাড়ি সাহিত্য-সভা। রস, রূপ ও ভাবের আলোচনায় সুহৃদবৃন্দের খিদে বেড়ে গেল, একজন মুখ ফুটে ব'লেই ফেললেন, 'একটু চা হ'লে চলে না?' মেসোমশায় ব্যস্ত হ'য়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি ভিতরে গিয়ে দেখলাম, পাশের ঘরের দরজা বন্ধ, পাখা বন্ধ, মেঝের ওপর বসে বৌদি। সামনে স্টোভ। হিস্ হিস্ শব্দ হচ্ছে, অথচ নীল আলো নেই। বৌদি একটু রেগে পাম্প করতেই হঠাৎ এক ঝলক আগুন প্রায় হাত তিনেক উঁচুতে লাফিয়ে উঠলো। বৌদি বল্লেন—রতনের কাণ্ড, কেরোসিন তেল কেনা থেকে এক পয়সা লাভ করতে জল মিশিয়েছে। বৌদি আজকালকার মেয়ে, ছাড়বার পাত্র নন, তিনি মুখ খুলতেও জানেন, খোলাতেও জানেন। তাই মাথার কাঁটা দিয়ে স্টোভের মুখ পরিষ্কার ক'রে আবার নিজ কার্যে মনোনিবেশ করলেন। স্ত্রীজাতিকে নিরস্ত করবার অক্ষমতা সম্বন্ধে পুরুষ-জনোচিত অভিজ্ঞতা আমার ছিলো। বাইরে এসে মেসোমশায়ের দিকে কাতর নয়নে চাইলাম। মেসোমশায় লোহার ব্যবসায়ে বড়োলোক হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সব বুঝে আমাকে সাহিত্যালোচনা চালাতে ইঙ্গিত ক'রে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমিও কথা চালালাম, দেশের ভবিষ্যৎ কি করে উজ্জ্বল হবে যদি বর্তমান সাহিত্যের ধুরন্ধরগণ এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন? এই ছিলো আমার প্রশ্ন। সবের মুখে উত্তর না শুনতে শুনতেই রতন খাবার নিয়ে এলো—লুচি, হালুয়া, আলুর দম। সভাভঙ্গের পর বাড়ির ভেতরে গিয়ে শুনলাম বৌদি স্নানের ঘরে, এবং দেখলাম মাসিমা রান্নাঘরের দরজায়। ব্যাপারটা বুঝলাম। বৌদির দেরি দেখে মাসিমা নিজে উনুন জ্বালিয়ে, লুচি, হালুয়া, আলুর দম বানিয়ে পাঠিয়েছেন। সেই থেকেই আমি মহাত্মাজীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাবান হয়েছি। গরুর গাড়ি একটা নতুন মোটর টেনে নিয়ে যাচ্ছে

দেখে আগে তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা হয়েছিলো, সেটি ক্ষণস্থায়ী, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে তার কিছু পূর্বে। তখন স্নেহলতা দেবীর মৃত্যুর দৃষ্টান্তে সামাজিক কল্যাণসাধনের গতিতে একটু ভাটা পড়েছে। নতুন ঝড় ও ফ্যাশান উঠবার পূর্বে একটা lull আসে। বাঙালী সমাজ তখন মন্দমধুর হাওয়ায় উল্টা বইছে। এমন যুগের এক অশুভ মুহূর্তে তলব এলো—হাসপাতালে যেতে হবে। ব্যাপার কী? বন্ধুর স্ত্রী স্টোভের আগুনে শাড়ি ধরিয়ে ফেলেছেন, তাঁর সোনার অঙ্গ ঝলসে গিয়েছে। ছুটতে হলো হাসপাতালে। বীভৎস দৃশ্য! ঘণ্টাখানেক পরে তিনি মারা গেলেন, নার্সের হাতে মাথা রেখে। নার্স ছিলেন ইঙ্গবঙ্গ সমাজের, তাই হিন্দু স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে দেন নি। তারপর আমরা শব নিয়ে যেতে চাইলুম। পেলাম না। শব থাকল মর্গে, পরের দিন করোনার্স কোর্ট, তার পরের দিন বন্ধু বেকসুর খালাস পেলেন, লাসও খালাস হলো। সে কি দুর্গন্ধ! চার শিশি ইয়ুকালিপটাসেও সে গন্ধ দূর হয় নি। এখনও আমার সে গন্ধ নাকে আসে। আর মনে পড়ে বন্ধুর একটা ছোট্ট চিঠির কয়েক ছত্র: "আমি ভাই তাকে শুধু ঠাট্টা করেছিলাম। অফিস যাবার সময় সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো হাতে দুটি পান নিয়ে। আমার কি কুবুদ্ধি হলো, আমি বল্লাম—যাত্রার সময় কটা চোখ দেখতে নেই।" এ চিঠিটার কথা করোনার জানতেন না। তাঁর রায় ছিল—স্টোভের দুর্ঘটনায় মৃত্যু। এই official version-টাই নেওয়া যাক। আমার বক্তব্য হচ্ছে স্টোভে দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে। লাভের মধ্যে এইটুকু, স্বামীদের জেলখানা যেতে হয় না। কিন্তু দেশবাসীর জেলভীতি আরো কমে গেলে এ লাভটুকুর মূল্য আরো কমে যাবে ভয় হয়।

তা হ'লেই হলো—স্টোভ সামাজিক আদর্শের টোটেম, প্রতীক ও কষ্টিপাথর। যিনি মহাত্মাজীর আদর্শ গ্রহণ করেন, যিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার, অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে সহজ সম্বন্ধ-স্থাপনের বিপক্ষে, অর্থাৎ যিনি স্ত্রীদের রান্নাঘরের খোলা উনুনের কাছে বসিয়ে রাখতে চান, তিনিই স্টোভের শত্রু। বিপরীত দিক থেকে বলা যায়, যিনি যন্ত্র-সভ্যতা তথা কম্যুনিজমে বিশ্বাসী তিনিই স্টোভের স্বপক্ষে। খোলা উনুনের কয়লার ধোঁয়ায় মৃত্যু এবং স্টোভ ফেটে মৃত্যু মেয়েদের পক্ষে উভয় সভ্যতাতেই সম্ভব। পার্থক্য শুধু এই, একপ্রকার মৃত্যু ধীরে ধীরে, স্বাস্থ্য হারিয়ে, অনেকটা অন্তরীণ-বাসীদের মৃত্যুর মতোন; অন্যপ্রকার মৃত্যু আকস্মিক, স্বাস্থ্য বজায় রেখে, অনেকটা জালানওয়ালাতে গুলির আঘাতে মৃত্যুর মতোন।

একটি দেওয়ানী, অন্যটি ফৌজদারী। অতএব স্টোভ সুস্থ সভ্যতার চিহ্ন হ'লেও মরণের কারণ হ'তে তার বাধে না। শুধু তাই নয়, যিনি নিয়তিকে বিশ্বাস করেন, যেমন হিন্দু ও অহিন্দু মার্কসিস্ট, হাসিমুখে যিনি বলতে পারেন accidents will happen in best regulated families, কিংবা গম্ভীর মুখে বলতে পারেন the proletariat shall win, তিনিই স্টোভের মিত্র। গীতার কর্মবাদের সঙ্গে এবং হেগেলীয়ান মতবাদের সঙ্গে এইখানেই স্টোভতত্ত্বের সংযোগ। বাঙালী 'নয়া-হিন্দু' পাঠকের কাছে স্টোভের স্বপক্ষে এর বেশি বলবার আর কি প্রয়োজন থাকতে পারে ?

খিচুড়ি

জ্যোতির্ময় ঘোষ

বাংলা ভাষায় গণিত ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তক রচনার যে চেষ্টা ও উদ্যোগ হইতেছে তৎসম্বন্ধে জনৈক বন্ধুর সহিত আলোচনাকালে তিনি বলেন, "দেখুন, হয় ইংরাজী রাখুন, না হয় বাংলা করুন, একটা খিচুড়ি করিবেন না।" গণিত ও বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পরিভাষা সংকলন ও পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন, সমস্যা ও মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। শুধু উপরোক্ত বন্ধুবরের উক্তি সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিব।

ডাল ও ভাত রান্না আমরা আগে শিখিয়াছি, পরে খিচুড়ি রাঁধিতে শিখিয়াছি, ইহা বোধহয় ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং খিচুড়ি ডাল ও ভাতের উন্নত সংস্করণ হওয়াই সম্ভব। তা ছাড়া ব্যঞ্জনাদির অভাবে অগত্যাই যে আমরা খিচুড়ির ব্যবস্থা করি তাহা নহে, যখন কোনো কারণে শরীর ও মন উৎফুল্ল ও পুলকিত হয়, তখন আমরা মেসের ঠাকুরকে বা বাড়ির গৃহিণীকে খিচুড়ির অর্ডার দিয়া থাকি। সুতরাং খিচুড়ি যে ডাল ও ভাত হইতে অপকৃষ্ট পদার্থ, তাহা মনে করিবার হেতু নাই। বরং এই খিচুড়ির যে সকল বিভিন্ন রন্ধনরীতি উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং ইহাকে অধিকতর উপভোগ্য করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, ডাল ও ভাতের বেলায় তাহা হয় নাই। অতএব আমাদের রন্ধনশালায় খিচুড়ির স্থান ডাল ও ভাত অপেক্ষা উচ্চেই থাকিবে।

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেও ক্রমাগত আমরা খিচুড়ির দিকেই চলিয়াছি, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। আমরা যে পোশাক পরি, তাহা বাঙালা, পারশী, পাঞ্জাবী, ভারতীয় ও অভারতীয় পোশাকের খিচুড়ি। আমরা সকালে উঠিয়া গুড় দিয়া বিস্কুট এবং জ্যাম দিয়া আটার রুটি খাইয়া থাকি। ঝাল চচ্চড়ি ও অম্বলে আমাদের যেরূপ তৃপ্তি হয়, চপ কাটলেট ও কোর্মা-কোপ্তাতে তাহা অপেক্ষা কম হয় না। আমাদের আহারের তালিকা দেশীয় ও বৈদেশিক রীতির সংমিশ্রণে ক্রমশঃ কিরূপ খিচুড়ি পাকাইতেছে, তাহার বেশী দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক এবং এই

সংমিশ্রণে যে শুধু অপকারই হইতেছে তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। অপকারই হউক আর উপকারই হউক, সংমিশ্রণ যে অনিবার্য তৎসম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নাই।

পরিবারের মধ্যে বিধবা মাসিমা নিরামিষাশিনী এবং উপবাস-পূজা-পার্বণাদি-নিরতা; বৃদ্ধ জ্যেঠামহাশয় আফিমের নেশায় ভরপুর; ছোটোমামা ডাম্বেল ও মুগুর ভাঁজেন; পিসেমসাই ইজি-চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে নারাজ; খুকী পেঁয়াজের গন্ধে বমি করে; খোকা পেঁয়াজের ফুলুরি পাইলে ডবল ভাত খায়; কর্তা মুরগি ভালবাসেন; গৃহিণী মুরগি স্পর্শ করেন না—ইত্যাদি নানা-প্রকার রুচির এবং অভ্যাসের খিচুড়ি এক বাড়িতেই দেখিতে পাই। ইহা অনিবার্য।

একই পরিবারের মধ্যে কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ পৌত্তলিক, কেহ নিরাকারবাদী, কেহ কোনো বাদীই নহে, এরূপ দৃষ্টান্ত সর্বত্র। এইরূপ মতবাদের খিচুড়ি হইবেই। নিরাকারবাদী, কেহ শুধু তাহাই নহে, একই ব্যক্তির জীবনে একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদের খিচুড়ি বিরল নহে। মাছ খান, মাংস খান না; কালীপূজা করেন, বলিদান করেন না। পৈতা আছে, টিকি নাই; টিকি আছে, পৈতা নাই; সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন জুয়াচুরিও করেন; সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন না, জুয়াচুরিও করেন না—ইত্যাদি নানা মনোভাবের খিচুড়ি সর্বত্র।

আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে কি দেখিতে পাই? তাহাদের জীবনও আমাদেরই মতো খিচুড়ি নয় কি? বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কার্য, বিভিন্ন ব্যবসায় বিভিন্ন আচার ব্যবহার অনুসরণ তো করিতেছেই। একই ব্যক্তির জীবনও নানা আপোত-বিরোধী কার্য ও ভাবসমূহের বোঝা নিত্য বহিতেছে। একই ব্যক্তি বাস-কণ্ডাক্টর, ঘটক, বাড়ি ও জমির দালাল এবং জ্যোতিষী; এক ব্যক্তি সকালে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, দুপুরে কেরানী এবং বৈকালে ইন্সিওরেন্স এজেন্ট; প্রবীণ অধ্যাপকেরাও হয়তো বিচক্ষণ শেয়ার-ব্যবসায়ী; ঠাকুরমহাশয় রন্ধনাদি করেন, সুযোগ পাইলে পূজার্চনাও করেন; এইরূপ বিভিন্ন মত ও কার্যের সমন্বয় বা খিচুড়ি অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে সমাজের যে অপকারই হইতেছে ইহা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

আমাদের আসবাব দেশী ও বিলাতীর খিচুড়ি। ফরাস ও তাকিয়ার পাশে অনেক স্থলেই আজকাল সোফা ও চেয়ার শোভা পায়। তক্তাপোশের পাশে ড্রেসিং টেব্‌ল অনেক বাড়িতেই পাওয়া যাইবে। সাবান দিয়া হাতে-মাটি এবং

টুথপেস্ট দিয়া দাঁতের মাজন আমরা অনেকেই করি। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের জীবনের আশে-পাশে যে খিচুড়িরই স্তূপ বিরাজমান, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন?

আমরা যাহাকে উন্নতি বলিয়া থাকি, তাহা কি খিচুড়িরই নামান্তর নয়? নৌকা ও স্টীম-এঞ্জিনের খিচুড়িকেই আমরা স্টীমার বলিয়া থাকি। মোটরকার এবং নৌকার খিচুড়িকে মোটরলঞ্চ বলে। আবার মোটরলঞ্চ এবং এরোপ্লেনের খিচুড়ি হাইড্রোপ্লেন। ফটোগ্রাফ এবং গ্রামোফোনের খিচুড়ি টকি-সিনেমা। ফটোগ্রাফী আবার রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং গণিতের খিচুড়ি ম্যাগনেট ও চুম্বক ও বিদ্যুতের খিচুড়ি। এক কথায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মাত্রই এক একটি বিরাট খিচুড়ি।

বহিঃপ্রকৃতিটাই কি খিচুড়ি নয়? শুভ্র সূর্যরশ্মিটি সাতটি বিভিন্ন রং-এর খিচুড়ি নয় কি? একটি ফুলের বাগানের দিকে চাহিলে কি অগণিত রং-এর ও রূপের খিচুড়িই চোখে পড়ে না? ময়ূরপুচ্ছ বহুবর্ণের খিচুড়ি বলিয়াই এত রমণীয়। ভূপৃষ্ঠটি নদী, পর্বত, অরণ্য, প্রান্তর প্রভৃতির একটি বিশাল খিচুড়ি বলিয়াই এত উপভোগ্য। নির্মল, স্বচ্ছ, স্বাদহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন জলকণাটিও হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের খিচুড়ি।

মানুষের ভিতরে-বাহিরে আশে-পাশে সর্বত্রই যখন খিচুড়িরই রাজত্ব তখন তাহার ভাষা সম্বন্ধে একটা অনির্দেশ্য পবিত্রতার প্রতি এত মোহ কেন? মানুষের ভাষা খিচুড়ি হইতে বাধ্য—অতীতে হইয়াছে, বর্তমানে হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এ স্রোত রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। টেবিল, চেয়ার, স্ক্রু, মোটরকার, রেডিও, টেলিগ্রাম, পোস্ট-অফিস প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ বাংলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এবং ক্রমাগত যাইতেছে। সেদিন একটি মিস্ত্রী বাসায় কাজ করিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল সে আলমারি প্রস্তুত করিতে পারে কিনা। সে উত্তর দিল, "আজ্ঞে ওসব ফাইন কাজ আমরা করি না।" সেদিন একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, "Smooth মানে কি?" আমি বলিলাম, "Smooth মানে—মানে—মসৃণ—মানে সমান, যাতে উঁচু-নীচু নেই।" ছেলেটি বলিয়া উঠিল, "ও বুঝেছি, প্লে—ন।" এরূপ হইবেই। ইহার উপায় নাই। এজন্য কোনোরূপ দুঃখ করিলে চলিবে না। পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে 'জল মোটর' ও 'ডাঙা মোটর' জলেস্থলে এবং লোকমুখে নিয়মিত চলিতেছে। ইহার জন্য কোন পরিভাষা সমিতির আবশ্যক হয় নাই। 'মাস্টার'

শব্দটি ইংরাজী হইলেও 'মাস্টারনী'কে ত্যাগ করা সহজ হইবে না। এরূপ খিচুড়িতে বিরক্ত হইলে জীবন দুর্বহ হইবে। বাংলা পরিভাষার অভাব সত্ত্বেও সেমিজ, ব্লাউজ, পেটিকোট, বডিস, ব্রেস্‌লেট, সেপটি-পিন প্রভৃতি বাঙালী তরুণীর রমণীয়তা বৃদ্ধিই করিতেছে। 'গ্রামোফোন' কথাটা বিদেশী হইলেও উহার গান আমাদের ভালোই লাগে। সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ 'রেডিও'ই বা মন্দ কি ? 'টেলিফোন' সকলের বাড়িতে না থাকিলেও 'টেলিগ্রাম' সব বাড়িতেই আসে। অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত অ্যাসিডিটি-পূর্ণ ও অজীর্ণান্তক পাউডারে যদি অসুখ সারে, তাহা হইলে ঔষধের নামে কি আসে যায় ? দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। ঘরে বাহিরে সর্বত্রই খিচুড়ি ভাষা চলিতেছে।

যদি কেহ বলে, "এলগিন রোডের মোড়ে ট্রামে উঠিয়া কণ্ডাক্টরের নিকট টিকেট লইয়া সামনের সীটে গিয়া বসিতেই ট্রামখানি লোয়ার সারকুলার রোডের জংশনে আসিয়া পড়িল এবং পূর্ব দিক হইতে আগত একখানি ট্যাক্সির সঙ্গে ভীষণ কলিশন হইল। একটি তরুণীকে আহত অবস্থায় ট্রাম লাইনের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িতে দেখিয়াই আমি ট্রাম হইতে নামিয়া একখানি ট্যাক্সি করিয়া তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে লইয়া গেলাম এবং অনেক কষ্টে ওখানকার সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ইনডোর পেশেন্ট ভাবে অ্যাডমিট করাইলাম। হোস্টেলে ফিরিয়া দেখি সুপারিনটেন্‌ডেন্ট রোল-কলের সময়ে আমাকে অ্যাবসেন্ট করিয়া রাখিয়াছেন। পরদিন হইতে ভিজিটিং আওয়ার্সে নিয়মিত তরুণীটিকে দেখিতে যাইতাম। অসুখ সারিয়া আসিলে তিনি তাঁহার বাসার ঠিকানা দিয়া আমাকে চা খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে ক্রমশঃ তরুণীটির সহিত, ইত্যাদি", তাহা হইলে তাহাকে চালিয়াৎ বা মিথ্যাবাদী বলিতে পারেন, কিন্তু তাহার ভাষা যে অস্বাভাবিক তাহা বলা চ'লে না, বিশুদ্ধ বাংলায় উক্ত কথাগুলি বলা যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তাহা করিলে বড়বাজার হইতে হাওড়া স্টেশনে যাইবার সময় বিদেশীয় ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রপাতি দ্বারা নির্মিত হাওড়ার পুলের উপর দিয়া না গিয়া স্বদেশীয়গণ কর্তৃক বাহিত ডিঙিতে অথবা পবিত্র গঙ্গাজলে সাঁতার কাটিয়া নদীপার হইবার মতোই হইবে।

সাহিত্যে উক্তরূপ খিচুড়ি ভাষার সমর্থন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্যের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা আবশ্যক এবং তাহার ভার কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক এবং অন্যান্য সাহিত্যিকগণ লইবেন।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কার্য ও ভাবের খিচুড়ি হইলেই যে তাহা শুভ ও শ্রেয় হইবে, ইহাও আমার বক্তব্য নহে। মাংসের সহিত পরমান্নের খিচুড়ি সুস্বাদু হইতে পারে না। ইউরোপীয় জাতির সহিত ভারতীয় জাতির মিশ্রণে যে ওয়েলেসলি সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহা শুভ হইয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন না, তবে খিচুড়ি হইলেই যে তাহা অপকৃষ্ট হইবে তাহা ঠিক নহে, ইহাই আমার বক্তব্য।

সাহিত্যিকগণ যতই চেষ্টা করুন, বিদেশী শব্দ ক্রমাগত বাংলার সহিত মিশিতে থাকিবে। তৎসত্ত্বেও যথাসম্ভব ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা তাঁহাদের একান্ত কর্তব্য। নতুবা বাঙালীর দেশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার হানি হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পক্ষে খিচুড়িই প্রশস্ত। যাহাতে সেই খিচুড়ি সুপক্ক ও সুস্বাদু হয় এবং তলায় ধরিয়া গিয়া দুর্গন্ধ না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

বিজ্ঞাপন

পরিমল গোস্বামী

খবরের কাগজে খবর থাকে, বিজ্ঞাপনও থাকে। কিন্তু এমন লোকের কথা শোনা যায়, যিনি খবর পড়েন না, শুধু বিজ্ঞাপন পড়েন। তাঁর কৈফিয়ত হচ্ছে খবর রোজ একই থাকে। ঘটনা যা ঘটে, প্রতিদিন সব একই ঘটে, শুধু যাদের নিয়ে ঘটে, তাদের নাম থাকে আলাদা। পঁচিশ বছর আগে ভজহরি ট্রেনে কাটা পড়েছিলো। আজও সেই ট্রেনে কাটার খবর, নামটা শুধু ভজহরি নয়, কেষ্টহরি। প্রত্যেক দিন নাম বদলে ঐ একই খবর তাঁর পড়তে ভালো লাগে না। তাই তিনি বিজ্ঞাপন পড়েন। তা ছাড়া খবরের একটা চেহারা প্রায় ঠিক হ'য়ে গেছে। তা থেকে দেশকে ঠিক চেনা যায় না। দেশের নাড়ির খবর তাতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় বিজ্ঞাপনে।

সাহিত্য যদি জীবনের প্রতিবিম্ব হয়, তা হলে একমাত্র বিজ্ঞাপনই সেই সাহিত্য যাতে সমাজ-জীবনের সম্পূর্ণ ছবিখানি দেখা যায়। অনেকেরই এই মত। একজন বলেন—ধরো না কেন, এই সোনার বাজারের বিজ্ঞাপন দেখে আমি দুনিয়া কোন্ পথে চলেছে তা বুঝতে পারি। যখন দেখি সোনার দর চ'ড়ে যাচ্ছে তখন বুঝি যুদ্ধ এগিয়ে আসছে। সোনার দাম কমলেই বুঝি যুদ্ধের ভয় আপাততঃ কমে গেল।

কিন্তু এ তো গেল দুনিয়ার মতিগতি। দেশকেও জানতে পারি বিজ্ঞাপন প'ড়ে। পঁচিশ বছর আগের একটি বিজ্ঞাপন আজও আমি ভুলতে পারিনি। তাতে ছিলো একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক চাই—যিনি ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস এবং ভূগোল এই পাঁচটি বিষয়ে স্ট্রং। বেতন পঁচিশ টাকা। পাঁচটি বিষয়ে স্ট্রং বা শক্তিমান হবেন, বি-এ পাস করবেন এবং পাবেন পঁচিশ টাকা। সমাজের মর্মান্তিক একটি দিকের চেহারা। একটি যুবক পাঁচটি বিষয়ে স্ট্রং হ'য়ে বি-এ পাস করেছে। কত আশা-আকাঙ্ক্ষা তার ছিলো। স্কুলে পড়বার সময় তার জীবনের লক্ষ্য কি তা নিয়ে নিশ্চয় সে রচনা লিখেছে, সে বড়ো একটা কিছু হবে। জজ ম্যাজিস্ট্রেট বা ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার হবে বা ঐ রকম চাকরি

বা ব্যবসা অবলম্বন করবে। সেজন্য এতগুলো বিষয়ে সে স্ট্রং হয়েছে। তারপর কি হলো? তার স্বপ্ন ভেঙে গেল। এখন সে কর্মখালির বিজ্ঞাপন প'ড়ে প'ড়ে আবেদনপত্র পাঠাচ্ছে।

তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পঁচিশ টাকা মাসে? মন্দ কি? কিন্তু সে-চাকরিও কি সে পাবে? হয়তো পাবে না। হয়তো যে পাবে সে ছ' বিষয়ে স্ট্রং। ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে দেহ। শক্ত পেশী তার সর্বাঙ্গে। সে ছেলেদের শরীর-চর্চা করাবে অতিরিক্ত, তাই সে পাবে। তার জানা আছে এরকম বিজ্ঞাপনে অন্ততঃ পাঁচ-শ' আবেদনপত্র আসে। এই নির্দিষ্ট পদটির জন্যও ঐরকমই হয়েছিলো। তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন! শুধু দরখাস্ত নয়, আবেদন-কারীরা সবাই নির্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হয়েছিলো এবং হাতাহাতি পর্যন্ত করেছিলো নিজেদের মধ্যে। হয়তো চাকরিটি জুটেছিলো ছ' বিষয়ে স্ট্রং ব্যক্তির ভাগ্যেই।

পঁচিশ বছর আগে শিক্ষকদের বিজ্ঞাপন অনেক বেশি থাকতো। বি-এ পাসের দর পনেরো টাকা পর্যন্ত নেমেছিলো। এখন শিক্ষকদের বিজ্ঞাপন আগের মতো নেই। বেতনও আগের চেয়ে বেশি।

বিয়ের বিজ্ঞাপনও এখন বদলে যাচ্ছে। আগে ঘটকের বিজ্ঞাপন থাকতো বেশি। এখন বিবাহার্থী নিজেই বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বেশি। আগে মোটামুটি একটা পণের অঙ্ক লেখা থাকতো। চাকরির বাজারে যার দাম পঁচিশ টাকা, বিয়ের বাজারে তার দাম পাঁচ হাজার টাকা প্রায় বাঁধা ছিলো। এখন পণের প্রস্তাব অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট থাকে। তার মানে মেয়েদের প্রতি আগে যে একটা কৃপার ভাব ছিলো, সেটা এখন অনেকখানি কেটে গেছে, এখন একটু যেন চক্ষুলজ্জা এসেছে। মেয়েরা শিক্ষিত হওয়াতে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়াতে বিজ্ঞাপনে এইরকম অপমানকর ভাষা এখন ক্রমেই কমে আসছে। মেয়েদের দিক থেকেও অনেকখানি উন্নতি দেখা যায়। পঁচিশ বছর আগেও যদি কোনো দেবতা এসে কোনো মেয়েকে বলতেন, মা-লক্ষ্মী, আমি বর দিতে এসেছি, কি বর চাও?—তা হলে বিনা দ্বিধায় মা-লক্ষ্মী বলতো আই-সি-এস বর চাই।

মেয়েদের দৃষ্টিতে এখন বাইরের আকর্ষণ, এমনকি টাকার আকর্ষণও যেন কমে আসছে। এখন মানুষে মানুষে মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। এই পরিচয় হয়তো এখন বেশি দামী।

পরিবর্তনশীল সমাজের খাঁটি চেহারা এইভাবে ফুটে ওঠে বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। সমাজের আর একটি স্তরের পরিচয়ও বেশ পাওয়া যায়, এই স্তরে আছে চোরদের দল। চোরদের বিজ্ঞাপনও কাগজে দেখা যাবে নিয়মিত। যেমন, কোনো তেলের সঙ্গে দশ-বিশ রকম উপহারের বিজ্ঞাপন। এই উপহারের তালিকায় টয় রিস্ট-ওয়াচ নামক একটি লোভনীয় হাতঘড়ির উল্লেখ থাকে। টয় রিস্ট-ওয়াচ। ইংরেজী-অনভিজ্ঞ মনে করে 'টয়' বোধহয় প্রস্তুতকারকের নাম। টয় কথাটি অনেক দিন চলেছিলো বাংলাদেশেই : তারপর যখন সাধারণ লোকেরা বার বার প্রতারিত হ'য়ে 'টয়' মানে খেলনা বুঝতে পারলো, তখন টয়ের বদলে চললো ডামি রিস্ট-ওয়াচ। ডামি মানেও তাই, অর্থাৎ অকেজো, নকল। বেশ কিছুকাল চললো ডামি কথাটা। তারপর প্রতারিতরা ডামি কথাটিরও অর্থ বুঝে ফেললো। তখন ডামি কথাটি অচল হলো এবং তার বদলে এলো মিউট রিস্ট-ওয়াচ। মিউট মানে মূক, নির্বাক। মিউট ঘড়ি মানে যে ঘড়িতে কোনো শব্দ হয় না। টয়ের যুগ গেল, ডামির যুগ গেল, এখন মিউটের যুগ চলছে। চোরের কৃপায় সাধারণ লোকের মধ্যে এই ভাবে ইংরেজী ভাষার প্রসার হচ্ছে অবশ্যই।

এই বিজ্ঞাপন থেকে আরও একটি বিষয় জানা যায়। সেটি হচ্ছে এই যে বাংলার চোরও ডামি পর্যন্ত এগিয়ে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। তারপর থেকে অর্থাৎ মিউট শব্দ থেকে এ ব্যবসা গেছে অন্য প্রদেশের হাতে। এখন মিউট ঘড়ির যত বিজ্ঞাপন দেখা যায় তা সবই বাইরের। এটাই এখন একমাত্র সান্ত্বনা যে, বাঙালী এ ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। আগে কলকাতার চোরেরা মফস্বলের লোকদের ঠকাতো, এখন মফস্বলের চোরেরা কলকাতার লোককে ঠকাচ্ছে।

ভাগ্য-গণনা বা মাদুলির বিজ্ঞাপন থেকেও দেশের চেহারা খুব চমৎকার জানা যায়। যখন দেখা যায় এইজাতীয় বিজ্ঞাপন খুব বেড়ে গেছে, তখন নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে লোকের দুর্দশা চরমে উঠেছে। যখন বুদ্ধিতে আর কিছু সে করতে পারে না, দিশেহারা হ'য়ে পড়ে, তখনই তো তার দৈব-নির্ভরতা। চিন্তাশক্তি যখন প্রায় লুপ্ত তখন ভাগ্যগণনা ও মাদুলি ভিন্ন গতি নেই।

বিজ্ঞাপনের সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য এত। যত দিন যাবে ততই সমাজ-বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকেরা পুরাতন বিজ্ঞাপন ঘাঁটবেন সমাজ-ইতিহাসের মাল-মশলা সংগ্রহ করতে। বিজ্ঞাপন এ বিষয়ে সচেতন, তাই তার সংখ্যাও

দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। তাই খবরের কাগজে খবরের চেয়েও বিজ্ঞাপন বেশি হবার দিকে ঝুঁকেছে। শুধু কাগজে নয়, পথে, ঘাটে, গাড়িতে, বাড়িতে, দেয়ালে, গাছে, ল্যাম্প-পোস্টে সর্বত্র বিজ্ঞাপন। চোখ চাইলেই চোখে পড়বে ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, উপরে, নীচে সব জায়গায় বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন কাগজ-বাহিত হ'য়ে ঘরে ঢুকছে, দেশলাইয়ের বাক্স-বাহিত হ'য়ে পকেটে ঢুকছে। ঘরে বাইরে গোপনতম এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে সে যায়নি এবং প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীর সকল দেশ থেকে বিজ্ঞাপন এদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করছে। এই বিজ্ঞাপন না থাকলে অন্ততঃ শহরের চেহারা বদলে যেতো, খবরের কাগজ কেউ কিনতো কিনা সন্দেহ। শহরের পথে পথে এমন বিচিত্র বিজ্ঞাপন চোখে না প'ড়ে উপায় নেই এবং এই বিজ্ঞাপনের জন্যই পথের দৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে এ-কথা বৈজ্ঞানিকরা হিসেব ক'রে বার করেছেন। আগে বিজ্ঞাপনহীন পথের এক মাইল যেতে যত সময় লাগতো, এখন বিজ্ঞাপন-শোভিত পথের এক মাইল যেতে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে। কেন লাগে তা যে-কেউ একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন।

সব বিজ্ঞাপনই আবার নীরব নয়। সন্ধ্যাবেলা দেখা যাবে অনেক ওষুধ-বিক্রেতার মুখে বিজ্ঞাপন শব্দায়িত হ'য়ে উঠেছে। রেলগাড়িতে তো সর্বক্ষণ সশব্দ বিজ্ঞাপন রেলযাত্রীর জীবনে বৈচিত্র্য আনছে। ভাগ্যিস শহরের সকল বিজ্ঞাপন শব্দায়িত নয়। কিন্তু যদি হতো, দৈবাৎ সকল বিজ্ঞাপন একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠার ক্ষমতা লাভ করতো, তা হলে সেই দিনই শহর ধ্বংস হয়ে যেতো কিনা কে জানে।

পঞ্চাশোর্ধ্বে

গোপাল হালদার

মনে হচ্ছিল—জীবনটা সহজ হয়ে আসছে। কলকাতার ট্রামে-বাসে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এ-যুগে যদি কোনো অপরিচিত সহযাত্রী আসন ছেড়ে দেয় তা হলে এ-ছাড়া অন্য কি কথা মনে করতে পারেন আপনি? অপরিচিত সহযাত্রী সরে বসলেন,—'বসুন'। কৃতজ্ঞতা অবশ্য জানাবেন, কিন্তু আসনও গ্রহণ করবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার মতো ভাববেন জীবনটা সহজ হয়ে আসছে। মানুষ মানুষকে সত্যই স্বীকার করতে শিখছে। ট্রামের আসনে কেউ ৪৫ থেকে ৭৫ ডিগ্রী জঙ্ঘা-জানু বিস্তার করে বসছেন না। আমি পাশে বসতে গেলে আপনি জামা-কাপড়ের ইস্ত্রি বাঁচাবার সদিচ্ছায় আমাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলে ভ্রূকুটি-কুটিল চক্ষে দেখছেন না; আপনি ও আপনার প্রতিবেশীর মধ্যে আমিও সুচতুর সেনাপতির মতো 'অনুপ্রবেশ' করে বসব না আমার কনুইএর খোঁচায় বীরবপুখানিকে ছড়িয়ে দিয়ে। এক কথায়, কলকাতার রথযাত্রায় আমরা বুঝেছি—লিভ অ্যাণ্ড লেট লিভ। এর পরেই হয়তো মানবো —'সকলের তরে সকলে আমরা'—

অতএব কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে বললাম, 'আপনার কষ্ট হলো।

উত্তর এল, বেপরোয়া স্বচ্ছন্দ। 'হলোই বা। বসুন—আপনারা বয়স্ক লোক।'

পৃথিবী ছলনাময়ী। কাল কুটিলচক্রী। লাফিয়ে উঠে বলতে পারতাম, 'বসতে চাই না;'—কারণ বয়স ছিল পাঁচ বৎসর কম। কিন্তু বললাম না। আপনিও বলতেন না। তখনো বয়স পঁয়তাল্লিশের দিকে। স্মিত হাস্যে আসনটিতে চেপে বসতে পারতেন, সকৌতুক স্মরণ করতে পারতেন পুরনো দিনের 'প্রবাসী' সম্পাদককে লেখা বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কবিতায় প্রতিবাদ। পক্কশ্মশ্রু সম্পাদক বয়োজ্যেষ্ঠ বিজয় মজুমদারকে 'প্রৌঢ়' বলে উল্লেখ করেছিলেন, কবিতায় প্রতিবাদ করলেন বিজয়বাবু।

> পেঁচিয়ে কথা বল্‌লে রূঢ় / বুঝতি পারি, নইক মূঢ়,
> ঠারে-ঠোরে 'বুড়ো' বলে চোখ-টেপা।

'বয়স্ক' মানে তো সেই 'প্রৌঢ়'। হাঁ, বয়সটা যখন পঁয়তাল্লিশের প্রান্তে তখন মন্দ লাগে নি আপনার কথাটা—'বয়স্ক'। অবশ্য এও সেই ঠারে-ঠোরে 'বুড়ো' বলে চোখ-টেপা। তাতেই বা ক্ষতি কি?

Grow old along with me
The best is yet to be
The last of life for which the
first was made.

কিন্তু নেই আর সেই পঁয়তাল্লিশ। সত্যই এসেছি এখন পঞ্চাশোর্ধ্বে। আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেও অবশ্য এগিয়ে গেছেন আরও পাঁচ বৎসর,—আর আপনিও বাদ যান নি। ট্রামে-বাসে এবার সত্যই কেউ আসন ছেড়ে দিলে আমাকে বলে না "বসুন—আপনার বয়স হয়েছে"। বলে, "বুড়োমানুষ, বসুন।" আর কি করবেন আপনি আমার মতো হলে? কবিতা স্মরণ করবেন: "Grow old along with me?" না, স্মরণ করবেন আপনার স্মৃতির কথা—Le Temps Retrouve……হারানো কাল, পুরনো দিন।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই—বাঁচলেই কাল হারায়, দিন ফুরোয়, যৌবনের সিংহাসন ছাড়তে হয়। চল্লিশ আসে প্রথম দ্রুতপদসঞ্চারে। তার সঙ্গে আসে জীবনের প্রথম অপরাহ্ণ-ছায়া; চোখে ঝাপসা হয়ে ওঠে নিকটের লেখা। তার আগে বা পরেই হয়তো আসে দাঁতের জানানি—চল্লিশ আসছে, আর দাঁতেই জীবের বয়স। চুপে চুপে শ্বেতপত্রের লেখা পাঠিয়ে সন্ধিপ্রত্যাশী হয় শেষ-যৌবন। আপনার আমার জীবনেও চল্লিশ এসেছে এই নিয়মে। কিন্তু আমি তাকে গ্রহণ করেছিলাম প্লাস্ওয়ান তেজের প্রস্তর-চক্র নিয়ে। আমি তাকে স্বীকার করলাম প্লাস্টিকসের দন্তপঙ্‌ক্তি দিয়ে। আর,—আমরা রবীন্দ্রনাথ নই—সেফ্‌টি রেজারের যুগে জন্মেছি, শ্বেতশ্মশ্রুর স্বীকৃতির কথাই ওঠে নি। সহজে—অন্য সকলের মতো সহজেই—আমি তাই ত্রিশ পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি চল্লিশে। যৌবন পেরিয়ে এসে পেলাম এ কালের প্রৌঢ়ত্বের প্রশান্ত পরিসর। যৌবনের উন্মাদনা তখন পরিস্রুত হয়ে উঠছে অভিজ্ঞতায়। বাসনার বাষ্প তখন লঘু হয়ে উঠছে হৃদয়রাগের চারিপার্শ্বে। মথিত সমুদ্রের শান্ত বেলাভূমিতে কামনার মোহিনী হয়ে উঠেছেন জীবনের লক্ষ্মী। আর, এ সমস্ত সম্ভব হয়েছে—প্লাস্ওয়ান চশমার জন্য, ডেন্টিস্টের সুকৌশল কৃতিত্বে, সেফ্‌টি-রেজারের প্রসাধনসৌকর্যে।

যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্যখানে প্রৌঢ়ত্বের এই পরিণত রূপকে আবিষ্কার করেছে গত দেড়শত বৎসরের চিকিৎসাশাস্ত্র ও প্রাণবিজ্ঞান। যৌবন-বেদনা তাই একালে জীবনরসে দানা বেঁধে উঠবার মতো অবকাশ পেয়েছে বত্রিশের পরে চল্লিশের মধ্যে। যৌবনের জ্বালাহীন আভা এসে স্পর্শ করছে চল্লিশের এই শুভ্র ললাট। যৌবন দীর্ঘায়িত হয়েছে প্রৌঢ়ত্বের প্রশান্ত রাজ্যে। নিস্তরঙ্গ প্রৌঢ়ত্বের স্রোতে সঙ্গে সঙ্গে জেগেছে যৌবনান্তের মৃদু কলতান।

সুস্থ প্রৌঢ়ত্বলাভ করেছি আমরা বিজ্ঞানের প্রসাদে—চল্লিশের চক্রতলে আমরা এখন নিষ্পেষিত হয়ে যাই না। পূর্বযুগে মানুষ তা ভাবতে পারত কি? পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তী ছাড়ুন। আমরা জানি ষোল থেকে বত্রিশ, এই ছিল যৌবনের সীমানা, অন্তত এই দেশে। জীবনের তা মধ্যভাগ। তারপরে আর প্রত্যাশা করা চলত না কিছু—তখন বানপ্রস্থ। জীবনে মাত্র ষোল বৎসর —ষোল থেকে বত্রিশ—এই ছিল তাদের স্বর্গ। আশ্চর্য নয় যে, সেদিনের অর্ধেক কাব্য ও কল্পনা ভরে গিয়েছে এই স্বল্পায়ু যৌবনের প্রমত্ত প্রলাপে। আর খুবই স্বাভাবিক তারপর বাকি অর্ধেক ছাপিয়ে উঠছে সেই বিলুপ্ত যৌবনের ব্যর্থ বিলাপ। জীবনের সমস্ত অর্থ তাদের নিকট শেষ হয়ে যেত দুই স্তবকে—'শৃঙ্গারশতকে' আর 'বৈরাগ্যশতকে'। শৃঙ্গারশতকের অনিবার্য পরিণতি ছিল বৈরাগ্যশতক। মাঝখানে কিছু নেই—শূন্য; যৌবনে নেই সংযমের সবলতা, প্রৌঢ়ত্বে নেই সুস্থ সরসতা।

বিজ্ঞানই এই যৌবনকে দীর্ঘায়ু করেছে—বত্রিশের থেকে নামিয়ে তাকে চল্লিশের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। আমাদের সভ্যতাও তা নিয়ে একই সঙ্গে সৃষ্টি করছে—সৌন্দর্য আর বিভ্রমবিলাস। 'ঠোঁটের সিন্দূর' অক্ষয় হচ্ছে আজ সুন্দরীর; অঙ্গরাগে আসতে পারে বরাঙ্গে দৈনিক এবং সাময়িক চিক্কণতা। দেহযষ্টিতেও ইদানীং আসতে পারে পণ্যভারে পীনোন্নত যৌবনের সমৃদ্ধি। এ যৌবন অবশ্য নিজেদের উপলব্ধির জন্য নয়, অন্যদেরই প্রলুব্ধির নেশায়। শুধুই পশরা সাজানো। কিন্তু সত্যই নারীত্বকে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দিতে পারে আজ বিজ্ঞান, তাও মানতে হবে। 'কুড়িতেই বুড়ী' হবে না আজ বাঙালী নারীও—যদি দিতে পারেন তিনি সভ্যতাকে কাঞ্চন-মূল্য। কুড়ি থেকে আশী পর্যন্ত বণিক্ সভ্যতা সমভাবে সকলকে যুগিয়ে যেতে পারবে বিভ্রমের পণ্য—যদি থাকে তাদের ক্রয়-ক্ষমতা।

বিজ্ঞান যৌবনকে দীর্ঘায়ু করেছে ঠিক, কিন্তু যৌবন চিরায়ু নয়। কুড়িতে যে বুড়ী হবে না, সেও চল্লিশে ছুঁড়ী থাকবে না। হোন তিনি ক্লিওপেট্রা, আন্টোনিওর হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী রাজ্ঞী, অগস্টাসের চোখে তাঁর বয়স ও বিভ্রম বিশুষ্ক। বত্রিশে যে বিগতযৌবন নয়, চল্লিশের পারে এসে তাকেও স্বীকার করতে হবে 'বয়স হয়েছে'। গ্রন্থিরস-বিদ্যার আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা হয়তো একদিন আপনাকে পৌঁছে দিতে পারবে আর এক-আধ দশকের ওপারে। এখনো আপনার ভাঙা কুঞ্জ নূতন করে সাজাতে পারেন ভরোনফের পরামর্শ অনুযায়ী। কিন্তু সে ক্ষণবসন্তে ফুল ফুটবে না আর শাখায়। মুকুলেই ঝরে যাবে অকালের সেই কুসুমের স্বপ্ন। বয়স হবেই একদিন, তা-ই প্রকৃতির নিয়ম। বাঁচলেই বয়স হবে—এটা প্রকৃতির পরিহাস নয়, তার পরিপূরণ। ফুলকে সে সার্থক করে ফলে, ফলকে সে সঞ্জীবিত করে বীজে, আর বীজকে সে পুনরুজ্জীবিত করে অঙ্কুরে—আবার নূতন করে ফুল ফুটবে, ফলবে ফল। অর্থাৎ বারে-বারে ফুরোবে ফুলের উৎসব। প্রকৃতির এটা প্রতিশোধ নয়, সৃষ্টির পরীক্ষা। আপনার আমার প্রাণলীলায় আমরাও তার সে-পরীক্ষায় যোগ দিয়েছি। তার সঙ্গে জেনে না-জেনে হাত মিলিয়েছি এই ইতিহাস-জোড়া সৃষ্টির পরীক্ষায়। প্রতিযোগিতা আছে আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে, কিন্তু তা সহযোগিতারই শর্তে। প্রকৃতিকে আমরা সহায়িকা করে তুলি তার নিয়ম-রাজ্যের রীতিনীতিকে আমরা স্বীকার করি বলেই। বয়স হলেও তাই বয়সকে যদি আমরা মানতে কুণ্ঠিত হই, তাহলে প্রকৃতির পরীক্ষা হয়ে ওঠে পরিহাস। আর সে পরিহাস বড় নিষ্করুণ। এমন বিদ্রূপ আর নেই, যযাতি-যৌবনের মতো।

অসহায় এই মানুষকে করুণার চোখেও দেখা চলে—ইচ্ছা করলে। কিন্তু, না, কেউ আমরা ক্ষমা করতে পারি না বৃদ্ধের প্রণয়-বাসনা। টেকো মাথায় টেরি কাটার সযত্ন আয়াস, স্থূলাবয়বে বসন-বিলাসের স্থূলতর বিজ্ঞাপন, দীপ্তিহীন চোখে বাসনাক্লিষ্ট উত্তাপ, যৌবন-সুলভ তৎপরতায় শ্লথ পেশী ও শিথিল মাংসপিণ্ডের শ্রীহীন বিড়ম্বনা—মানবপ্রকৃতির এরূপ কেন্দ্রচ্যুতি প্রকৃতির মতোই আমরাও ক্ষমা করি না। প্রিন্স হেনরির মতো চিরদিনই রাজ্যাভিষিক্ত জীবন-জয়ী বলবে এই বৃদ্ধ ফলস্টাফকে।—

I know thee not, old man ;
fall to thy prayers

How ill white hairs become
a fool and jester.

বয়স হলে বয়স্কই হতে হয়—বয়স্ক-বৃত্তি আর মানায় না।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ উদ্গত হলে ফল যাই ফলুক তার দৃষ্টিশক্তি যদি তীক্ষ্ণতা হারায়, পক্ষ যদি খোয়ায় ক্ষিপ্রতা, দেহ হারায় চাতুর্য, তা হলে কিন্তু তার ফল—মৃত্যু। জীব-জগতে জড়তা নেই, প্রৌঢ়তাও নেই—আছে মৃত্যু।

আদিম সমাজেও প্রৌঢ়ত্ব আসত মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে—অশক্তের জন্য অনুকম্পা নেই সেখানে। সভ্য সমাজ অন্নং বহু কুর্বীথ। অথবা অন্নই বহু হলেন, আর তাই সমাজ লাভ করলে সভ্যতার সন্ধান। ক্ষীয়মাণ যৌবন লাভ করলে তার সঙ্গে বিশ্রামের অধিকার, পরিণতির দায়িত্ব—প্রৌঢ়ত্ব পেল স্বীকৃতি। কিন্তু পঞ্চাশোর্ধ্বে—তখনো সমাজ জানায়—বনং ব্রজেৎ।

কতটুকু বিশ্রামের আর পরিণতির সুযোগ দিয়েছে মানুষকে এখনো সেই সমাজ? বার্ধক্যকেও সমাজ দিতে পারে সংবর্ধনা। আজ পর্যাপ্ত তার পণ্যভার। সৃষ্টিতে সার্থক হতে পারে আজ প্রত্যেক মানুষ আর তাই স্বস্তিতে পরিণতি লাভ করতে পারে প্রৌঢ়ের আত্মসংহত শক্তি। কুড়ি বছরে আজ তাই কারুবিদ্ হয়ে ওঠে সোবিয়েতের যুবক-যুবতী। চল্লিশ বৎসরে তারা জীবিকার্জনের দায় থেকে পায় অব্যাহতি, শ্রমার্জিত অবকাশ আসে তখন জীবনে—লৌহ-যবনিকার ওপারে। চল্লিশে কেউ তারা নতুন জীবন গঠন করে তখন। পরিণত অভিজ্ঞতার ফসল তারা তখন তুলে দেয় খামারের সভায়, কারখানার মন্ত্রণায়, বিজ্ঞানের গবেষণাগারে, প্যালেস অব কালচারের পরিষদে জলসায়। আড্ডা আসরের অপচয় নয়, বয়স আর বিভীষিকা নেই এখন, তা উৎসব। অবসর-প্রাপ্তের জীবনে নামে না অবসাদ, আসে সৃষ্টির স্বাধীন প্রকাশের অবকাশ। তা হলে আপনার আমারও পঞ্চাশোর্ধ্বে জীবন আড্ডায়, আসরে, সভায়-সংসদে স্বাচ্ছন্দ্যে আসতে পারে এই উৎসবের মতো —স্বাধীন সৃষ্টির দাবি নিয়ে—For the singing Tomorrows—কিংবা তাই কেন? সেই সঙ্গীতমুখর দিনের পূর্বেও আপনার-আমার পঞ্চাশোর্ধ্বের পরিণত অভিজ্ঞতা ও নিঃশুল্ক কর্মশক্তি আমরা উৎসর্গ করতে পারি সাহিত্য-পরিষদের গবেষণায়, আলোচনায় ও সেবায়, এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণায় ও পরিচালনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বা শত শত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিঃশুল্ক কর্ম-পরিষদে, ছন্নছাড়া কর্পোরেশনের বা অবজ্ঞাত কো-অপারেটিবের প্রবুদ্ধ

পরিচালনায় ;—কতখানে। মুনাফার এই চক্রব্যূহের মধ্যেও আমাদের এই প্রসন্ন প্রৌঢ়ত্বের হতে পারে স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠা—যদি জানি আমাদের আছে বার্ধক্য-বীমা, আছে আমাদের প্রভিডেন্ট ভাণ্ডারের শ্রমার্জিত সঞ্চয়, আছে চিকিৎসার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যাবাস ও চিকিৎসালয় ; আছে আমাদের পুত্রকন্যার শিক্ষার ও পরিবারের প্রতিপালনের নিশ্চয়তা। এ সব আর অসম্ভব নয়, তা আমরা জানি ; কিন্তু যতক্ষণ অসম্ভব ততক্ষণ পঞ্চাশোর্ধ্বে আপনার হাত কাঁপবে—সৃষ্টির উৎসবে আমন্ত্রণ পাবেন না, আশ্রয় হবে স্মৃতির রোমন্থন, আত্মকথার আবৃত্তি।

পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে এসে গিয়েছি আমরা পঞ্চাশের এপারে—স্মৃতিকথা-লেখার যুগে এসে গিয়েছি, কারণ বেঁচে রয়েছি। বেঁচে রয়েছি, তাই সে বাঁচারই নিয়মে গ্রহণ করতে পারি এখনো জীবনের দান, বুঝতে পারি তার রূপ। বেঁচে রয়েছি, তাই সে বাঁচার নিয়মে আমরা পেয়েছি জীবন-রসের স্বাদ, জেনেছি মানব-সত্তার রহস্য। প্লাস্‌ওয়ান থেকে কি আপনার চশমার জোর বেড়েছে প্লাস-থ্রিতে ? হাতে এসেছে কলম-ক্লান্তি, বাহুতে শিথিলতা আর কাঁধে বাতের উপদ্রব ? আসবেই ; অনিবার্য ওই প্রকৃতির নিয়ম।

We must endure
Our going hence, e'en as out coming hither
Ripeness is all.

বাঁচার দাবিতেই তাই মেনে নিয়েছি এই বাঁচার শর্ত। হেসেছি আর কেঁদেছি, পেয়েছি আর দিয়েছি, নিয়েছি আর হারিয়েছি, যুঝেছি আর বুঝেছি। বুঝেছি—Ripeness is all।

কিন্তু সে-পূর্ণতা আর শুধু আমাকে নিয়েও নয়, আমারই স্মৃতিতে পরিসমাপ্ত নয় আমার পরিণতি। The best is yet to be। তারই দিকে চলছে আমার ও আপনার পঞ্চাশের পথ। অকস্মাৎ কোন দিন তেনজিং-এর মতো উঠে দাঁড়াল মানব-স্পর্ধা জীবনের কোন্ চূড়ায় ; হঠাৎ একদিন এশিয়ার নদীতে নদীতে জাগল প্রাণসমুদ্রের নতুন জোয়ার ; আফ্রিকার অনাদিকালীন অরণ্যানী মাথা তুলে উঠল সভ্যতার হিংস্র প্রলাপের প্রতিরোধে,—আর তারই সঙ্গে আপনার আমার পঞ্চাশোর্ধ্বের ক্ষীণ রক্তস্রোতেও লাগে দোলা, জড়িয়ে যায় আমাদের স্বপ্নে ভাবী সম্ভাব্যকাল, চেতনায় জাগে আগামীর, আগমনী।

কিন্তু ততক্ষণে ট্রামে যদি শুনি, 'বুড়ো মানুষ, বসুন', সত্যই আরামের নিশ্বাস ছেড়ে বসি, আর বসে আরাম পাই

ফাঁকি দেবার বয়স এ নয়,
বয়স মোরে দেয় নি ফাঁকি।
পেয়েছি ঢের, চেয়েছি আরও,
রইল যা তা রইল বাকি।
তোমরা নেবে দু'হাত ভরে
আমরা যা সব গেলাম ফেলে।
ঠেলাঠেলির বয়স গেলে
আসন যেন সবার মেলে।
অথবা 'আড্ডা দিব সবাই মিলে'।

এইটুকুই চাই পঞ্চাশোর্ধ্বে—বসবার মতো একটু আসন। আড্ডা দেবার একটা জায়গা। হয়তো বা চাই আরও—রক্তে যখন ভাঁটা পড়েছে, আর শিরার ভেতরে ভেতরে জমেছে পলির আস্তরণ, বিজ্ঞান যখন ব্যবস্থা দেয় পুষ্টির ও প্রোটিনের—পঞ্চাশকে করতে চায় মসৃণ মোলায়েম—তখন হয়তো চাই ওল্ড এজ ইনসিউরেন্স নয়, বার্ধক্য-ভাতা নয়, সঞ্চিত-ভাণ্ডার নয়,—চালে আরও একটু কম কাঁকর, চিনিতে আরও একটু কম ধুলো, তেলে আরও একটু কম তেঁতুলের বীচি, মাছে আরও একটু কম মন্ত্রিত্বের শ্যেনদৃষ্টি, দুর্মূল্যতার এই পাথরতলে আমাদের বাঙালী প্রাণের জন্য আরও একটু ফাঁক বই-পড়ার, বই নিয়ে আড্ডার—আর বই-কেনার ও বই-বিক্রির।

রেলগাড়ি

নবেন্দু বসু

আমার পরিচিত অনেকেই দেখেছি রেলভ্রমণকে ভয় আর বিরক্তির চোখে দেখেন। তাঁরা যেন সেটা এড়াতে পারলেই বাঁচেন। বোধ হয় রেলে যাওয়ার আনুষঙ্গিক তথাকথিত অসুবিধাগুলোই তাঁদের মনে ভীতি সঞ্চার করে। তল্পিতল্পা, পয়সার থলি, নিজের দেহকে সামলানো, ব'সে ব'সে যাবার বাধ্যতামূলক নিষ্ক্রিয়তা, এতগুলি মানবসন্তান বা স্বজাতীয়ের সঙ্গে অতক্ষণ সদ্ভাব রাখা—এতগুলি প্রয়াস একসঙ্গে ধৈর্যের পক্ষে বেশি হয়ে পড়ে। দৈনিক অভ্যাসের ব্যতিক্রম অনেকের পক্ষেই যন্ত্রণাদায়ক হয়। রেলে কেউ নিজস্ব সময়ে জল পান না, পান পান না, তাতে অসুবিধা বোধ করেন ; যদিও এঁদের অনেকেই জীবনের অনেক বৃহত্তর বাধাবিপত্তিকে বেশ ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই চলতে পারেন।

দৈনিক নিয়মের ব্যতিক্রম থেকেই কিন্তু আমার কাছে কাজেই হোক আর অকাজেই হোক রেল-ভ্রমণের মোহ সুরু হয়। সে ব্যতিক্রম আমাকে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করে এমন এক জগতে যা প্রত্যহের দুনিয়ার চেয়ে কতকটা পরিমাণে নতুন। ঐ যে পায়ে-চলা রাস্তার চেয়ে একটু উঁচু দিয়ে গাড়ি যায়। আর তার চেয়ে একটু উঁচুতে গাড়ির আসনে বসে থাকি, তাতে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'লেও, কেমন অসংলগ্ন বা আলুগা বোধ করি। সেই শিথিল জগতে থেকে যতক্ষণ রেলে চলি, কেবল মাটির সঙ্গে মায়ার বন্ধন সৃষ্টি করতে করতে আর কাটাতে কাটাতে চলি। অনেকক্ষণ নির্জন মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চ'লে কোলাহলময় কোনো স্টেশনে এসে থামলো, মাটির ছোঁয়া আবার পেলুম। যাত্রীদল আর বিক্রেতাদের কণ্ঠস্বরে, কাজে, ভঙ্গিতে—রোজের স্থিতির জগতের আস্বাদ আবার ভালো লাগলো। ফলবিক্রেতা যখন বলে এ শহরে এখন মড়ক হচ্ছে, খাদ্যসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য আর অগ্নিমূল্য, তখন তাকে প্রতিবেশী বন্ধু ব'লে মনে হয়, যার সঙ্গে সকালে বাজার করতে গিয়ে প্রতিদিন ঐ কথাই হয়। আবার শিশুকন্যাকে কাঁদতে দেখে একটা কুলি যদি একটু হেসে বলে,

'খুকী, কেঁদো না', তাকে মনে হয় নিকট আত্মীয়। আবার গাড়ি উধাও হ'য়ে ফাঁকা মাঠে শূন্যতার মধ্যে বার হ'য়ে যায়। দশ মাইলের মধ্যে ঐসকল বন্ধুদের মুখ গাড়ির গতিতে গতিতে ঝাপসা হ'য়ে মন থেকে অপসারিত হয়; স্মৃতির ভার নামিয়ে মন ফাঁকা; অন্য ছবি ধরতে আবার উন্মুখ।

গাড়ি তার নির্মমতায় টেনে নিয়ে চলবেই, আর তার মধ্যে তাই কোনো কিছু পাকা অভ্যাস হ'য়ে মনে গেঁথে বসতে পায় না ব'লেই, রেলে যেতে সব-কিছু নতুন চোখেই দেখি। বেশির ভাগ মামুলী সাধারণ দৃশ্যই সব দেখি, কিন্তু তাতেই থাকে নতুন অভিজ্ঞতার আভাস, বিস্ময় আর উৎসাহ।

জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে দেখতে যখন গাড়ির ভিতরেই দৃষ্টি ফেরাই, তখনও বাইরের বিক্ষিপ্ত প্রশস্তির মধ্যে থেকে সহসা সংকীর্ণ পরিসরে বদ্ধ হ'য়ে যাওয়ায়, ভাসা-ভাসা ব্যাপ্তির চেয়ে সে দৃষ্টির যেন গূঢ় গভীর অন্তর্দৃ'ষ্টির ক্ষমতাই জন্মায়। গাড়ির মধ্যেকার লোকের জিনিসের খুঁটিনাটিও তাই যেন স্পষ্টতর, পূর্ণতররূপে দেখি। দেহে গতিরোধ আর চিন্তারাজ্যে সে সময়ে জড়তা না থাকলেও কেমন অখণ্ড অবসরের অলস মন্থরতা। এই বিরোধী গতিবেগের চেতনা-সংঘাতে কল্পনা বুঝি পরতে পরতে দল মেলতে থাকে।

গাড়ির ভিতরেই কি, আর বাইরেই কি, ক্ষণিকের জন্যে দেখি ব'লে আশু বিচ্ছেদের শঙ্কিত আগ্রহে দেখি। তীব্র অনুরাগের ব্যগ্র দৃষ্টিতে দেখি। এমনই স্পর্শলোভী মনে চলন্ত গাড়ির মধ্যে থেকে দেখেছি রাজপুতনার সীমান্তে গ্রীষ্মের রূঢ় আলোয় জ্বলন্ত দুপুরে বাবলাগাছের সারিতে বাবুইপাখির বাসা; তৃণ-বিরল ধূসর মাঠে ছাগলের পাল; অলস রোমন্থনরত এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত গরু মহিষ। শীতকালে যুক্তপ্রদেশে খালের জলে সেচন করা হল্‌দে ফুলে ভরা সর্ষেক্ষেতের মধ্যে দেহের অর্ধেক ডুবিয়ে গাড়ির শব্দে ত্রস্ত চাউনিতে তাকিয়ে থাকে সারস পাখি। ঝিরঝিরে বর্ষায়, পাতলা মেঘে ঢাকা চাপা আলোর দিনে কোমরে কাপড় এ'টে মাঠে নারী জলে পা ডুবিয়ে ধানের চারা বসায়—বাংলা থেকে দূরে কোথাও—গোণ্ডিয়া বা ডোঙরগড়ে—নীচু নীচু পাহাড়ের কাঁকুরে দেশে। মানভূমের লালমাটির প্রান্তরের ওপারে রক্তরাঙা সূর্যাস্ত হয় কোডারমায়। নানা রঙের পাগড়ি মাথায় টালি আর অভ্রব্যবসায়ী মাড়ওয়ারীরা গাড়ি থেকে নেমে খালাসীদের কাছে বালতি থেকে জল নেয়। ঝিঁঝি-ডাকা সন্ধ্যায় তাঞ্জোরের পথে ছায়াঘন কলাবাগানের পাশ দিয়ে আহিরিনী চ'লে যায় দুধের পাত্র মাথায় নিয়ে লীলাঞ্চিত গতিতে। অন্ধকার ঘন কালো রাত হয় সাসারামের

কাছে। ওদিকের ঝাঁকুনিতে হালকা ঘুম সহজে ভাঙে। গাড়ির চাকার ঘর্ঘর থেমে যাওয়ার নীরবতা আর গভীর রাতের জমাট আঁধার ভেদ ক'রে খালাসীর কণ্ঠ স্টেশনের নাম হেঁকে যায়—'জাখিম'। হিমরাতের ঘনতা যেন শানিত তলোয়ার দিয়ে কাটে। মোটা কম্বলে ঢাকা লোকটা চাপা খট্‌খট পায়ের শব্দে কাচ-আঁটা গাড়ির জানলার পাশ দিয়ে চ'লে যায়। সে জানতে পারে না যে আমি বাইরের দিকে চেয়ে আছি। তার মিটমিটে লণ্ঠনের আলো ক্রমশঃ দূরে চ'লে যায়। পয়েন্টসম্যানকে ডাক দিয়ে নাইট-ডিউটির বাবু কি যেন বলেন। ঐটুকু শব্দ, ঐটুকু হাঁকডাক, প'রপূর্ণ নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে কেমন যেন অপার্থিব, অস্বাভাবিক, চকিত চঞ্চলতা। আবার যখন গাড়ি মাঠে বেরিয়ে নির্জন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে, তখনই যেন আবার সবরকমে সংগতি আসে। আবারও হালকা ঘুমের দোলায় চেতনা বিলুপ্ত হয়। সুদূর ভিল্লুপুরম জংশনে শেষ রাত্রি; জনতায়, কলরবে, আলোকমালায় প্রথম রাতের মতোন; প্রায় দিনদুপুরের মতোন কারবার। আর ঘুমের সময় নয়। এ মাহেন্দ্রক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে স্টলে দাঁড়িয়ে গরম এক পেয়ালা উপাদেয় কফি খেতে হয়। সঙ্গে রুটি-বিস্কুট নয়। শুধু জোরালো এক পেয়ালা কফি—জিভের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে, আঘ্রাণের মীড়ে মীড়ে, যা গলা দিয়ে নামে। পেয়ালায় চুমুক দিই আর মানুষের আনাগোনা, বেশভূষা, কাজকর্ম আর জিনিসপত্র দেখি। বর্ধমানের পর গাংপুর—ভোরের আলোয় গাড়ি পার হয়। মাঠের আলপথ ধরে হালকা গায়ের কাপড়ে কান মাথা পর্যন্ত জড়িয়ে দীর্ঘাকৃতি শীর্ণকায় পল্লিবৃদ্ধ রেলপথের নীচে নীচে চলে। শীতল হাওয়া, প্রশান্ত প্রকৃতি, শান্তগতি বৃদ্ধ; গাড়ির মধ্যেকার ভিড়ের অসুবিধায়, সারারাত্রি জাগরণের পর উত্তপ্ত চোখ মাথায় অবস্থায় দেখতে বড়ো প্রীতিপ্রদ বোধ হয়। শ্যাওলা-ঢাকা পুকুরধারে কাঁসা-পিতলের বাসনের মধ্যে কালো বাহুগুলিতে শাদা শাঁখাগুলি রৌদ্র থেকে ছায়া-করা সবুজ কলাবনের পটে উজ্জ্বল দেখায়। শ্রীরামপুরের খেলার মাঠের বাঁ দিক দিয়ে ঐ বাঁকা বড়ো রাস্তাটার উপর দিয়ে আনাজপাতির বাজরা নিয়ে সাদা কাপড়-পরা ঐ যে দীর্ঘাঙ্গীটি চলে যায়, স্বাস্থ্যের লাবণ্য ওর দেহে।

গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময় আসে। তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিতে সারা-রাত্রির সঙ্গী যাত্রীদলের কথা একবার মনে হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্থান-দখলের জন্যে দলাদলিতে যারা কথায়, কণ্ঠস্বরে, ব্যবহারে, অবস্থিতিতে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিলো, গভীর রাত্রে তাদের দেখেছিলুম সুপ্তির মধ্যে

একাকার ; গাড়ির দোলায় গলাগলি ; এ ওর গায়ে ঢলাঢলি। দিনে যে এক-জন অন্যের গলা কাটতো, রাতে সে তার কাঁধে মাথা দিয়ে শুয়ে রইলো। কার ঘাড়ে কার মাথা—কে কার গলা কাটে। দিনে দেখেছিলুম সকলের মুখ একভাবের—বুদ্ধির, স্বার্থের, প্রতিযোগিতার একাকার জগৎ-জোড়া রূপ। রাত্রে, সুপ্তির মধ্যে, মুখোস খ'সে যায় ; প্রত্যেককে দেখি তার ব্যক্তিগত রূপে। কাউকে দেখি বকের মতোন, কাউকে হাঁসের মতোন ; কেউ বাঘ, কেউ ভেড়া। একটি বউ রাত্রে ঘুমোয় না ; জানালায় মুখ দিয়ে বাইরের অন্ধকারের পানে চেয়ে ব'সে থাকে—বলে, রেলে অল্পই চড়েছে ; জেগে কখনও রাত কাটায় নি ; ঘুমোবে না। ভোর ক'রে দেয়।

আর ভারতবর্ষে রেলভ্রমণ—কত প্রাদেশিক রকমারী। যুক্তপ্রদেশে গাড়ি ঢোকে। গুরুগম্ভীর পাঞ্জাবী 'গোস্ত রোটী' হাঁক ঈষৎ কাংস্য-কণ্ঠে 'পুরী তরকারী'তে পরিণত হয়। লোকজনের ওঠানামার গোলমালের মধ্যে কোনো স্টেশনে শুনি ফল-বিক্রেতা কলার দাম বলছে 'তিন আনা দরজন ; না তোল, না মোল'। 'এক দাম' এই কথাটাই তো বেশ সরস ক'রে বললে। পশ্চিমকে কেন লোকে কাটখোট্টার দেশ বলে ? গ্রীষ্মের দুপুরে একটা ছোটো স্টেশনে গাড়ি থেমেছিলো অনেকক্ষণ। তৃতীয় শ্রেণীর এক প্রৌঢ় নাগরা-পাগড়ি-ধারী কাঁধে ঝোলানো চকচকে পিতলের 'লোটা' আর 'ডোর' নিয়ে নেমে গিয়ে স্টেশনের বাইরেই এক ইঁদারা থেকে ঠাণ্ডা জল তুলে খেয়ে এসে তৃপ্তির সঙ্গে বললে—'প্রেমদার পানি !' ঠাণ্ডা কুয়ার জলে গ্রীষ্মের তৃষ্ণা নিবারণে প্রেমের শীতলতা, তৃপ্তির গাঢ়তা—এ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী খোট্টার ভাষা, না সর্বদেশের সর্বকালের কবির ভাষা ? ঘনিয়ে-আসা সন্ধ্যার মুখে দিলদারনগরের 'ইয়ার্ডের' diamond points গুলো ভীমবেগে গাড়ি পার হয়। বাতাসের দাপটে প্ল্যাটফর্মে সান্ধ্যবায়ুসেবনরত বঙ্গমহিলাদের মাথার কাপড় বিস্রস্ত হয়। চুলের সঙ্গে ব্রুচ দিয়ে মাথার কাপড় এঁটে রাখবার প্রথা উঠে গেছে। গাড়ি-চলার ধম্‌ধম শব্দের সঙ্গে একটা খস্‌খস আওয়াজের ছোঁয়াচ লাগে। ঘণ্টায় ষাট মাইলের কাছাকাছি চলেছে। নব্বই পাউণ্ডের বেশি ওজনের রেলগুলো বুঝি। এঞ্জিন কি heavy passenger super heater ; ক'টা fly wheel ? স্থূলবপু বেঁটে গলা, বৃষস্কন্ধ—কাঁটাপুকুরের ডকের ধারে বিবেকানন্দের সম্ভ্রম দাবি করেছিলো।

বিহার চলেছে। যুক্তপ্রদেশের 'পুরী তরকারী' একটু ছন্দের মধ্যে শুনি—

"পুরী লো, মিঠাই লো, পুরী'। শুধু বিজ্ঞাপন নেই, তার সঙ্গে একটু ছন্দ আর সুরের প্রলোভনও যুক্ত হলো। এখন যে বাংলার পানে চলেছি—বিস্তারের, elaboration-এর দেশ মোকামা পার হয়—বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত মোকামা। কি সব ছেলেই ছিলো ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী। কি নেতৃত্বের হাতে কি যুবশক্তির অপব্যয়ই ঘটলো। হিসাব খতাবার দিন চলে গেছে। এই যা ভালো। রাজমহলের কাছ দিয়ে গাড়ি যায়—ঘেড়িয়া উধুয়ানালার যুদ্ধ। মীরকাশিম কি সে-দিনের দেশ-হিতৈষী। সাঁওতাল পরগনা দিয়ে চলি—সুন্দর নামের সব 'ব্লক হাট্' কেউ খেয়াল করে না—নূরগঞ্জ, লাহাবোন। জশিডি না কোথায় কিছু বাঙ্গালী যুবক মেয়েদের গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল। দু-একজন যুবকের চোখেমুখে কেমন যেন আর্দ্রতা—বাংলা নাকি প্লাবনের দেশ। মধুপুর এলো—বাঙালীর স্বাস্থ্যনিবাস। এরা বিকেলে রেল-স্টেশনে বেড়ায় ; প্ল্যাটফর্ম-টিকিট চাইলে বলে "we are changer"—changers-ও নয়। বিহারের ভূমিকম্পের পর থেকে নাকি মধুপুরের জলে অভ্র (mica) বেশি আসছে ; ডিস্পেপসিয়ার পক্ষে আর তত ভালো নেই ; যুদ্ধের পূর্বে নাকি ও-অঞ্চলে বাড়ি আর জমির দর পড়ে যাচ্ছিলো। তবু এখনও মধুপুর বাঙালীর পক্ষে মধুময়! ওরা দেওঘরের বাজারে শীতকালে কলকাতার ভেটকী মাছ গুরুপাক ক'রে রান্না ক'রে খেয়ে আর মিষ্টান্নের দোকান থেকে বড়ো আকারের কালো জাম, ছানার জিলিপি খেয়ে, কলকাতায় ফেরবার আগে রেলের গাড়িতে ব'সে হিসাব কষে যে 'এবারে দশদিনের বেশি টানের হাওয়া পেলুম না'। ভাবনা কোনো নেই। অজীর্ণের ওষুধ পেঁপে ওখানে ফলে প্রচুর। মধুপুরের মাটি, মহেশমুণ্ডার জল—বাঙালীর সার্সাপ্যারিলা—ধন্য হউক, ধন্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।

বাংলার বর্ধমান আসতে পুরী-কচুরির গলা সীতাভোগ-মিহিদানার মিষ্ট গলায় মিহি হয়ে ডাকে 'খাবার'। কতকগুলি ছোটো ছোটো viaduct-এর ওপর দিয়ে কলকাতার দিকে গাড়ি চ'লে যায়। মধুপুরে সেই মাধুর্যের বিদায়-দৃষ্টির আলোয় ইন্‌টারক্লাশে-ওঠা মেয়ের দল হাওড়ায় নামে। বাস্তবিক বাঙালী মধ্যবিত্তের পক্ষে রেল-ভ্রমণের রস যেন ইণ্টারক্লাশেই জমে ভালো। যুবনাশ্বের "ইণ্টের ক্লাশ" থেকে যাঁরা আধুনিক কবিতা পড়েন না তাঁদের জন্যে একটু তুলে দিই :

ছাড়লো গাড়ি জশিডি স্টেশন থেকে।
বাক্স, বোঁচকা, প্রসাদ ও পেঁড়ার পুঁটুলী,
ও 'পাসে'র যাত্রী সপরিবার মালবাবু, তারবাবু
ও টালিবাবুর বেপরোয়া গার্হস্থ্য-বিস্তার অতিক্রম ক'রে
কোনোমতে ঠাঁই নিলেন দুজনে,
ইন্টের ক্লাশের অপরিসর অভ্যন্তরে।
লাল কস্তাপাড়ের হাফ-ঘোমটা সরিয়ে
মাল বৌদি উত্যক্ত বিরক্তিতে গুঁজলেন গালে
দোক্তা-পানের খিলি।
টালি-বৌঠান,
ঝালরদার বালিশের তৈলাক্ত আলিঙ্গন-লিপ্ত
নবম ও কনিষ্ঠ সন্তানের নগ্ন গাত্রে
দিলেন টেনে কাঁথার কোণা।
তারবাবু হঠাৎ উঠে প্রাণান্ত কাসির বেগ রোধ ক'রে
ঠুকলেন দেশালাই আধপোড়া বিড়ির প্রান্তে।
মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে
তুমি বসলে বেঞ্চের একধারে
আমি মেঝেয়।
সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে যায়।
সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে যায়।
মহুয়া বনের পার দিয়ে,
ফুটন্ত পলাশরাগে আগুন-লাগা দিগন্ত বেয়ে।
জানালা দিয়ে চোখ পড়ে
চাষ, রুক্ষ ক্ষেতের গোলকধাঁধা,
আর পলায়মান পাহাড়ের সার,—
আসন্ন অন্ধকারের আবির্ভাবে ভীত।

অচঞ্চল আকাশের নরম নীল
গাঢ়তর হ'য়ে ওঠে রাত্রির অঞ্চল-সঞ্চালনে।
হাজারো তারার মিছিল চলে সার বেঁধে মাথার ওপর।

ভেতরে চলে রেলবাবুদের অব্যাহত শান্তিপর্ব,
ঘূর্ণ্যমান ভূলোক চলে সাথে সাথে
সগর্জনে ছুটে চলে রেলগাড়ি।
ধীরে তোমার মাথা ঢ'লে পড়ে জানালার কাচে ;
ঘুমের কুহক আনত বিষণ্ণ মুখে আনে স্বপ্নের সম্মোহ।

* * *

আর জাগে
নিদ্রিত তারবাবুর স্ফটিকনির্মিত নকল চোখটি
বীভৎস কপট কৌতূহলে।

ইংরাজী আমলের বাংলা কবিতায় বেশ গোড়ার দিকেই রেলগাড়ি চালিয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। এর পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেলগাড়ির উপর কবিতা লেখেন।

দুজনের কবিতাতেই পশ্চিমের বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর কাছে ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের লজ্জা, অপমান, ব্যথা আর যন্ত্রণাবোধ প্রকাশ পেয়েছে, তবে সরকারী চাকুরে দীনবন্ধু স্বল্পভাষী ; বর্তমানের ক্ষোভ আর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশাটুকু প্রকাশ ক'রেই ক্ষান্ত ; স্বাধীনব্যবসায়ী আইনজীবী হেম প্রথমে স্তব-ধন্যবাদে তুষ্ট ক'রে, তারপরে ইংরাজের অবিচার বর্ণনা ক'রে, তারপরে আবারও তাদের শক্তির গুণগান ক'রে, আবেদন-নিবেদনের মধ্যে বিচার প্রার্থনা করেন—যাকে বলে advocacy।

দীর্ঘদিনের আবেদন-নিবেদনেও কিছু হলো না দেখে যুবনাশ্ব আজ ইংরাজের কথাই তুললেন না। নিজেদের ঘরের জীবনের বর্ণনাই তাঁর কবিতায় বিষয় হলো। তাঁর রেল থেকে দেখা প্রকৃতি-বর্ণনা হেমচন্দ্রের 'নিশ্বাস ছাড়ি', নিরুদ্বেগে, গাড়ির মধ্যে আরামে ব'সে 'হরিৎ বরণ মাঠ, ধান্য, নীল ইক্ষু, পাট', আর 'তাল, বট, আম বেল' দেখা নয়। এখনকার কবি বলেন যে 'বেল পাকলে কাকের কি'। তাঁর চোখ পড়ে হতাশ্বাস আর তিক্ততার দৃষ্টিতে 'চষা রুক্ষ ক্ষেতের গোলকধাঁধা, আর পলায়মান পাহাড়ের সার,—আসন্ন অন্ধকারের আবির্ভাবে ভীত'। তাঁর অস্তরাগে সোনার অক্ষরে কোনো অঙ্গীকার লেখা নেই। সাফল্যের 'মহুয়াবনের পার দিয়ে' তাঁর 'সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে যায়', 'ফুটন্ত পলাশরাগে', মনের প্রাণের 'আগুন-লাগা দিগন্ত বেয়ে'।

যা হোক, কবিরা যাই বলুন, আমার মধ্যবিত্ত বাঙালী ধাতে ঐ রেলগাড়ির

ইন্টারক্লাশে বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ভ্রমণের মধ্যবিত্ত অ্যাডভেঞ্চার বেশ নয়। এরোপ্লেনে উড়লে বাঙালী-ভয়ে আমার নাড়ি ছাড়তো; গরুর গাড়িতে বাঙালীসুলভ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেতো। রেল-ভ্রমণের মাঝামাঝি দুঃসাহসিকতায় আছে নিরাপদ রোমাঞ্চ—Auden-এর "selfish journey between the needless risk and the endless safety" বা "expansive moments of constricted lives" ("The Dog Beneath the Skin"—প্রথম chorus)।

সব রকমে রেলের ইন্টারক্লাশ মধ্যবিত্ত। যাত্রীদলের সামাজিক আর আর্থিক অবস্থার দিক থেকে তো বটেই, অন্যান্য দিক থেকেও। ওর আসন অতিমাত্রায় নরম গদিমোড়াও নয়, আবার কাষ্ঠাসনও নয়। আরো-নরম-হতে-পারতো গোছের ওর চামড়ার গদি। ওর বেঞ্চি এত চওড়া নয় যে বাড়ির আরামে ঘুমোতে পারি; এত সরুও নয় যে গাড়ির ঝাঁকুনিতে স্থানচ্যুত হই। ওতে ব'সে বিলাতি হোটেলের খানা খেতে হয় না, আবার প্ল্যাটফর্মের জালে-ঢাকা লুচি-মিষ্টিতেও আবদ্ধ থাকতে হয় না। দু জায়গা থেকে কিছু কিছু নিয়ে *a la carte menu* ক'রে খাওয়া চলে। ওতে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে অভিজাত রাজভোগ রসগোল্লাও নয় আর ইতর ময়দার গজাও নয়। ওতে চলে টানাপাকের সন্দেশ। ওতে ফলের রাজা আম খাওয়া চলে না, গ্রাম্য ফুটি-শশাও না। ওর ফল মাঝামাঝি লিচু জামরুল। শীতকালে বেদানা আঙুর না, শাঁকালুও না—আপেল কমলালেবু। শুকনো মেওয়ার মধ্যে ঝুনো নারকোলের কুচোও নয়, পেস্তাবাদামও নয়—চীনাবাদাম। ইন্টারক্লাশে সুখেও চলি না, দুঃখেও চলি না। ওতে অল্পস্বল্প উত্তেজনাতেও থাকি; কম বেশি নিরুদ্বিগ্নও হই; যেমন মধ্যবিত্তের আপিস যাওয়ার কালে আর ফেরার সময়ে বাঙালীর রেল ই-আই-আরের ইন্টারক্লাশের গাড়ির ভেতরে দেওয়ালে লেখা থাকে Muzzles—যার বাঁধন আপিসে; অন্যদিকে Butts—যার আঘাত বাড়িতে।

অটোগ্রাফ

প্রমথনাথ বিশী

আর কিছুই নহে, একখণ্ড কাগজে একটি স্বাক্ষর মাত্র—ইহারি জন্যে কত লোক পাগল। অটোগ্রাফ আদায় করিবার নূতন এক ধরনের পাগলামি বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। কোনো লোক কোনো প্রকার বিশিষ্টতা অর্জন করিলেই তাহার স্বাক্ষর আদায় করিবার জন্য ছুটাছুটি পড়িয়া যায়। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের মতো মহাপুরুষদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম—যে ব্যক্তি ভালো ফুটবল খেলিতে পারে, যে ব্যক্তি একদৌড়ে আর সকলকে হারাইতে সক্ষম—তাহাদের স্বাক্ষরের জন্যেও না কত আগ্রহ। যে কোনোপ্রকারে একবার বিশিষ্টতা অর্জন করিতে পারিলে আর তাহার রক্ষা নাই, সে বিশিষ্টতা যেমনি হোক, জলে-ভাসা সন্তরণ-বীরই হোক, কিংবা সাবান-গেলা সাবান-শহীদই হোক, আর গাছে চড়ায় পূর্ববর্তীদের রেকর্ড-ভঙ্গকারীই হোক। অমনি ছোটো বড়ো, স্ত্রী-পুরুষ পকেট হইতে, আঁচল হইতে ছোট্ট খাতাখানি খুলিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে—একটি স্বাক্ষর চাই। কোনো কারণে যাহার খাতা জোটে নাই, সে এক টুকরা কাগজ আনিয়া ধরিবে—একটি স্বাক্ষর চাই। সংগ্রহকারীদের মধ্যে আবার যাহারা বেশি উৎসাহী, তাহারা শুধু স্বাক্ষরে সন্তুষ্ট নয়—দুই ছত্র বাণীও তাহাদের চাই। সে বাণী যেমনি হোক আর যাহারি হোক—ফুটবল খেলোয়াড়ও যদি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করে—তাহাতেও তাহাদের যেমন আগ্রহ—গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের বাণীতেও ঠিক তেমনি। অটো-গ্রাফের খাতা মহত্ত্বের কুরুক্ষেত্র—সেখানে রথী, মহারথী, পদাতিক ও অশ্বারোহী এক ভূমিশয্যায় শায়িত। মহৎকে সম্মান প্রদর্শনের উপলক্ষ্যে মহত্ত্বের এমন অপমান আর কোথাও দেখা দিয়াছে কি ?

আসল কথা, প্রাকৃতজনের কাছে মহত্ত্বের বিশেষ মূল্য নাই, বিশিষ্টতা মাত্রেই তাহাদের কাছে সমমূল্য। সংসারে কোনোরকমে খানিকটা কোলাহল সৃষ্টি করিতে পারিলেই সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই কোলাহলের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ সব সময়ে সম্ভবপর নয়—স্বকালের মধ্যে তো নয়-ই, কাজেই

সেদিক দিয়া চেষ্টাই হয় না—নির্বিচারে সকলের স্বাক্ষর খাতায় গাঁথিয়া রাখা হয়—তারপরে সম্পূর্ণ নির্বেদ। মহাকালের উপরে যে ভার অর্পিত—মহাকাল কিছুদিনের মধ্যেই খাতাখানি লুপ্ত করিয়া তাহার সমাধান করিয়া দেন।

অনেক সময়ে ভাবিয়াছি অটোগ্রাফ আদায়ের মূল রহস্যটা কি? বীরপূজার ভাব? বিশিষ্টতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন? না আর কিছু! আমরা যে আগের চেয়ে এখন বেশি বীরপূজক হইয়া উঠিয়াছি বা বিশিষ্টতার প্রতি আসক্তি যে বাড়িয়াছে এমন মনে করিবার কারণ নাই। অনেক ক্ষেত্রেই ইহা ইউরোপীয় প্রথার অনুকরণ মাত্র, অনেক ক্ষেত্রেই ইহা অর্থহীন হুজুগ ছাড়া আর কিছু নহে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অটোগ্রাফের একটা বিশেষ দ্যোতনা আছে বলিয়াই মনে হয়। মানুষ মহত্ত্বকে, বিশিষ্টতাকে সম্মান করে, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করে। মহত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা বা শক্তি সাধারণ মানুষের নাই। মহত্ত্বের সহিত ভীতির কণ্টক যদি সংযুক্ত না থাকিত, তবে হয়তো মানুষ মহত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইলেও হইত। কিন্তু বর্তমানে তাহা সম্ভব নয়। এখন ভীতিকে বাদ দিয়া মহত্ত্বকে গ্রহণের যে সহজতম পন্থা মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার নাম অটোগ্রাফ। মরা বাঘের মুণ্ড বা নিহত মহিষের শিং মানুষ যেমন নিশ্চিন্তভাবে বৈঠকখানায় ঝুলাইয়া রাখে—মহাপুরুষের অটো-গ্রাফও ঠিক সেই মনোভাব হইতে সংগৃহীত ও রক্ষিত। অর্থাৎ ইহাতে মহত্ত্বের চিহ্ন আছে কিন্তু মহত্ত্বের কঠোরতা নাই, মহত্ত্বের প্রতি ক্লীবের সম্মানের ভাব আছে কিন্তু বীরের ভীতির সম্মুখীন হইবার পরীক্ষা নাই—ইহা যেন একপ্রকার মহত্ত্বের আমসত্ত্ব, মহত্ত্বের নির্যাস রৌদ্রে শুকাইয়া বাক্সে ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে—প্রয়োজনমতো বাহির করিয়া চাখিলেই হইল—গন্ধে ও স্বাদে আমের আভাস দেয় বটে।

যে কোনো কারণেই হোক, যাহার মাথা একবার সহস্রের ভিড়ের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে, তাহার আর রক্ষা নাই। একবার কোনোরকমে তাহাকে চিনিতে পারিলে অটোগ্রাফ-আমসত্ত্বের সংগ্রাহকের দল তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। স্থান, কাল, পাত্রের বিচার নাই। রেলের স্টেশনই হোক, আর রেস্তোঁরাই হোক, স্বদেশ হোক কিংবা বিদেশ হোক—সময় হোক, সময় না-ই হোক, তোমার প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া ছাড়িবে। তুমি যদি অস্বীকার করো, তাড়া দাও, কটু কথা বলো, তবে তাহাদের উৎসাহ আরো বাড়িয়া যাইবে। পাঠক, জীবনে যদি সুখী হইতে চাও, তবে সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে তোমার মাথা যেন আর দশ-

জনের মাথাকে কখনও ছাড়াইয়া না ওঠে।

মনে করো কলিকাতার কাজের কৃপণ মুষ্টি হইতে একটা দিনের ছুটি ছিনাইয়া লইয়া দুইশত মাইল দূরবর্তী এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছ। সেখানে দু'চার ঘণ্টার বেশি থাকিতে পারিবে না, সেই রাত্রেই ফিরিতে হইবে। বিকালবেলা যখন সেই দূরবর্তী স্থানে পৌঁছিলে আকাশে তখন কাল-বৈশাখীর অতর্কিত মেঘ উঁকিঝুঁকি মারিতে সুরু করিয়াছে। বন্ধুর বাসায় পৌঁছিয়া হাতমুখ ধুইয়া চা পান করিয়া দুইজনে যখন মুখোমুখি বসিলে—কালবৈশাখীর ঝড় লাল ধূলির প্রলয় গোধূলি সৃষ্টি করিয়া ছুটিয়া আসিল। গল্পটি দিব্য জমিবে মনে করিয়া যখন মনে মনে আগাম আনন্দ অনুভব করিতেছ—তখন, সেই উদ্যত ঝড়ের আক্রমণ অগ্রাহ্য করিয়া একদল—হাঁ, পাঠক, তুমি ঠিকই ধরিয়াছ—একদল অটোগ্রাফ-সংগ্রাহক আসিয়া প্রবেশ করিল, কোথা হইতে তাহারা শুনিয়াছে যে, একজন বিশিষ্টের আবির্ভাব হইয়াছে, আর কি তাহারা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে? তাহারা আসিয়া সলজ্জ বিনয়ে তোমার অটোগ্রাফ যাচ্ঞা করিল, স্তম্ভিত বিস্ময়ে তোমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল এবং অন্ধকারের প্রাদুর্ভাব বলিয়া লণ্ঠনের আলো উস্কাইয়া দিয়া আরো একবার দেখিয়া লইল। ধরো, তুমি যদি সাহিত্যিক হও, তবে তোমার রচনার সঙ্গে মূর্তিটা 'কপি ধরিয়া' মিলাইয়া লইল। তোমার মনের পুষ্পিত গল্পগুলার ততক্ষণে নির্বাণ লাভ ঘটিয়াছে। সময় অল্প। অটোগ্রাফ-শিকারীর দল যাইবার আগেই নির্দিষ্ট সময়টুকু চলিয়া গেল, কাজেই মনের গল্প মনে লইয়াই তোমাকে বিদায় লইতে হইল। ফিরতি ট্রেনে যখন চড়িলে, তখন কাহাকে অভিশাপ দিতেছ? অটোগ্রাফ-শিকারীদের না নিজের অদৃষ্টকে? যাহাকেই দাও—তোমার জীবন হইতে এমন একটা অমূল্য মুহূর্ত স্খলিত হইয়া পড়িল- আর যাহার ফিরিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। পাঠক, আমার কথা শোনো—জীবনে সুখ যদি পাইতে চাও, তবে অটোগ্রাফ-সংগ্রাহকদের কবল এড়াইয়া চলিও—তাহার একমাত্র উপায় তোমার মাথা যেন কিছুতেই জনতার ঊর্ধ্বে উঠিতে না পায়। হিমালয় উন্নত, কিন্তু অসুখী; অবনতশির বিন্ধ্যই সংসারে একমাত্র সুখী—হিমালয়ে অভিযাত্রীর অভাব নাই—বিন্ধ্যের অটোগ্রাফ কেহ কখনও দাবি করে নাই।

অলিখিত পৃষ্ঠা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সাদা কাগজের সন্ধান করছিলুম। সম্পাদকেরা লেখার তাগিদের সঙ্গে লেখবার কাগজ না দিয়ে ভুল করেন। দিলে, লেখকই যে শুধু অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে রক্ষা পায় তাই নয়, তাঁরাও লেখার গুরুত্ব যাই থাক, তার পরিমাণ বা পরিসর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। তাই এ-লেখা যদি প্রস্থসীমা অতিক্রম ক'রেও যায়, তবু কাগজের অপচয় বন্ধ করবার খাতিরেই এ-লেখা পত্রস্থ করতে হবে। আমার লেখা আমাকে ফেরত পাঠিয়ে আর কাউকে দিয়ে স্থানপূরণ করতে যাওয়ার অর্থ হবে এক কাজে একাধিকবার কাগজ লাগানো। অপ্রশ্রিত এ অপচেষ্টা। প্রেমপত্র লিখতে ব'সে পর্যন্ত বারে বারে বয়ান বদলানো বারণ।

খুঁজছিলুম বায়স্কোপের হ্যাণ্ডবিল পাই কিনা। সদ্ব্যবহারের যেটুকু বাকি ছিলো সেটুকু সমাপন করতুম। আদালতে হাজিরার ও-পিঠে সাক্ষীর জবানবন্দি লেখা হচ্ছে, বস্তাপচা নথির কাগজে দরকারী চিঠিপত্র। ডেমি কাগজের দেমাক এসেছে ফ্যাকাশে হ'য়ে। ঠোঙার কাগজ ছিঁড়ে উপরওয়ালার কাছে 'ভিজিটিং-কার্ড' পাঠালে আগে তলব আসে। পোস্ট-কার্ডের 'রাইটিং স্পেস' মানে উল্টো পিঠের ফাঁকা জায়গা সংগ্রহ ক'রে তাতে দরখাস্ত করার জন্যে আমাদেরই পাড়ার একটি ছেলে চাকরি পেয়েছে দেখলুম। লেফাফা জিনিসটা যে ফাঁপা এ এতদিনে আমাদের বুঝলে হয়।

এরি মধ্যে এতটুকু শুধু লাভের যে খবরের কাগজে আকারসংক্ষেপ হয়েছে। আরো কতগুলি প্রসহ্যহরণ, উত্তেজক ভেষজভাষ্য বিবাহসভায় সমাহূত নামের তালিকা আর মৃত্যু-অন্তে মৃতের অবধারিত গুণকীর্তন থেকে আমরা রেহাই পেয়েছি। শুধু কাগজ বাঁচেনি, সময়ও বেঁচেছে। এই খবরের কাগজের উপর জীবনভোর আমাদের কত সময় অপব্যয় হয় তার আনর্থক্য হিসেব করলে ব'সে পড়তে হবে। যা ঘটে গেছে তাতে আর স্বাদ নেই, যা ঘটতে পারে বা ঘটাতে পারি তাতেই বেশি রোমাঞ্চ। ম্রিয়মাণের চেয়ে নির্মীয়মাণ বড়ো জিনিস। পর্যুসিতের পর্যালোচনা না ক'রে নতুনতর রন্ধনের সন্ধানে গেলে বরং

কাজ দেবে। তাই হ্রস্বীভূত এই খবরের কাগজ একটা দৈবানুগ্রহ।

তেমনি হয়তো বিয়েতে পদ্য, বদলিতে মানপত্র ও বিক্রিতে ক্যাশমেমো গেছে উঠে। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটির সত্যিই অবসান হচ্ছে, স্বয়ং নিমন্ত্রক এসে দ্বারে দাঁড়িয়ে হৃদয়ের দ্বারমোচন করছেন।

কিন্তু আমাকে তো লিখতে হবে। আমি কাগজ পাই কোথা?

পুরোনো দিনের ধুলো ঘাঁটতে বসলুম। অনেক প্রয়োজনীয় আবর্জনা থেকে আবিষ্কার করলুম একখানি মোটা বাঁধানো খাতা, এবং বর্ষার অপগমে অকলঙ্ক আকাশের মতো, আশ্চর্য, তার অনেকগুলি পৃষ্ঠাই সাদা। প্লাবনের পর পাওয়া গেল যেন দাঁড়াবার জায়গা। দিগ্‌ভ্রষ্ট নাবিক যেন দেখলো তরণতীর।

প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলিতে অনেক হিজিবিজি আঁকা, অসমাপ্ত কবিতা, অসংলগ্ন ভাবের কতগুলি চকিতদ্যুতি, কখনো বা কোনো প্রিয়নামের জপ-প্রলাপ, কখনো বা অস্পষ্ট কোনো অপটু রেখাঙ্কন—বাকি পৃষ্ঠাগুলি অলিখিত, অমসীনিষেবিত। কী ভীষণ আশ্চর্য ও অসম্পৃক্ত মনে হলো। দেখতে পেলুম একটি অপ্রতিবন্ধ মুক্তরশ্মি বেগের উজ্জ্বলতা। শুধু প্রাণবহনের ব্যাকুলি। উদধিমেখলা পৃথিবী তখন হস্তামলক। দিগন্ত নাগালের মধ্যে, জীবন শুধু আগামী দিনের উদ্‌ঘাটন। লগ্নে তখন ভগ্নাশা, তবু দুরাকাঙ্ক্ষ। দেখতে পেলুম সেই বেগব্যক্ত বয়সের চেহারা। শুধু প্রাণধারণের দিনকৃতিতেই যেখানে কৃত-কীর্তি ছিলুম। কী পাই বা না পাই হিসেবের খাতা ছিলো না, শূন্য পকেটের বাইরে ছিলো না কোনো কোষাগার। ব্যর্থতাটা যখন মধুমান মনে হতো, বাধা মনে হতো ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি। শুধু অকারণে অবারণ আনন্দ। কখনো বদ্ধপরিকর, কখনো বা শিথিলমুষ্টি। কিন্তু সব সময়ে নিরবসাদ, নিরর্গল। যদি কেউ বলতো, সামনে যা দেখছ, ভুল দেখছ, ও শুধু মরীচিকা; তখন বলতে পারতুম সাহস ক'রে, সামনে যা দেখছ, ভুল দেখছ, ও আমার মানসস্বপ্ন। প্রেমের মাঝে দেখিনি তখনো পিপাসা, মন্দাকিনীতে দেখিনি তখনো ভোগবতী। বন্ধুর চোখে দেখিনি তখনো ঈর্ষা, শত্রুর চরিত্রে চিত্তদৈন্য। জনপ্রবাহের ত্বরান্বিততায় দেখিনি তখনো প্রতিযোগিতার কদর্যতা। কষ্টে তখনো গ্লানি ছিলো না অপমানের, বঞ্চনায় দেখিনি তখনো আত্মবঞ্চনা। শুধু কুড়িয়েছি, উড়িয়েছি, পুড়িয়েছি। অপ্রাপণীয়ই ছিলো লোভনীয়, উদ্‌ভ্রান্ত অন্বেষণই অভ্রান্ত লক্ষ্য। একটা কিছু রচনা করবো এই নির্মিৎসাই ছিলো তখন সকল

স্বপ্নের পিছনে। আর সেই নির্মিৎসার পরিচয় হচ্ছে অচিহ্নিত শুভ্রতার প্রগল্ভ অমিতব্যয়।

একবার মনে হলো বুঝি হঠাৎ, ফের যদি সুরু করতে পারতুম গোড়া থেকে। তা হ'লে হয়তো করতুম না কতগুলি ভুল, ছাড়তুম না কতগুলি সুযোগ, মরতুম না কতগুলি অকালমরণ। এই অভিজ্ঞতার আলো নিয়ে দেখতে পেতুম যদি অন্ধকার রাস্তার চৌমাথা। ভাগ্যিস পাইনি দেখতে। তাই ঠিক পথ ধ'রে চ'লে এসেছি 'নঞতিনির্ণীত হ'য়ে। পথতীর্থঙ্কর হ'য়ে। উচিতচারী হইনি হয়তো, হয়েছি একান্তচারী। কে দিয়েছে এই অভিজ্ঞতার আলো, পশ্চাত্তাপের দীপ্তি। সেদিনের সেই ক'টা তুচ্ছ ভুল, মূর্খ শৈথিল্য, বিমোহন অকালমৃত্যু। কী হবে আবার ফিরে গিয়ে। যা ঘ'টে গেছে তার চেয়ে যা ঘটতে পারে যা ঘটাতে পারি তাতে বেশি রোমাঞ্চ। এই অভিজ্ঞতার আলো থাকার দরুন পাবো না সেই অন্ধকারের মোহ, ভয়ের ভাবালুতা, থাকবে না সেই ভুলের গৌরব, অপভ্রষ্ট সুযোগের অতৃপ্তি, ঘটবে না সেই অঘটনঘটনা। ইদানীন্তনকে দিয়ে চিরন্তনকে হারাবো। যযাতির যৌবন ব্যর্থ হবে।

তার চেয়ে এই ভালো যা আছি বা হয়েছি। কিংবা যা হইনি, হবার সাধ্য ছিলো না। বারে-বারে শুভ্র আরম্ভের চেয়ে একটি একায়ন সমাপ্তিতে অনেক সম্পূর্ণতা। তখন ভাগ্যের কার্পণ্য দেখে মনে হতো, জীবন এর পরে আসবে; এখন আয়ুর কার্পণ্য দেখে মনে হয়, জীবনকে ফেলে এসেছি পিছনে। যা প্রার্থনার তা সম্ভাবনার নয়। তখন মনে হতো, এবার সুযোগ এলে মুষ্টিকে ভ্রষ্ট হ'তে দেব না; মুষ্টি দৃঢ় ক'রে দেখতে পাই লগ্ন কখন ভ্রষ্ট হ'য়ে গেছে। মফস্বলে থাকতে ভাবতুম, কলকলিত কোলকাতা, এখন কোলকাতায় এসে চাইছি নিবৃত্তিময় নিভৃতি। মনোমালা যাকে দিই সে মনোভবা নয়। অলকাতেও সে পলাতকা। তাই আগে যদি বা ছিলো অন্বেষণ, এখন না-হয় অন্বীক্ষণ। আগে যদি বা উজ্জ্বল দুঃসাহস, এখন ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ। অনেক কিছু বৈরাগ্য নিয়ে আমি হ'লেও অনেক কিছু বৈচিত্র্য নিয়েও আমি। ততগুলি আমি লোক, যতগুলি আমার বন্ধু; তত বড়ো আমার বাসা যত বড়ো আমার বৃত্ত। জীবন আমার এইখানে, এই বর্তমান বিন্দুতে, যখন যেখানে আমি থাকি, যাতেই আমি পরিবেষ্টিত ও প্রতিফলিত হই। বন্ধুর ঈর্ষায়, শত্রুর দীনতায়, প্রেমের পতনে, বিশ্বাসের অন্যথাচরণে। তখন যেটা ছিলো প্রাণের, এখন সেটা না-হয় স্নায়ুর। তখন যেটা ছিলো স্বাদের, এখন সেটা না-হয় ক্ষুধার। তবু এও তো

জীবন, আমারই জীবন। একই রক্তের লালিমা দিয়ে লালিত। তাই, তা ই সত্য যা অত্রত্য। সেদিন যদি বা ছিলো আগ্নেয় প্রতীক্ষা, এখন শুধু নিরুত্তেজ আশা।

সোজা কথা বুঝলুম, বয়েস বেড়েছে। বাড়ুক, ভয় করিনে। প্রত্যেক সূর্যাস্তে জীবনের একটি দিনের বর্ণাঢ্য তিরোধানই দেখি শুধু, সূর্যোদয়ে অনুরূপ বর্ণবিস্তার বা আয়ুবৃদ্ধির আভাস দেখি না। তা হোক, তবু এই বয়সের অভিজ্ঞতায়ই জীবনের মর্যাদাকে আরো বেশি মূল্যবান ক'রে তুলবো। এখন যতই বুঝতে পারছি জীবন অবসীদমান, আনন্দ ততই আরো ক্ষুরধার হ'তে উৎসুক। সুযোগ ক্রমেই কমে আসবে ব'লে নবতন অভিজ্ঞতার খোঁজে জীবন আবার ধাবমান। রোদ থাকতে-থাকতে শস্য কাটতে হবে, স্পৃহা থাকতে-থাকতে মেনে নিতে হবে ইহকালের ইয়ত্তা। লক্ষ্য আবার অলব্ধ থাকবে জানি, সুযোগ আবার হবে হস্তচ্যুত, তবু শরযোজনা করতে হবে জীবনের শরব্যের সন্ধানে।

তাই থাকতে দেয়া হবে না এই শূন্যশুভ্রতার ভার। চিহ্নিত করতে হবে জীবনের সমস্ত পৃষ্ঠা-পরিচ্ছেদ, প্রকাশ ও প্রকাশের উদ্যমে। যা কিছু অপ্রকাশিত, তাই মৃত অজন্মিত। অস্তিত্ব শুধু ব্যক্তরূপে। উন্মোচনে। স্তব্ধতার চেয়ে ব্যর্থতা অনেক ভালো, অনারম্ভের চেয়ে উদ্যোগের অসমাপ্তি। সুখে হোক দুঃখে হোক, রুদ্রে বা শ্যামলে, উত্থানে-পতনে, জীবনকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে, রূঢ় আর মূঢ়, রক্তাক্ত আর বিক্লিন্ন। তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলবে না, ফেলে রাখা হবে না তাকে অব্যবহারে, গ্যারাজে কিংবা ড্রয়িংরুমে। তাকে থাকতে দেওয়া হবে না অনাবিদ্ধ, অখণ্ডিত। সমস্ত জিনিসটাই অত্যন্ত সোজা, জীবনকে গ্রহণ করতে হবে, ফুল যেমন গ্রহণ করে আকাশের রৌদ্র, মূল যেমন গ্রহণ করে মাটির আর্দ্রতা। যা আসে তাই নিতে হবে অপ্রতিবাদে, অপ্রত্যাখ্যেয় ব'লে। দুর্জয় সাহসীর মতো। কষ্টকে অকষ্টকল্পনার মতো। বৈফল্যকে ঈপ্সিত ফললাভের মতো। জানলা দিয়ে রাস্তা দেখলে চলবে না, নেমে আসতে হবে রাস্তায়, জনগণের সমাজে, দুর্গম নির্গমে। আর, যা সম্যক্‌রূপে আজ, তাই সমাজ। জীবনকে দেখতে হবে তাই পৃষ্ঠদৃষ্টি দিয়ে নয়, পূর্ণদৃষ্টি দিয়ে, সামনা-সামনি।

আর তাকে প্রকাশ করতে হবে, কাব্যে কি কর্মে, কোনো ব্যক্তি অতিরিক্ত অভিব্যক্তিতে। শুধু টিঁকে থাকা দিয়ে জীবনের দাম নয়। ঘড়ি টিকটিক করছে

অহোরাত্র, কিন্তু ধরুন, তার কাঁটা নেই, কী হবে ঐ টিঁকে থাকায়? তাই কাঁটা চালিয়ে দেখাতে হবে প্রাণস্পন্দের ছন্দ। আমাদের পরিচয় শ্রমে নয়, বিশ্রামে। মানে, জীবিকার প্রয়োজনে বাধ্য হ'য়ে যে শ্রম করি তাতে নয়, কাজের শেষে কী ভাবে বিশ্রাম করি বা উদ্‌বৃত্ত সময় ব্যয় করি, তাতে। তা-ই শুধু অস্তিমান যা প্রকাশমান।

খাতার সাদা পৃষ্ঠা নিয়ে ভাবতে পারতুম যে এই নীরবতাই জীবনের চরম ঘোষণা, সর্বচেষ্টার অন্তিম পরিণতি। অনেক অক্ষমতার সাক্ষ্য থেকে সে নিজেকে রক্ষা করেছে। চিত্তের অপ্রকাশনীয়কে ধ'রে রেখেছে সে অচিহ্নমলিন নৈঃশব্দ্যে। যা বলা যায় না তাই গভীর ক'রে, সংক্ষেপ ক'রে বলেছে সে এই নির্বাক শুভ্রতায়। ভাবতে পারতুম বটে। কিন্তু দৃষ্টির কোণ গিয়েছে বদ্‌লে। বৈমুখ্য থেকে এখন দাঁড়িয়েছি এসে আভিমুখ্যে। রক্ষা করতে পারি না আর জীবনের ক্ষয়, অব্যবহারে আর অপচয়ে, অচেষ্টায় আর অপরাঙ্মুখতায়। ঐ সাদা কাগজ হচ্ছে বিরতির প্রতীক, অকৃতিত্বের রূপান্তর, পলায়নের পরোয়ানা। অকুতোভয় জীবনের অনুভবে সহ্য হবে না এই অকর্মকের অপধর্ম।

তাই সাদা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে এই প্রথম লিখলুম প্রবন্ধ।

শয়নবিলাস

ইন্দ্রজিৎ

আমি অত্যন্ত কুড়ে-মানুষ, সে কথা আমার বন্ধুমহলে সুবিদিত। বলা বাহুল্য আমার বন্ধুরাও অধিকাংশই কুড়ে মানুষ। কেননা তাঁরা সবাই যদি কর্মিৎকর্মা লোক হ'তেন তবে তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হতে পারতো না। আমাদের মজলিশে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা যে ভাবে আড্ডা দিয়ে থাকি, তা দেখলে যে কোন ব্যক্তি মনে করবেন, এদের খেয়ে দেয়ে আর কোনো কাজ নেই। এমন কি leisured class-এর লোক মনে ক'রে সর্বহারাদের patron-রা মনে মনে আমাদের গাল দিতে পারেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, আমাদের এহেন বন্ধুরাও বলেন আমার মতো কুড়ে মানুষ নাকি তাঁরা কখনও দেখেন নি। তাঁরা যখন আমাকে কুড়ের বাদশা ব'লে ডাকেন, তখন কিন্তু আমি রাগ করি না, এমন কি ওটাকে একটা অপবাদ ব'লেও মনে করি না।

কিছুদিন আগে একটি ছোটো প্রবন্ধে আমি কুড়েমির গুণকীর্তন করেছিলাম। তাতে বহু যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, কুড়েমির অভ্যাসটা দোষাবহ তো নয়ই বরং মানুষের একটি অতি মহৎ গুণ। জানি না আমার পাঠকরা সে সব যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন কি না। বাস্তবিক পক্ষে আমার মতে নিষ্কাম ব্যক্তি এবং নিষ্কর্মা ব্যক্তিতে কোনো তফাত নেই। উভয়েই উচ্চস্তরের জীব। বহু কামনা বাসনা ত্যাগ করলে তবেই মানুষ নিষ্কর্মা হ'তে পারে।

আপনারা অনেকেই হয়তো স্বীকার করতে চাইবেন না, কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি বাঙালীকে কুড়েমি জিনিসটাতে যেমন মানায় এমন আর কিছুতে নয়। Dying in harness ইংরেজের অতি গর্বের কথা। কিন্তু বাঙালী কখনো জোয়াল কাঁধে নিয়ে অমন undignified ভাবে মরতে রাজি নয়। জোয়ালটি কাঁধ থেকে নাবিয়ে বিছানায় শোবে, ধীরে ধীরে পিলের আকার বৃদ্ধি হবে, ডাক্তার বদ্যি আসবে, ওষুধ-পথ্যিতে ঘর ভরবে, তারপর ধীরে-সুস্থে রয়ে-সয়ে শান্তিতে মরবে এবং খাটিয়ায় চ'ড়ে শ্মশানে যাবে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান

ভানে—এই প্রবাদবাক্যের মধ্যেই বাঙালী, মানুষের আজীবন কর্মব্যস্ততার প্রতি যথাযোগ্য অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রে রেখেছে।

বাঙালীর সম্বন্ধে অপবাদ আছে যে, তারা বসতে জানলে উঠতে জানে না। আমি তারও বাড়া—আমি শুতে জানলে বসতে জানিনে। সত্যি বলতে কি, দিনের অধিকাংশ সময় আমি শুয়েই থাকি। তাকিয়া বালিস ঠেসান দিয়ে পূর্ণ কিংবা অর্ধশয়ান হতে না পারলে আমি ঠিক স্বস্তি পাইনে। আজকাল আমাদের আড্ডাস্থলে ফরাস এবং তাকিয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সভ্যরা এসেই একেকটি তাকিয়া আশ্রয় ক'রে শুয়ে পড়েন। নতুন কেউ প্রবেশ করলেই সমস্বরে অভ্যর্থনা করেন, এই যে আসুন, আসুন, শুয়ে পড়ুন। আমাদের এ রকম ব্যবস্থা দেখে এক ভদ্রলোক ঠাট্টা করে এর নাম দিয়েছেন—শয্যাশায়ী ক্লাব। আমি তার জবাবে বলেছি, তা ধরাশায়ী হওয়ার চাইতে শয্যাশায়ী হওয়া ভালো। দণ্ডায়মান থাকাটা যে একটা দণ্ড সে কথা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া দণ্ডায়মান ব্যক্তির পতন হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি শুয়ে আছে তার অধঃপতনের আশঙ্কা কম। যাই হোক, আমাদের শয্যাশায়ী বললে কিন্তু ঠিক বলা হয় না। বলা উচিত শয্যাশ্রয়ী, কিংবা সভ্যাগ্রহীর মতো আমাদের শয্যাগ্রহীও বলা যেতে পারে। কারণ শয্যার প্রতিই আমাদের আগ্রহ।

আমার কাজকর্ম যথাসম্ভব আমি শুয়ে শুয়েই সমাপন করি। টেবিলে চেয়ারে ব'সে পড়াশুনার কাজ আমার দ্বারা হয় না। লিখতে হ'লে বুকের তলায় একটা বালিশ দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়েই লিখি। সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসে আমাকে যদি দশটা পাঁচটা আপিসের কাজ করতে হতো তাহলে আমার দ্বারা একদিনও চাকুরি করা চলত না। আমাদের কংগ্রেসী নেতারা তবু কিঞ্চিৎ তাকিয়া-minded. স্বাধীন ভারতের শাসনবিধি চালু হ'লে যদি আপিসে আদালতে তাকিয়া-টাকিয়ার ব্যবস্থা হয় তবে অবশ্যই আমি চাকরির দরখাস্ত করবো। এ সম্পর্কে একটি কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। ভারত-সমস্যা যে আজ পর্যন্ত সমাধান হয় নি তার কারণ গান্ধী-জিন্না আলোচনা প্রতি বারেই জিন্না সাহবের গৃহে হয়েছে এবং চেয়ারে ব'সে নেতৃদ্বয় আলাপ আলোচনা করেচেন। আমার নিশ্চিত ধারণা এঁরা দুজনে যদি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় আলোচনা করতেন তাহলে সমাধান অনেক সহজ হয়ে যেতো। কারণ ব'সে দেখায় আর শুয়ে দেখায় angle of vision অনেকখানি বদলে যায়। চেয়ারে ব'সে চোখের সুমুখে আমরা যে terra firma দেখতে পাই সেটাকে

অবশ্যই হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু চিত হ'য়ে শুয়ে আমরা যে firmament দেখতে পাই সেখানে হিন্দুস্থান পাকিস্তান নেই। একই আকাশ উভয়ের মাথার উপর। বিধাতাপুরুষ হিন্দু মুসলমান সকলকে under the same roof বাস করবার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন।

যাকগে, তত্ত্বকথা রেখে দিয়ে সোজা কথাই বলি। আমি সারাক্ষণ শুয়ে থাকি বলে আপনারা মনে করবেন না যে আমি সারাক্ষণ পড়ে পড়ে ঘুমোই। রাতজাগার দিক থেকে আমি পৃথিবীর স্বনামখ্যাতদের দলে। নেতাজী রাত্রিতে মাত্র দু তিন ঘণ্টা ঘুমোতেন, হিটলার-চার্চিলেরও চোখে ঘুম ছিলো না—রাত্রি জেগে ক্যাবিনেট মিটিং করতেন। এসব খবর একাধিকবার খবরের কাগজে বেরিয়েছে। আমার ওসব বালাই নেই। আমি কাজের কথাও ভাবি না, ঘুমের কথাও না। আমার ঐ শুয়ে থাকাতেই আনন্দ। পাশের জানালাটি খোলা, তারই ভেতর দিয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখি। না হয়তো পাশ ফিরে চোখটি বুজে শুয়ে থাকি। চোখ বুজলেই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, চোখ মেলে সামান্যই দেখি। তা ছাড়া চলমান জগৎকে ভালো করে দেখতে হ'লে নিজেকে নিশ্চল হ'য়ে থাকতে হয়।

না ঘুমিয়ে মিছিমিছি শুয়ে থাকাটা অনেকে নিতান্ত বিরক্তিকর ব্যাপার মনে করেন। তাঁরা বলেন শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গোনা ছাড়া অন্য কাজ থাকে না। সেটাও একটা কাজ, কড়িকাঠ গুনতে গুনতে অনেক বড়ো বড়ো ভাবনা মাথায় এসে যায়। দুঃখের বিষয়—আজকাল আপনারা যে সব ঘরে বাস করেন তাতে কড়িকাঠ থাকে না। ফলে বাঙালীর চিন্তাশক্তি ক্রমে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। চেস্টারটন বড় মজার কথা বলেছেন—

Lying in bed would be an altogether perfect and supreme experience if only one had a coloured pencil long enough to draw on the ceiling.

চেস্টারটনের যা বিশাল বপু, তাতে তাঁর পক্ষে এপাশ ওপাশ করা কঠিন ছিলো। বোধকরি তিনি চিত হ'য়েই সাধারণতঃ শুয়ে থাকতেন, কাজেই তিনি সিলিংএ ছবি আঁকার কথা ভেবেছেন। যাঁরা আমার মতো পাশ ফিরে শোন (এই জন্যই বোধহয় আমার মতামত একটু একপেশে) তাঁরা স্বভাবতঃই চোখ বুজে মনশ্চক্ষে ছবি দেখেন।

শুয়ে থাকাকে যাঁরা বৃথা কালক্ষেপ মনে করেন আমি তাঁদের দলে

নই। আমার যে-জগতে বিচরণ শয্যা আশ্রয় না করলে সেখানে প্রবেশ নিষেধ। দিবাস্বপ্ন অবশ্য বসে-বসেও দেখা যায়, কিন্তু শুয়ে শুয়ে দেখা আরো বেশি আরামের। লোকে কথায় বলে গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না। আমি যে নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে থাকি তার ফলে আমার ভাগ্যে কিঞ্চিৎ শ্যাওলা জুটেছে। ঐ শ্যাওলাই আমার চিত্তভূমিকে সরস ক'রে রেখেছে। শুয়ে থাকার সেইটেই সবচেয়ে বড়ো লাভ। অতএব উপসংহারে আপনাদের সকলকে আমাদের ক্লাবের স্লোগানটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন, সবাই শুয়ে পড়ুন।

কানাই ও বলাই

অন্নদাশঙ্কর রায়

সাহিত্যিকদের মোটামুটি দু ভাগ করা যায়। একভাগে হিতকারী, অপরভাগে মনোহারী। এক দলের নাম দেওয়া যাক বলাই, আরেক দলের নাম কানাই।

কানাইদের বিরুদ্ধে বলাইদের নালিশ এ যুগের নয়। হলধরেরা বংশীধরদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে এই কথাই বলে আসছেন যে, ওরা কাজ করে না, খেলা করে। শেখায় না, ভোলায়। রোম যখন পোড়ে তখনো ওরা বাঁশি বাজায়। ওদের কাছে আগুন নেবানো তুচ্ছ, ফাগুন পোহানোই আসল।

বলরামের হলখানির ওজনটি তো কম নয়। ওখানি ঘাড়ে ক'রে বেড়ালে ঘাম যাবেই। কর্মের লক্ষণ হলো ঘর্ম। বলাইদের মতো কাজের লোক কানাইদের মতো বাজে লোকদের সহ্য করতে পারেন না। বাঁশির আর কতো ওজন। এ তো ছেলেখেলা।

কিন্তু রাগটা কানুর উপরে না ক'রে বেণুর উপরেই করা উচিত। ওজন হিসাবে হলের ওজন বেণুর চেয়ে বেশি। সুতরাং মূল্য হিসাবে হলের মূল্য বেণুর চেয়ে বেশি। অথচ বেণুর ধ্বনি যোজনভেদী হৃদয়ভেদী।

একদল লেখকের হাতে লেখনী যেন লাঙল। তাঁরা যে লাঙলের গুণগান করেন সেটা স্বাভাবিক। আরেক দলের হাতে সেই জিনিসই যেন বাঁশরি। তাঁরা যে তাই নিয়ে বিভোর থাকবেন এটাও স্বাভাবিক। লেখনী দেখতে একই রকম, সেইজন্যে সকলেই লেখক। কিন্তু লেখা যখন বেরোয় তখন দেখা যায় কোনোটা হলকর্ষণ, কোনোটা চিত্তাকর্ষণ। বলরামরা নিজেদের কীর্তি দেখে ফুর্তিবোধ করতে পারেন না, পরের ছিদ্র ধরেন। বাঁশির ছিদ্র আছে, তাই ছিদ্র ধরাও সোজা।

বলভদ্রদের বল চিরকাল বেশি। সে বল সমাজের বল। তারা বিশ্বাস করেন ও করাতে চান। সবার উপরে সমাজ সত্য, তাহার উপরে নাই। তাঁরা বলেন, সমাজের ভালোমন্দই সাহিত্যের ভালোমন্দ। সাহিত্যের নিজস্ব ভালোমন্দ নেই, সাহিত্য সমাজের সামিল।

বলাইরা তাঁদের মত নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকুন, কানাইদের তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কালের সঙ্গে বল-পরীক্ষায় হলধরদের হার হয়, তাতে তাঁদের মেজাজটা যায় বিগড়ে। সেইজন্যে তাঁরা বংশীধরদের বংশ ধ্বংস করতে পারলে ঠাণ্ডা হন। ওদের প্রধান অপরাধ ওরা পলাতক। ওরা খাটে না, খায়। ওরা ফরমাস মানে না, নিরঙ্কুশ। ওরা সমাজের সঙ্গে বেখাপ।

কিন্তু কালের সঙ্গে ওদের চমৎকার খাপ খায়। কালের স্রোত কালিন্দীর স্রোতের মতো উজান বেয়ে শ্রোতা হয় কানুদের বেণুর। অসামাজিক, তবু সমাজের সুপ্রিয়।

কুড়েমি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আত্মপ্রচারের অহমিকা থেকে নয়, অত্যন্ত অপরাধীর মতো সংকোচভরে আমি স্বীকার করছি আমি অত্যন্ত কুড়ে। আমার কুড়েমির খ্যাতি বন্ধু-বান্ধব থেকে সুরু করে বাইরের লোকের মধ্যেও কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়েছে। কেজো লোকেরা আমার নামে মুখ বিকৃত করে, বন্ধু-বান্ধবেরা হতাশার নিশ্বাস ফেলে, অনুরাগী যে দুচারজন আছে তারা বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে। যারা অভিজ্ঞ তারা আমার সঙ্গে কোনো দেখাশোনার সময় ঠিক করতে এদিকে ওদিকে ঘণ্টা দু-এক-এর উদ্‌বৃত্ত আগে থাকতে ধ'রে রাখে, আমায় কোনো বরাত দেওয়ার বেলা প্রথম থেকেই ব্যাপারটা বাতিল করবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে থাকে। সম্পাদকেরা আমার কাছে সময়মতো লেখা পায় না, বন্ধু-বান্ধবেরা পায় না চিঠির জবাব। সদিচ্ছার আমার অভাব নেই—চিঠি পেলেই তার জবাব আমি দেবার জন্য উৎসুক হই, কিন্তু লেখাটা বেশিরভাগ সময়ে মনে-মনেই হয়, কলমের মুখে কাগজ পর্যন্ত পৌঁছোয় না। সম্পাদকের তাগাদায় অনেক গল্প আমার কল্পনায় জন্ম নিয়ে সেইখানেই একদিন বিলীন হ'য়ে গিয়েছে, কম্পোজিটররা তার পাঠোদ্ধার ক'রে ছাপার হরফে সাজাবার দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেয়েছে।

আমার এই কুড়েমি নিয়ে আমার মনে কোনো গ্লানি নেই এমন নয়। কুড়েমির দোষ যে কত আমি মর্মে মর্মে বুঝি। দরকারী কাগজপত্র যথাসময়ে যথাস্থানে রাখবার আলস্যের দরুন ঘণ্টা দুই খুঁজে হয়রান ও হতাশ হ'য়ে মেজাজ আমার অহরহঃ বিগড়ে যায়,—ধার না ক'রেও শুধু লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি না রাখতে পেরে কাগজওয়ালাদের তাগিদে, পাওনাদারদের ভয়ে খাতকের মতো আমায় চোর হ'য়ে থাকতে হয়। সকালবেলা বেশ নিশ্চিন্ত মনে অর্ধশায়িত অবস্থায় এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতায় পাতায় যথেচ্ছ বিহার করতে করতে (পাণ্ডিত্য অর্জনের উৎসাহে নয়, নেহাত অবসাদ বিনোদনের খাতিরে) চড়ুইপাখিদের পারিবারিক কলহ উপভোগ করছি, এমন সময়

বাইরে থেকে কার ডাক শোনা যায়। তৎক্ষণাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। মনে পড়ে এই সাদা মেঘের পাল তুলে ভেসে-যাওয়া সুনীল দিনটার বিদঘুটে ব্যবহারিক নাম হলো বৃহস্পতিবার এবং এই দিনে সকাল ন-টার সময় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুনীল ধরের কাছে লেখা দেবার জন্যে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। ডাকটা শুনে বেমালুম বিলুপ্ত হ'য়ে যাবার বাসনা একটা ক্ষণিক প্রবল হয়, ইচ্ছা হয় কাউকে দিয়ে বাড়ি নেই ব'লে খবর পাঠাই। কিন্তু বন্ধুবর সুনীর ধরের হাত থেকে অত সহজে রেহাই পাওয়া যায় না। একেবারে বাড়ির ভেতর তিনি চড়াও হ'য়ে এসে পাকড়াও করেন। সুতরাং সত্য মিথ্যা বাস্তব ও কল্পনায় মেশানো নানা কাহিনী তৈরি ক'রে লেখাটা যথাসময়ে না লিখতে উঠতে পারার কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করি। সম্পাদক ধৈর্য ধ'রে সব কথাই শোনেন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে বোঝা যায় আমার কোনো কথাই তিনি বিশ্বাস করেন না। কারণ তিনি আমায় আজ পনেরো বছর ধ'রে চেনেন। লেখবার মেয়াদ আর কয়দিন বাড়িয়ে দিয়ে আবার বিশেষ একটা তারিখ আমার ক্যালেণ্ডারে দাগ দিয়ে রেখে তিনি গম্ভীরমুখে আসামীর বিচার মুলতুবি রাখা বিচারকের মতো বিদায় নেন। ধরা-পড়া অপরাধীর মতো অপ্রস্তুত হয়ে বিরস মুখে আমি ব'সে থাকি।

না, কুড়েমির দুঃখ ও শাস্তি যে অনেক সে কথা অস্বীকার করবার সাধ্য আমার নেই। তবু কুড়েমি ত্যাগ করা আমার দ্বারা হ'য়ে উঠবে না, কারণ ত্যাগ করতে আমি চাইও না। আমার নিজের কুড়েমি হয়তো মাত্রাছাড়া কিন্তু তা বলে কুড়েমির ওকালতি করবারও যথেষ্ট আছে। কুড়েমিই যদি না করলাম তাহলে মানুষ হবার দুর্লভ গৌরব কিসে? কাজ তো সবাই করে—সূর্য, চন্দ্র, তারা, জড় থেকে চেতন সমস্ত সৃষ্টি কাজের অমোঘ শৃঙ্খলে বাঁধা। কুড়েমি করবার ঐশ্বরিক অধিকার একমাত্র মানুষের। তার মনুষ্যত্বের চরম প্রকাশ এই কুড়েমি করবার স্বাধীনতায়।

অন্য প্রাণী বিশ্রাম করে মাত্র, মানুষই শুধু ইচ্ছে করলে কাজে ফাঁকি দিয়ে কুড়েমি করতে পারে। ঘরে ব'সে যখন তার সারাদিনের হিসেব লেখা দরকার, ছাদে শুয়ে তখন তারা গুনতে পারে, ওপারের হাটে যখন বেচাকেনা করতে না গেলে নয়, তখন আনমনে নদীর স্রোতে ভেসে যেতে পারে চেনা ঘাট ছাড়িয়ে নিরুদ্দেশে।

কাজের গণ্ডি-দেওয়া জীবন থেকে কুড়েমির অলস স্রোতে ভেসেই মানুষ

একদিন শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের রহস্যলোকের সন্ধান পেয়েছে, মাটি থেকে অকারণে ওপরে চোখ তুলে দেখতে পেয়েছে আকাশ।

কাজের টানাপোড়েনে জীবন যত থাপি ক'রেই বোনা হোক না কেন, কাজে কুড়েমির ফাঁক না রাখলে, বেঁচে থাকার আসল মানেটাই যায় হারিয়ে। সভ্যতার সুরু থেকে কাজের সুসার আর সময় সংক্ষেপ করবার আপ্রাণ চেষ্টা তো ক'রে আসছি। সভ্যতাটা আসলে সেই সাধনারই ইতিহাস, দুহাতে দশ-হাতের কাজ সারবার আগ্রহে এখন আমরা এক আঙুলের টিপুনিতে দশ, বিশ, লক্ষ তুরঙ্গ-বিক্রম ইচ্ছামতো পরিচালনা করার ক্ষমতা লাভ করেছি, দু বছরের পথ দু দিনের জায়গায় দু দণ্ডে পার হ'য়ে যাচ্ছি। কিন্তু এত সুসার এত সংক্ষেপ সে কি শুধু আরো কাজ বাড়াবার জন্য। শুধু কাজ আর কাজ, জীবনে কি তার বাইরে আর কিছু নেই। কাজ করবার নেশায় কাজের উদ্দেশ্যই যাবো ছাড়িয়ে? এঞ্জিন চালাবার উৎসাহে স্টেশনের কথা আর খেয়াল থাকবে না?

দুনিয়ার মানুষকে কাজের ভূতে আজ এমন পেয়ে বসেছে যে, কাজ না থাকলে অকাজের খই ভাজতেও তার আপত্তি নেই। দরকারের বেশি কাজের নেশাতেই এত মারামারি, কাটাকাটি, আখছা-আখছি। এর চেয়ে পৃথিবীর মানুষ যদি আর একটু বেশি কুড়ে হতো, নির্বিরোধ কুড়েমির উদার দীক্ষা যদি তারা পেতো তাহলে দুনিয়ার অনেক সমস্যার সমাধানের ভাবনা থাকতো না, কারণ সমস্যা সৃষ্টির সুযোগই থাকতো অল্প।

কুড়ে হলে আজকের দিনের ব্যস্তবাগীশ জাতগুলো কাজের ধান্দায় পথে বিপথে ছুটোছুটি ধাক্কাধাক্কি না ক'রে হয়তো দু দণ্ড নিজেদের চৌকাঠে বসে পাড়াপড়শির সঙ্গে আলাপ করতো—চিনতো, বুঝতো, ভালবাসতো পরস্পরকে। কুড়ে লোক ফাঁকা মাঠ দেখলে দাঁড়ায়, খানিক বাদে শুয়ে পড়ে, কিন্তু কাজের লোক মাঠ দেখলে আগেই যায় মাপতে, তারপর দখল করবার জন্যে লাঠালাঠি বা মামলা না বাধিয়ে তার সোয়াস্তি নেই। ফাঁকা মাঠ দেখে শুয়ে পড়বার লোক যদি পৃথিবীতে বেশি থাকতো, তাহলে মাঠ খুঁড়ে পরিখা কাটার প্রয়োজন অন্ততঃ হতো না।

কাজ নিয়ে এই খেপামি রোগের বীজ ঠাণ্ডা দেশগুলো থেকেই আমদানী। আমাদের গরম হাওয়ায় ও-রোগ আপনা থেকে গজায় না, আমদানী হ'লেও তেমন চেপে ধ'রে ছড়াতে পারে না। ঠাণ্ডা দেশে অভাগা মানুষকে রক্ত গরম রাখবার তাগিদেই লাফালাফি দাপাদাপিটা বেশি করতে হয়। তাদের নকল

ক'রে সাধ ক'রে ও-রোগের বীজ রক্তে ঢুকিয়ে খেপে ওঠার মতো আহাম্মক আমরা হ'তে যাই কেন? ঠাণ্ডা দেশেরও এখন এ রোগ সারাবার সময় হয়েছে, কাজের নেশা অকাজের সর্বনাশে পৌঁছোতে নইলে আর দেরি হবে না।

সভ্য হওয়া অবধি কাজ তো অনেক করলাম, এবার মানুষ জাতটার একটু কুঁড়েমি করবার ফুরসত কি হয়নি—ফাঁকা মাঠে গিয়ে একটু বসবার, দিগন্তের একটি তারা কি ঘাসের ডগার শিশিরকণাটিকে দেখবার? কুঁড়েমি মানে তো মনের শূন্যতা নয়, অসীম রহস্যে ডগমগ মনের নিথর নিটোল পূর্ণতা।

বই কেনা

সৈয়দ মুজতবা আলী

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময় উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দুটো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায় আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এক সঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাত। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমতঃ—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল্ বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর

আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশী ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, ভবযন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে ?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মতো সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,—

Here with a loaf of bread
beneath the bough,
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশতের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'অল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই *par excellence*, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—*The Book*.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শুনে না। তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব ?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেটুকু

এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস। এর বেশী আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশী বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে-কোন ভালো বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?'

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝট্‌কায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশী ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। সে এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মতো অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মতো এক গাদা নূতন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মতো, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একাধারে producer এবং consumer—তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগরেট বানিয়ে producer এবং

সেইটে খেয়ে নিজেই consumer : আরও বুঝিয়ে বলতে হবে ? আমি এক-খানা বই produce করেছি।—কেউ কেনে না বলে আমিই consumer, অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মতো ছিল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমনকি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে ; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন ?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলেছো ঠিক্ই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে, আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরত না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না, সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত। তার কারণটা কি ?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবীটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর ? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হ'ল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে পশ্য, পশ্য, জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না।—বই পড়তে পারে না।'

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ.ই.ডি. দিয়ে, 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।'

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ

ব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভালো বই দিলে হয় না ?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জৎ করতে চায়, তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশ গুনে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদে র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদ-এর পিছনে—গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদ-এর প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, জিদ-এর লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ ক'রে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদ-এর হয়ে লড়লেন না। জিদ-এর জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল, জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরামাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে সব লেখক জিদ-এর হয়ে লর্ড়েননি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের

মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন-ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা-কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকি বিক্রি হয়েছিল।)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেন নি।

আর কত গল্প বলবো? বাঙালীর কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোন দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখিনি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালীর পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে?

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হলো। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরী ছিলেন ব'লে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

কোনো কাজ নেই

প্রবোধকুমার সান্যাল

পলায়ন আমার এক বন্ধুর বই-এর নাম।

চারিটি বিভিন্ন অক্ষর, কিন্তু একত্র সম্মিলিত হ'য়ে ওর যে বিশ্বব্যাপী অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে, হৃদয়কে ছোটো ক'রলে তাকে অনুভব করা কঠিন। পলাতক হ'লে ব্যক্তির সংজ্ঞা আসতে পারতো, কিন্তু তা হয়নি—পলায়ন হলো বিস্তৃত জীবনের পটভূমি; সব কাজের শেষে পলায়ন, সকল পরিণামের সর্বশেষ ব্যাখ্যা হলো পলায়ন। পলায়নের পাশেই আছে নির্লেপ, সেই কারণে পলায়ন স্বাস্থ্যকর—সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে অস্বীকার ক'রে পালানো। দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়ানো, সত্যের চেহারাকে নির্ভুল বিশ্লেষণ করা। যে জীবন দাঁড়িয়ে উঠেছে সংশয় আর নৈরাশ্যে, যার ভিত্তিতে দুঃখবাদ, যার পরিচালনায় দুর্ভোগ,—সেই জীবনকে নির্দয় নির্লিপ্ততায় বিচার ক'রে চলা, —তাকেই পলায়ন বলতে পারি। বইখানা খুলে দেখি ওর মধ্যে আর যাই থাক, ঘর ছেড়ে পালানো কিংবা কলেজ ভেঙে পালানো নেই। দেখে খুশি হলুম।

পালাবার সাধ কারো কম নয়। কেরানীর বউ যেমন সব কাজের শেষে পালায় ছাদে, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীও পালান উইক-এণ্ডে। যে সব স্বামীজিরা আমাদের কর্মজীবন সম্বন্ধে উপদেশ দেন তাঁরা এক একটি উঁচুদরের পলাতক। কারণ, ভগবানকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়া একটা পলায়ন। এর কারণ অস্পষ্ট নয়। আমার চারিদিকে যা আছে তাই নিয়ে আমি খুশি নই, সুখী নই। এদের ফাঁস কাটিয়ে আরো কিছুর জন্যে আমি বেরিয়ে পড়ি। নরওয়ের সাহিত্যে একটা গল্প আছে,—নায়ক বহুধা বিভক্ত হ'তে চাইছে। একই মানুষ বহুরূপে প্রকাশ করছে নিজেকে। কখনো ভবঘুরে, কখনো ভিনদেশী, কখনো দর্জি, কখনো ছদ্মবেশী সমাজসেবক। তার সুখ নেই, স্বস্তি নেই। যেটা গ্রহণীয় সেটাতেই তার বিরক্তি। অর্থাৎ হাতে যা আসছে, তাই সে নেড়ে-চেড়ে ফেলে দেয়। আবদার ধ'রে বসে, এটা নেবো না, ওটা নেবো। কত খেলনা আছে

সংসারে কিন্তু তার মন ভোলানো গেল না। সে একটার থেকে আর একটায় টপকে যেতে চায়, পালাতে চায় জানা থেকে অজানায়। পলায়ন তার মজ্জাগত। সে এক, কিন্তু সে বহু।

আমি তো দেখি বিপুল পলায়নের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি কেবল স্থির, ধ্রুব। পৃথিবী বারে বারে পালাচ্ছে সূর্যকে ছেড়ে, চন্দ্র বারে বারে পালায় পৃথিবীকে ছেড়ে। জল পালিয়ে যায় মেঘলোকে, মানুষ পালায় দেহ অতিক্রম ক'রে। আর পশুপক্ষী? ওরা তো চিরন্তন ছুটছে,—কোথাও থেমে নেই। বীজের ভিতর প্রাণকোষ অস্থির, গর্ভের ভিতরকার শিশু মুক্তি পাওয়ার জন্য ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল। চোখ চেয়ে দেখি বিশ্বপ্রকৃতির চোখে পলক পড়ে না, পর্দা উলটিয়ে দেখি, পালাবার জন্য তার অস্থির ব্যস্ততা। পাহাড়কে দেখছি—স্থাণু চিরকাল, কিন্তু দুরন্ত প্রাণধারায় সে উদ্দাম।

প্রাণ এবং পলায়ন—এই দুইয়ের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। আশ্বিনের নতুন চক্‌চকে আকাশ বেতারযোগে প্রাণকে খবর পাঠালো, পালাও। অমনি কনশেসন টিকিটে ছুটলো চাকুরের দল, ছুটলো ট্রেন, ছুটলো মন। গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, আগ্রা, দিল্লী। শৃঙ্খল ছিঁড়ে পাখির দল পালালো অজানায়। শরীর সারাতে নয়, মন সারাতে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চললো একটা থেকে আর একটায়; যেখানেই যায় সেখান থেকেই পালায়। অবিরাম, অশ্রান্ত ঔৎসুক্য। এর নাম পলায়ন।

ঠিক মনে নেই, বোধহয় হর্দৈ স্টেশন। পৌষের গভীর রাত। ওয়েটিং রুমে ঘুমোচ্ছিলাম। যুক্তপ্রদেশের উত্তর ভাগের শীতে আড়ষ্ট শরীর। একখানা ট্রেন এসে থামতেই সহসা নারীকণ্ঠের কান্নার শব্দ এলো। প্লাটফরমে বেরিয়ে এলাম। রাত্রির জনবিরল স্টেশন। দেখি, তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় একটি বর্ষীয়সী স্থূলকায়া স্ত্রীলোক ওলটপালট খেয়ে গগনবিদারী চীৎকার তুলেছে, আর একটি স্ত্রীলোক নীরবে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। দুজনেই দক্ষিণী, হরিদ্বারের ফেরত। খবর নিয়ে জানা গেল, আগের কোন এক স্টেশনে তার ছেলেটি গাড়ি থেকে নেমেছিলো কৌতূহলে, কিন্তু আর ওঠেনি। বিস্ময়ের কথা এই, যে চীৎকার করছে, ছেলেটি তার সন্তান নয়; যে সান্ত্বনা দিচ্ছে সেই স্ত্রীলোকটিই পলাতকের জননী। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ছেলেটি গেল কোথায়? সে নেমেছিলো গাড়ি ছেড়ে, আর ওঠেনি। অজানা দেশের অন্ধকারে কোন ঔৎসুক্য তাকে আকর্ষণ করেছে? শীত গ্রাহ্য করেনি, শৃঙ্খল মানেনি, ট্রেনের নিয়মতন্ত্রকে সে

অস্বীকার করেছে—তার মন ছুটে গেছে পলায়নে। পলায়ন শব্দটা পুরুষের রক্তপ্রবাহে ভেসে বেড়ায়।

অসামাজিক মনোবৃত্তি তোমার আমার ওদের তাদের সকলের মজ্জাগত। অনেক কাল লোকসমাজে বাস ক'রে ক'রে তুমি ক্লান্ত, তুমি চাইলে স্বস্তি, তুমি চাইলে তোমার সর্বাঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে কিছুকালের মুক্তি নিয়ে পালাতে। তুমি গেলে কোনো নির্জন পাহাড়ে অধিত্যকায়, কোনো খরবাহিনী নির্ঝরিণী তীরে, আমি গেলুম বেণুবনচ্ছায়াময় নিভৃত পল্লীর ধারে। মজ্জাগত অসামাজিক আমাদের মন। লোকনিন্দার শাসনে আর লোকচক্ষুর লজ্জায় আমরা নিয়ম-শৃঙ্খলাকে মানি, কিন্তু সুযোগ পেলেই প্রকাশ করি সেই আদিম স্বাধীন বৃত্তিকে।

কিন্তু পলায়ন কাকে বলবো?

কলেজ পালিয়ে ছাত্ররা যায় বনভোজনে, কেরানী অপিস পালায়, তরুণী ঘর ছেড়ে পালায় যুবকের কোঁচার খুঁট ধ'রে। রাষ্ট্রবিপ্লবে জনসাধারণ পালায় রাজধানী ছেড়ে, দরিদ্র আত্মহত্যা ক'রে দারিদ্র্য থেকে পালায়, কয়েদী পালায় জেল থেকে, বাপের শাসন থেকে ছেলে পালায়, স্ত্রীর উৎপীড়ন থেকে মুক্তি নিয়ে পালায় নির্বোধ স্বামী। কিন্তু পলায়ন কোন্‌টা?

মুসৌরি পাহাড় পেরিয়ে কেম্‌টি জলপ্রপাতের পথে নিজের মনে চলেছি। হেমন্তকালের মধ্যাহ্নরৌদ্রে আকাশ আর মেঘ ঝলমল করছে। দূরে 'ক্যামেল্‌স ব্যাক্' ধারে ধারে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। উত্তর দিকে দিগন্ত-সীমানার সীমানায় চিরতুষার-শুভ্র হিমালয়-কিরীট। এদিকে ম্যালের পথ কেম্‌টির বাঁকে এসে নীচের দিকে নামতে লাগলো।

অন্তর্নিহিত মুক্তির আর স্বাধীনতার পিপাসা না থাকলে ভ্রমণ সিদ্ধ নয়; নিজের দুই পায়ে চলার পথটুকু অতি সংকীর্ণ সবাই জানে, কিন্তু আমার সেই পদচিহ্ন পৃথিবীর সকল পথের সঙ্গে কুটুম্বিতা না করলে পর্যটন সার্থক নয়। তাই ভ্রমণের অপর নাম দিলুম পলায়ন। যা কোনোকালে জানতে পারিনি, আমার বোধের মধ্যে তার চেতনা নেই, চিরকাল ধ'রে দুর্জ্ঞেয় আর—তার পিছু পিছু ছুটে চলাকে কি বলবো? ঈশ্বরকে খুঁজতে যারা পথে বিপথে বেরিয়ে পড়ে, যে সিদ্ধার্থ পালায় নিদ্রিতা প্রিয়তমার শয্যা ছেড়ে অন্ধকার রাতে জনজীবনের কল্যাণে যে-টলস্টয় পথে বেরিয়ে পড়ে সর্বস্বান্ত হবার আনন্দে, যে-দুঃসাহসী অভিযান করে দক্ষিণ মেরুপথে, শ্রাবণের দুর্যোগে যে চিররাধিকা

চিরঘনশ্যামের উদ্দেশে অভিসার যাত্রা করে, তাকে কি বলবো ?

অসন্তোষ আর জিজ্ঞাসা, পলায়নের মূলমন্ত্র। অল্পে সুখ নেই, বহু বিদ্যায় তৃপ্তি নেই—এমন মানুষ যখন বেরিয়ে পড়ে বড়ো কিছুর জন্যে, মহৎ কিছুর আশায়, তখন বুঝতে পারি মানুষের মানে। অসাধারণ তার প্রতিভা যে পালাতে জানে ; অসামান্য তার শক্তি, যে হারাতে জানে।

মসৌরী পেরিয়ে কেমটির পথে যেতে যেতে এই কথাই ভাবছিলুম।

স্বাক্ষর-শিকার

শিবরাম চক্রবর্তী

বাসায় ফিরে একটি খাতা টেবিলের ওপরে পেলাম। কে নাকি আমার জন্যে রেখে গেছেন! কে তিনি আবিষ্কার করা খুব কঠিন হলো না—খাতার প্রথম পাতাতেই লেখা : "তীর্থরেণু : সংগ্রাহক, **Aditya Kumar Mukherjee alias Badal**" এবং তারপরে, দক্ষিণ বাঁটরার একটা ঠিকানা।

এই 'ওরফে বাদলকে' আমি চিনিনে, কিন্তু না চিনলেও, ছেলেপিলেদের কেউ যে, তা বোঝা খুব কঠিন নয়। কেননা, খাতাখানি অটোগ্রাফের।

বেশ মোটা-সোটা এক্সারসাইজের খাতা। গোড়ার দিকের এক সার, সই আর টিপ্পনীতে টইটম্বুর দেখা গেল—কিন্তু বেশিরভাগ পাতাই সাদা। আঁচড় পড়েনি এখনো। এই বাজারে এতগুলি সাদা পাতা একত্র দেখলে লোভ হয়।

আমার উদ্দেশ্যে কেন যে এটিকে রেখে যাওয়া হয়েছে বুঝলাম না ঠিক। খাতার মালিক নিশ্চয়ই এটা আমাকে উৎসর্গ ক'রে যাননি। আকস্মিক বৈরাগ্যে, বইয়ের প্রতি রাগে, যদিবা সেই-দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, দয়া ক'রে দাতব্য ক'রে গিয়ে থাকেন আমায়, তাহলে এর সাদা পাতাগুলোয় চমৎকার চিঠি লেখা চলবে, আর—, আর লেখাগুলোর পাতায় বেশ দাড়ি কামানো যায়। অনেকে স্বাক্ষরের উপরে বেশ বড়ো বড়ো কথা লিখেছেন দেখলাম। বড়ো বড়ো কথা আর ভালো ভালো কথা। বড়ো ভালোকথা। এই সব উদাত্ত বাণী চোখের সামনে রেখে, যুদ্ধঘটিত এই দুঃসময়ে দাড়ি কামাতে বসলে ভোঁতা ব্লেডেও অনেকখানি প্রেরণা পাওয়া যাবে আমি আশা করি।

সংগ্রাহকের প্রথম সংগ্রহই শ্রীগীতা থেকে :

"কর্মই জীবন, কর্মই পুরস্কার, নিষ্কর্মা জীবন মৃত্যুর নামান্তর মাত্র—"

(গীতা)।

এবং সংগ্রহ হচ্ছে কর্মের প্রকারান্তর। এবং কিছুটা গ্রহও বই কি! গ্রহণকর্ম আর কর্মভোগ একাধারে।

অন্যান্য বাক্যও, কারু চেয়ে কেউ বড়ো কম যায় না। যথা : সজনীকান্ত

দাস লিখেছেন—

"প্রশস্ত ললাটে মোর নিজ হস্তে রচি জয়টীকা,
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাহত তরণীর আমি কর্ণধার ;
অধোমুখী কভু নহে তিমিরে প্রদীপ্ত দীপশিখা,
নিজেরে যে করে নতি সে লভে সবার নমস্কার।"

এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় :

"সৃষ্টি হ'তে এত হিংসা এত দ্বন্দ্ব এত হানাহানি
মানুষ করেনি ধ্বংস—মানুষের জয় হবে জানি।"

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা :

"এত ঝড় জল মেঘ যায়,
আকাশ কি কিছু মনে রাখে ?"

এবং ঠিক তার তলাতেই আনুষঙ্গিক আরেকজন কার কথামৃত :

"আমাদের এঁদো রাস্তায়
শুধু হায় কাদা জমে থাকে।'

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেছেন :

"দুঃখ-দৈন্য-অপমান ও ব্যাধি-বিচ্ছেদ-মৃত্যুর করাল কবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারিয়াছে—'ভগবান আছেন, তোমার ভয় নাই।'— আজ আমি শুধু নিজেকে সেই মানুষের অন্তর্গত জানিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি।"

তাঁর বাড়ির কাছের মাঠটা অচিরে আ-কার বদ্‌লে মঠে রূপান্তরিত হবে আশা করা যায়। আগামী সেই অভূতপূর্ব গোচারণের স্থলে তখন যদি আমাদের মতো অভাজনদের জন্যে নিয়মিত মালপোর ব্যবস্থা থাকে তাঁর গৌরবে আমরাও গৌরব অনুভব করতে পারবো। কিন্তু আমাদের পরিমল গোস্বামী মশাই এসব ব্যক্তিগত তত্ত্বের কুজ্ঝটিকাভেদ ক'রে একবারে সর্বজনিক সমস্যায় নেমে এসেছেন ! তিনিও ভগবানকে টেনেছেন, কিন্তু তাঁর টানাটানিটা অন্যরকমের। তাঁর বক্তব্য :

"নিম্নলিখিত ব্যাপারে ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করি—

চাউল এক মন ৪০৲ কাপড় ধুতি ১ জোড়া ১০৲
চিনি—পাওয়া গেল না। ময়দা—পাওয়া গেল না।
আটা দুসের—তেরো আনা......পথে ক্ষুধার্ত নর-নারীর ভিড়।"

চাউলের চল্লিশ টাকা মনে ভগবানের সব আগে মনোযোগ দেয়া দরকার ব'লে আমার মনে হলো—অবশ্য, ভগবানের মন ব'লে যদি কোনো বালাই থাকে। তবে তাঁর রাজ্যে উল্লিখিত ওরকম দামী ধুতির জোড়া মেলে না একথা আমি মানবো না, সম্প্রতি তেরো টাকায় একখানা আমাকেই কিনতে হয়েছে। চিনি, আমার বরাতে, পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চেনা যায় না। তবে তেরো আনায় দু'সের আটা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে, পরিমলবাবুপ্রসাদাৎ জানতে পেলে, পথের ক্ষুধার্ত নরনারীর ভিড় একযোগে (ভিড়ে আরো ১ যোগ করে) আমিও বাড়াতে প্রস্তুত ছিলাম।

শিল্পী শৈল চক্রবর্তী কিছু লেখেননি, হাতিমার্কা এক ছবি এঁকে ছেড়ে দিয়েছেন। ছবির দ্বারাই এক হাত নিয়েছেন। হাতিটা সই করতে পারার আনন্দে চার পা তুলে নাচছে, না, তার ভয়ে চোঁ চোঁ পালাচ্ছে, নাকি, অটোগ্রাফের খাতায় নিজের কেরামতি দেখিয়ে দেবার জন্যেই শুঁড় বাড়িয়েছে —বোঝা দায়।

ভাবলাম, এতগুলি স্বর্ণাক্ষরের পাশে, আর শ্রীশৈলর এই বিচিত্রণের এক কোণে, অলংকৃত সোনার যেমন বানি লাগে, তেমনি আমারও একটুখানি কোনোখানে লাগিয়ে রাখি। কিন্তু আমার বাণী, শোনার অনুপযুক্ত হয়তো না হ'লেও, চেপে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বোধ করলাম। ভূতের বোঝা আরো বাড়িয়ে কী লাভ?

সত্যি বলতে, ছেলেদের স্বাক্ষর কুড়ানোর আমি বিরুদ্ধে। ছেলেরা Hero-worshipper হবে এটা আমি চাইনে। আমাদের দেশে হিরোওয়ারশিপিং-এর কোথায় যেন গলদ আছে—মনোভাবের থেকে এখানে নতুন হিরোর সৃষ্টি হয় না; Zeroদের সংখ্যাই বেড়ে যায় কেবল। তাছাড়া, হিরোই বা কে? ছেলেদের কাছে হিরো কে আবার? বৃহৎ বটের অপেক্ষা বটের চারা তো ছোটো নয়—বিরাট বটেরই সগোত্র সে—সময়ের আপেক্ষিকতায় উভয়েই সমান। নিজের ভাবনার সহযোগে আর সম্ভাবনার যোগে—প্রত্যেক ছেলেই —অতীতের এবং বর্তমানের সকল বৃহৎ আর মহতের সমকক্ষ। নিজের কক্ষচ্যুত হ'য়ে, কক্ষে কক্ষে ঘুরে, অপরের স্বাক্ষর কুড়ানোর এ দুর্দশা কেন তার?

তবু স্বাক্ষর যদি আত্মসাৎ করতেই হয়, মেয়েরা করবে। মেয়েদেরই এই কাজ। সত্যি নয় একথা মনে মনে জানলেও, কোনো মেয়ের কাছে আমি যে হিরো, একথা ভাবতে ভালো লাগে। তাছাড়া, কবিদের কত ভালো ভালো

বচন, কত না প্রবচন রয়েছে—মেয়েলি অটোগ্রাফের খাতায় পুনরুদ্ধার করবার মতো। যেমন, এই ধরুন না,—

"সমাজ সংসার মিছে সব—
মিছে এ জীবনের কলরব......"

কী ইঙ্গিতপূর্ণ এই দুই পঙ্‌ক্তি! তেমন তেমন খাতা পেলে তক্ষুনি-তক্ষুনিই উৎরে দেয়া যায়। অক্লেশেই! কিন্তু এ কি কোনো ছেলের অটোগ্রাফের খাতায় উপস্থিত করা চলে?

কিংবা মনে করুন, 'আমারে যে ডাক দিবে এ জীবনে তারে বারংবার ফিরেছি ডাকিয়া' ইত্যাদি! এই সব মর্মভেদী হাঁকডাক কি যেখানে সেখানে ছাড়বার মতো? ছড়াবার মতোন?

বড়ো জোর কোনো ছেলের খাতায় এই 'অচিন্ত্যনায়' বাক্য তুলে দেওয়া যায়:

"কল্পনার শেষ চূড়া স্পর্শ করা যায়
আছে কি তেমন স্পর্ধা তব কল্পনায়?
কল্পনার যেই শৃঙ্গে বাঁধো তুমি ঘর,
তারো ঊর্ধ্বে আছে জেনো উত্তুঙ্গ শিখর।"

বড়ো জোর এই। ছেলেপিলেদের ধরেবেঁধে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অসীমে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসো। ব্যস্! তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যের চূড়ান্ত করা হলো, এছাড়া আর কী করবার আছে?

কিন্তু মেয়েদের বেলায় ছাড়পত্র অত সহজ নয়—উভয় পক্ষেই। কোন্ কবি একথা লিখেছিলেন?—

"পা-দুখানি কাছে আনো মনোহারিকে,
চুম্বনে দেব তাতে কবিতা লিখে।"

যিনিই লিখুন এমন কথা খুশি হয়ে আমি লিখতে পারতুম। ভেবে ভেবে দেখলে, সেই অটোগ্রাফের খাতাও যেমন সুন্দর, আর এরূপ সই করবার কায়দাটিও কেমন চমৎকার! দুইই নিখুঁত।

অতএব নিখুঁতভাবে ভেবে দেখলে, কেবল মেয়েরাই স্বাক্ষর-শিকার করবে। অকুতোভয়েই তারা করতে পারে—তাদের Zero-য় দাঁড়াবার সম্ভাবনা অতি বিরল, হিরোদের ওয়ারশিপার হওয়া তাদের ধাতে নেই—উক্ত হিরোদের নিজের ওয়ারশিপাররূপে না পেলে অন্তত:। তাদের বেলা এটা

যেমন স্বাক্ষর-শিকার, তেমনি স্বাক্ষরকারীকেও শিকার। দেবতার লীলাও বলতে পারেন, দেবীর ছলনাও বলা যায়।

কিন্তু মেয়েদের বেলায় যেটা কেবল লীলা, নিছক Sport—ছেলেদের বেলা সেই কর্মই মৃত্যুদায়ক। এই শ্রীমান বাদলের উচিত ছিলো সজনী দাস অবধি এগিয়ে, তাঁর বাক্য থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে সেইখানে ক্ষান্ত হ'য়ে নিজেকে সেলাম করতে করতে ফিরে আসা। 'যে করে নিজেরে নতি সে লভে সবার নমস্কার'—মকরধ্বজের মতো সর্বরোগহর ক্লৈব্যঘাতক এমন কাব্য, গীতায় শ্রীভগবানের সেই বিখ্যাত ধনঞ্জয়-প্রহারের পরে আর দেখা যায়নি।

ছেলেদের মধ্যে যারা স্বাক্ষর-বিলাসী তাদের জন্যে সজনী দাসের ঐ স্বীকারোক্তিই মোক্ষম। তারা নিজেরা স্বাক্ষর করুক—অপর কারো অটোগ্রাফের খাতায় নয়—নিজের জীবনে এবং নিজেদের কীর্তিতে। তাদের বাক্য আর ব্যবহারে—মনে আর চিন্তায়—জ্বলজ্বল করুক সেই সাক্ষর লেখা।

তবে মেয়েদের বেলা সজনীবাবুর ওই কথা খাটে না। মেয়েরা নিজেদের নতি করতে চায় না—ওই নামমাত্র কসরতের জন্যে তাদের জন্ম নয়—অত অল্পে তাদের তুষ্টি নেই—তারা অপরকে নত করতে ইচ্ছুক। এবং যদ্দূর জানা গেছে নিজের সগোত্রাদের নয়, ছেলেদেরকেই। অতএব তাঁরা স্বাক্ষর জড়ো করুন—যতো খুশি—আপত্তি নেই। যে-বেচারীর স্বাক্ষর তাঁরা নেবেন, অগোচরে অদৃশ্য-অক্ষরে নিজের স্বাক্ষরও তার ওপরে সই ক'রে আসবেন তা নিঃসন্দেহ। স্বাক্ষর নেয়া নয়, ও হচ্ছে তাঁদের রাজকর নেয়া। এক ধাক্কায় রাজসূয় এবং অশ্বমেধ—দু-দুটো যজ্ঞ। কেবল তাঁদেরই যোগ্য—একথা অবশ্য-শিকার্য।

কড়া

জ্যোতির্ময় রায়

পাঠক হয়তো নামটাকে পড়েছেন সে-উচ্চারণে যাতে 'কটু' বা 'শক্ত' অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু আমার বক্তব্য বিশেষণ নিয়ে নয়, বিশেষ্য নিয়ে। লেখায় সেটা স্পষ্ট করবার ব্যবস্থা নেই—অতএব নরম 'ক'-এর উপর একটু চাপ দিয়ে বস্তুটিকে দরজার বক্ষলগ্ন ক'রে নেবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

দরজার কড়ার মধ্যেও বিশেষ ক'রে সদর দরজার কড়া-ই আমার আলোচ্য বিষয়। যে কড়া-যুগল অনির্দিষ্ট মিলনের আশায় অক্লান্ত আলস্যে দরজার গায়ে ঝুলে থাকে না। দরজায় কড়ার অবস্থানের একমাত্র কারণ অবশ্য যুগ্ম প্রচেষ্টায় তালাকে ধ'রে রাখা। কিন্তু সদর দরজার কড়াকে তার অবসর সময়টায় এমন একটা কাজে লাগিয়ে দেওয়া হলো যার তলায় তার জীবনের মুখ্য কর্তব্যটাই পড়লো চাপা। এখন কড়ার সঙ্গে 'নাড়ার'-যোগটাই ঘনিষ্ঠ, তালার আত্মীয়তা সেখানে তলিয়ে গেছে। গৌণের এ গুণ বিরল নয়। 'ফুডিং-লজিং'-ওলা শিক্ষকের দীর্ঘ অবসরকে কাজে লাগানোর ফলে একদিন দেখা যায় ছাত্রের মনের খোরাক যোগানোর চেয়ে পরিবারের পেটের খোরাক কেনা-কাটিতেই নির্ভর করছে তার সত্তার সার্থকতা। ফায়ার-ব্রিগেডের অখণ্ড অবসর-ভোগী ফায়ারম্যানদের দেখলে প্রজ্বলিত হুতাশনের চেয়ে ব্র্যাসো মর্দনে দক্ষতার কথাটাই স্মরণ হয় আগে। বস্তুজগতেও এমন আরো জিনিস আছে যার জন্মের উদ্দেশ্য এক, জীবনের ব্যবহারিক দিক অন্য। যেমন শার্ট বা পাঞ্জাবির বুক-পকেটে ঘড়ির ঘর। ঘড়ি কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে কবে। ক্যাঙারুর বাচ্চার মতো যাকে বুকের থলেয় বয়ে বেড়াতে হতো সে এখন বানর-বাচ্চার মতো আঁকড়ে থাকে হাতের কবজি। জামার জীবন তো দূরের কথা, মালিকের জীবনেও সে আর ঘরে ফিরবে না, তবু বিংশ শতাব্দীর বুকে বুকে তার জন্যে ঘর তৈরি হচ্ছে এবং সেখানে মহানন্দে বসবাস ক'রে যাচ্ছে নোট আর রসিদ। অতএব দেখা যাচ্ছে কড়ার ব্যাপারে এটা নতুন কিছু নয়—এমন হ'য়ে থাকে।

ঘাসের উপরকার আবছা পায়ের চিহ্ন অবলম্বনে বিনা চেষ্টায় যেমন একটি স্পষ্ট পথ গ'ড়ে ওঠে, তেমনি দুটো কড়ার মধ্যে একটি আপনা থেকেই নির্বাচিত হ'য়ে যায় নাড়ার জন্যে। তার কাজ হচ্ছে কেউ এলে অন্দরে তার আগমন ঘোষণা করা। বিশেষ ক'রে কলকাতায় কোনো বাড়ির সদর দরজায় কড়া না থাকলে মেজাজ রীতিমতো খারাপ হ'য়ে ওঠে। উপস্থিতি ঘোষণা করা একটা সমস্যায় দাঁড়িয়ে যায়। সাহেবী কেতায় টোকা দেওয়া চলতে পারে বেড-রুমের দরজায়। নস্তুরমতো পালোয়ানী আঙুল না হ'লে সদর দরজার আন্দাজ টোকা মারা সম্ভব নয়। দুবদুব্ ক'রে থাবড়া দিয়েও নিশ্চিত বা তৃপ্ত হওয়া যায় না। মনে হয় চার পা গিয়েই শব্দটা থপ্ ক'রে ব'সে পড়বে। অনেকসময় থাবড়া মারতে সংকোচ হয়—ভয়ও হয়, এক বাড়ির লোক ডাকতে গিয়ে পাড়াশুদ্ধ লোক জড়ো করবো। কিন্তু কড়া যত জোরে যত খুশি নাড়ো, আশপাশের লোক ত্যক্ত হ'তে পারে কিন্তু ছুটে আসবে না।

সামান্য একটা কড়ার অভাবে কতটা অসুবিধায় পড়তে হয় দেখুন। মেজরাফ ছাড়া সেতারের মতো দরজাটা হাতের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে—মুখের ডাক হাতে ফুটিয়ে তুলবার উপায় থাকে না। শেকল থাকলে কাজটা একরকম চালানো যায় বটে, কিন্তু আধুনিক দরজার কপাল থেকে এই লৌহ-অলক উঠেই গেছে। থাকলেও, ও দিয়ে শুধু মিঠে আওয়াজ করা চলে। তা ছাড়া কড়ার মতো হাতের সহজ নাগালের মধ্যেও থাকে না।

আধুনিক অনেক বাড়িতে বসানো বিজলি-বোতাম। তাঁরা হয়তো আমার এসব কথা প'ড়ে হাসছেন। তা হাসুন। আমি কিন্তু জোর ক'রেই বলবো, কড়া-র সঙ্গে ডাক-ঘন্টার কোনো তুলনাই চলতে পারে না। কোনো বড়ো বাড়ির বিজলি-বোতামে হয়তো টিপ দিলাম, কোনো শব্দই কানে এলো না। কান পেতে আরো গোটা দুই লম্বা টিপ দেওয়া গেল, কিন্তু বোঝা গেল না ঘন্টি কাজ করছে, না বিগড়েছে। জবাব পেতে একটু দেরি হ'লে নিরাশ হ'য়ে আর একটা টিপ মারা ছাড়া উপায় থাকে না। এদিকে আমি যখন ডাকতে না পারার অস্বস্তিতে উসখুস করছি, ব্যস্ত ভৃত্য তখন হয়তো অতি ডাকার দরুন অতি-ত্যক্ত হ'য়ে দড়াম ক'রে দরজা খুলে দাঁড়ালো—ঘন-ঘন্টির বিরক্তি তার চোখে মুখে। কতটা ডাকলাম তার ওজন বুঝতে না পারলে ডেকে সুখ হয় না, এবং ওজন ঠিক থাকে না ব'লে অপর পক্ষও প্রায় চটে। অবশ্য এমন বাড়িও আছে যার বোতাম টিপলে ঘন্টি বেশ স্পষ্টই শুনতে পাওয়া যায়। সেখানে

ওরকম অসুবিধায় পড়তে হয় না বটে, তবু কড়ার সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে না। ডাক-ঘন্টির বৈচিত্র্যহীন ডাকে যন্ত্রের প্রাণশূন্যতা—সে শুধু ঘোষণা করে, বলে না কিছুই; কড়ার শব্দে ভাষা নেই, কিন্তু ভাব আছে। সে কেবল ডাকে না, বলেও অনেক। ডাক-ঘন্টিকে যদি বলি সংবাদপত্র, কড়াকে বলবো সাহিত্য।

কথাটা যাদের কাছে প্রমাণ-সাপেক্ষ তাদের নজির টেনে কিছুটা আভাস দেবার চেষ্টা করবো। আমার পাশের বাড়িতেই থাকে মস্ত একটি যৌথ পরিবার। দিনের ভিতর একশো বার তার কড়া খট্‌খট ক'রে ন'ড়ে উঠছে। সে-নড়ার বৈচিত্র্য ও মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করবার মতো। সাড়ে চারটে বাজতেই কড়াটা ছন্দোহীন দুরন্ত বেগে তার আংটার মধ্যে নেচে ওঠে। বাড়ির গিন্নী অমনি হেঁকে ওঠেন, 'অ-ঝি, মন্টু এসেছে, দরজা খুলে দাও'। নড়ার সেই চপলতা ও দুরন্তপনার মধ্যেই মা পান তাঁর মন্টুকে। কর্তা এসে কড়া নাড়েন, খট্—খট্ খট্। ভারি মন্থর তার চাল, শব্দের মধ্যে তাঁর কর্তৃত্বের দৃঢ়তা ও আস্থা—শব্দই যেন বলছে, এটুকু কানে গেলে যে যত ব্যস্তই থাক, ছুটে আসবে। কখনো শুনি কড়াটা নড়ছে ভারি কুণ্ঠিত ভাবে। শব্দ করতে সে যেন সাহস পাচ্ছে না, আবার না করেও উপায় নেই। এই কড়ার শব্দ থেকে লোকটির খোঁজ নিয়েছিলাম—দূর আত্মীয়, এ বাড়িতে থেকে চাকরির চেষ্টায় আছে। আমার জানলা দিয়ে বাড়ির অনেকটাই বেশ দেখা যায়। কড়ার আর একটি নড়ন শুনে লক্ষ্য না করে পারিনি। খুট্-খুট্-খুট্ খট্ বা খট্ খুট্ খুট্—আস্তের উপর বেশ ছন্দ রেখে নড়ে। এমন ভাবে নড়ে যেন এ-শব্দটুকু শোনবার জন্যে কেউ কান পেতে ব'সে আছে। হঠাৎ একদিন নজরে পড়লো ঐ নড়ার সঙ্গে বাড়ির ইস্কুলে-পড়া মেয়েটিও বেশ নড়েচড়ে ওঠে—বাকিটুকু বোঝা কিছু কঠিন কথা নয়। বাড়ির বড়ো ছেলেটির এক এক দিন তাস খেলে বা আড্ডা দিয়ে ফিরতে বেশ রাত হয়। সেদিন কড়াটাকে মুঠো ক'রে ধ'রে এমন একটি চাপা খুট্-খুট্ আওয়াজ সে করে যাতে পাড়ার লোক তো দূরের কথা, বাড়ির কর্তারও ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। সে-শব্দ চুপি চুপি পৌঁছোয় শুধু তার বিনিদ্র বধূর কানে।

বিজলি-ঘণ্টার ঘোষণায় এ পরিচয়, এ বৈচিত্র্য থাকে না—থাকতে পারে না। আমি বলবো কড়ার খুট্-খুট্ শব্দে যাঁরা ত্যক্ত হন, তাঁরা কান নেই বলেই হন—এবং কড়াকে বাতিল ক'রে সদর দরজায় বসান কলের ঘন্টি।

দাঁত

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দাঁতের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ সেটা শুধু দৈহিক নয়, আন্তরিকও বটে। দাঁতের সঙ্গে মাড়ির, মাড়ির সঙ্গে চোয়ালের, চোয়ালের সঙ্গে চিবুকের গঠন আর তার সঙ্গে চরিত্রের দৃঢ়তা, এইভাবে টেনে নিয়ে গেলে দেখা যাবে যে দন্তমূল ব্যক্তিত্বের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে। সে হিসাবে মানুষের সমস্ত অবয়বের পিছনেই একটা চারিত্রিক বিকাশের অবকাশ ও উদ্দেশ্য আছে, নিছক শরীর-সংস্থানের জন্যই হাত-পা-গুলো নড়ে না। সে নড়ার পিছনে আছে একটা ব্যঞ্জনা কিংবা একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি যেটা মানুষের হাবভাব-প্রকাশে সাহায্য করে।

ডিম্বাকৃতি সুডৌল মুখের ছাঁচ, দীর্ঘায়ত চোখ, পেলব আঙুল দেখলে আমরা চট ক'রে আন্দাজ ক'রে নিই—এগুলির অধিকারী আর্টিস্টিক মেজাজের লোক। বেঁটে কালো এবং কোঁকড়া চুল দেখলে তেমনি আবার অকারণ একটা কুটিলতার সন্দেহ জাগে মনে। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র যাঁরা বেঁধেছিলেন অথবা কামসূত্রের প্রাথমিক তথ্যগুলি যে সব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট করেছিলেন, তাঁরা মানুষ আর মানুষের শরীরটাকে ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, এ কথা নিশ্চিত। দ্বাদশ রাশির সাধারণ বর্ণনা অথবা শশ-গজ-হয়-বৃষ এবং পদ্মিনী হস্তিনী প্রভৃতি নর-নারীর লক্ষণ-নিরূপণ এইভাবেই হয়েছিলো।

দাঁত জিনিসটা মোটেই তুচ্ছ নয়। এর যথাযথ রূপ-বর্ণনা জানবার যদি আপনার আগ্রহ থাকে, তা হ'লে সংস্কৃত সাহিত্য খুলুন। সেখানে দন্ত-কৌমুদীর অজস্র প্রশংসাসূচক বর্ণনা পাবেন। ব্যাকরণের মধ্যে দাঁত ঢোকানো সাধারণের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু স্ত্রী-প্রত্যয়ের অধ্যায় খুললেই দেখবেন, সেখানেও দাঁত ঢুকছে, যথা— 'গজদন্ত' 'সুদতী'। সংস্কৃত সাহিত্যে অথবা প্রাক্-রবীন্দ্রযুগের বাংলা সাহিত্যে দন্তশোভা খানিকটা গতানুগতিক ভাবেই বর্ণিত হয়েছে, দাঁতের শোভা না দেখালে যেন সমস্ত মুখমণ্ডলের বর্ণনাটাই নিরর্থক হ'য়ে যায়। এর চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নৈষধের সপ্তম সর্গে।

সেখানে মাত্র দশটি শ্লোকে দময়ন্তীর বিম্বাধর ও কুন্দদন্তের সৌন্দর্য চিত্রিত হয়েছে। বাংলার কবিকুল—মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, নবীন—কেউই দাঁতকে অবহেলা করেন নি, তা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অপরূপ, মধুর ভাষায় ব'লে গেছেন, তাকেই নাকি হাসি মানায়—'মাধুরী ঝরে যার হাসিতে'।

কিন্তু দন্তহীনতার শোভা অথবা দাঁতের যন্ত্রণা নিয়ে কি কোনো কাব্য-সাহিত্য রচনা করা হয়েছে? ইংরেজী সাহিত্যে অবশ্য এ দুটোরই নজির আছে। দন্তহীনা বৃদ্ধার স্নিগ্ধ হাসি ও মুখসৌন্দর্যের ওপর কবিতা পড়েছি আর ইংরেজী উপন্যাসে বহু জায়গায় দেখেছি সাধারণ ভদ্রলোক দুটি ব্যক্তিকে যমের মতোন ভয় করে—একটি হলেন শাশুড়ী, অপরটি ডেনটিস্ট।

সাদা ধবধবে দাঁত যেমন নয়নাভিরাম আর সুগঠিত সৌন্দর্য যেমন শোভন ও মধুর, তেমান সাদা দাঁতের সঙ্গে একটা পাশবিক উল্লাস কিংবা বর্বরতার ছোঁয়াচও আছে। আদিম মানুষ যখন সিদ্ধ-পক্ক মাংস খেতে শেখেনি, খেতো কাঁচা মাংস, তখন এই দাঁতের সজোর আস্ফালনটাই ছিলো বীরত্বের পরিচয়। এখন আমরা সভ্য হয়েছি এবং দংশনের বদলে চুম্বন করতে শিখেছি। কিন্তু এই প্রীতিকামনার পিছনে একটা সুপ্ত জান্তব বৃত্তি রয়ে গেছে, যেটা জেগে ওঠে বিশেষ অবস্থায় অথবা সংকট-মুহূর্তে। তখন মনে হয় যে, বাগে পেলে এবং সুবিধা-সুযোগ থাকলে মানুষ মানুষকে সত্যিই দাঁত দিয়ে কামড়াতে পারে এবং দরকার হ'লে, তার অস্থি-মজ্জা টুকরো টুকরো ক'রে ফেলতে পারে। অতীতে ও বর্তমানে মানুষকে মানুষের এই ছিঁড়ে-খাওয়া ব্যাপারটা যে অসাধ্য নয়, তার বহু সাক্ষ্য আছে ইতিহাসের পাতায় এবং আধুনিক কালের জগৎ-জোড়া হিংস্রতায়।

কিন্তু রূপকের কথা যাক। সত্যিই কি আমরা দাঁতালো মানুষকে ভয় করি না, এড়িয়ে চলি না? এক এক জন মানুষ দেখেছি এবং দেখবামাত্রই মনে হয়েছে, এতো দিন বাদে 'মিসিং-লিঙ্ক'-এর সন্ধান পেলুম। মুখের ও চোয়ালের গড়নে, দাঁতের পাটির অশোভন ভঙ্গিতে এবং সূচ্যগ্রতায় মনে হয়েছে যে, এ মানুষ গরিলা-সিম্পাঞ্জীরই নিকট আত্মীয়, অসাবধান মুহূর্তে খ্যাঁক ক'রে কামড় বসাতে পিছপাও হবে না। এই সব মানুষের দাঁতের বহর দেখে পর সৃষ্টি হয়েছিলো শূকরদন্ত, ব্যাঘ্রদন্ত, গজদন্ত ইত্যাদি। জানোয়ারের সঙ্গে এদের শুধু দাঁতেই সাদৃশ্য নয়, আছে কিছুটা মেজাজে ও স্বভাবে। কোনো কোনো

মানুষের কশের দাঁত চওড়া, তারা ভালো চিবুতে পারে, কাঁটাকে চূর্ণ ক'রে ফেলতে পারে। চিংড়ির মাথা ও কাঁকড়ার দাড়া এদের দন্তপেষণে রসার্দ্র হ'য়ে ওঠে। এরা বাঘ ও বিড়ালের মতোই থাবা ভ'রে আহার করে, রসনার লেহনে এদের চরিত্রের স্থূলতার পরিচয়। কেউ বা একটুকরো মাংসের হাড় নিয়ে সেটাকে বাগিয়ে আয়ত্ত ক'রে নিতে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করে। তাদের খাবার ভঙ্গি ও ধৈর্য দেখলে কুকুরের কথাই মনে আসা স্বাভাবিক। কেউ বা অনন্যমনে গ্রাসের পর গ্রাস গিলতে থাকে, ভালো ক'রে চিবোয় না। তারপর হাঁপাতে থাকে। খাওয়ার পরেই শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে এবং বিশ্রামের প্রয়োজন জরুরী মনে করে। এদের সঙ্গে রোমন্থনকারী গো-জাতির সাদৃশ্য আছে, এরা কেমন যেন ভীরু, অসহায় ও উদর-সর্বস্ব। কোনো কোনো মানুষের দু পাশের দুটো দাঁত উঁচু। খাবার সময় তারা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে শব্দ করে, খুঁত ধরে, এটা-ওটা সরিয়ে দিয়ে নিজের রুচিমত সামগ্রী দিয়ে প্রচুর পরিমাণেই উদর-পূর্তি ক'রে নেয়। এদের চরিত্রে শূকরের মতো একদিকে নিরীহতা ও মালিন্য, অপর দিকে হিংস্রতা ও একগুঁয়েমি আছে ব'লে সন্দেহ হয়।

যে সব স্ত্রীলোক ভুক্ত বস্তু তারিয়ে তারিয়ে খান, জিহ্বার সঙ্গে সংঘাতে একটা অপূর্ব শব্দের সৃষ্টি করেন আর চোখটা ঘুরিয়ে অথবা বুজিয়ে রসাস্বাদ করেন, তাঁদের দাঁত না দেখতে পেলেও আমার মনে হয় অনেকটা লঘু চপল হরিণীর মতো প্রকৃতি এঁদের। যে সব রোগা মহিলা দু-চারটি আঙুলের ডগার সাহায্যে মুখের মধ্যে খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেন, তাঁদের দাঁত আছে কিনা জানা যায় না, তবে মনে হয় তাঁরা কাঠঠোকরা পাখির মতোন ক্ষীণকায় ও লম্বগ্রীব, চঞ্চুতে ক্ষুরধার এবং মেজাজটা একটু অসহিষ্ণু, একই কথার বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি করেন আর সুবুদ্ধির বালাই নেই। কোনো কোনো মেয়েদের সামনে কয়েকটি দাঁতের অদম্য বহির্মুখিতা আছে। তাঁদের অধরের উপরের এই ছোট্ট ছাউনিটুকু কিন্তু গ্রীষ্মকালের স্নিগ্ধ বারান্দা নয়। দেখলে মনে হয় তপ্ত দুপুরের হালকা হাওয়া সেখানে যাতায়াত করে। একটি মহিলার দেখেছিলুম ছোট্ট একটি গজদাঁত আছে, তাকে কিছুতেই চাপা যায় না। আমার মতে, সেটি বেশ একটু ঝলমল বিলাসিনীর চটুল মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। কিছুদিন পরে দেখলুম সেটি সৌন্দর্যহানির ভয়ে উৎপাটিত হয়েছে, তার বদলে এসেছে একটি প্লেন নকল দাঁত। কিন্তু এতে কি লাভ হলো? যেখানে ছিলো

ক্লিওপেট্রার সম্ভাবনা, সেখানে এলো বৈশিষ্ট্যহীন নিতান্তই সাধারণ গৃহিণীর নিশ্চেষ্ট প্রকাশ। মাত্র একটি দাঁতের সূক্ষ্ম উগ্রতায় যে নায়িকার ইতিহাস মানুষের চোখে পড়তে চেয়েছিলো, সে চোখকে ভোঁতা ক'রে দিয়ে তার যে কি পরমার্থ লাভ হলো জানেন তিনি, তাঁর কাণ্ডজ্ঞানহীন পতিদেবতা আর হতভাগা ডেনটিস্ট। আরেকটি সুদর্শনা চারুহাসিনীকে দেখেছিলাম। তাঁর আহারের প্রক্রিয়াটা অদ্ভুত। তিনি খাদ্যপদার্থকে হাতের তেলোয় চাপ দিয়ে দিয়ে একটু ডেলা পাকিয়ে নেন, তারপর হাঁ-মুখটা হয়তো ছোটো বলেই অল্প অল্প ক'রে মুখে পোরেন। চিবোন কিনা টের পাইনি, কেননা শব্দ তো হয়ই না, এমনকি গালের পেশীও নড়ে না। আশ্চর্য হ'য়েছিলাম তাঁর এই অভিনব আহার-পদ্ধতি দেখে। তখন তাঁর সঙ্গে ভালো ক'রে আলাপ হয়নি, কাজেই আমার অর্ধপরিচিত কৌতূহলী ও বিস্মিত দৃষ্টিতে তিনি লজ্জিত হ'য়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, খাবার টেবিলে ব'সে তাঁর স্বভাব সম্বন্ধে আমার যে ধারণাটা হয়েছিলো, সেটা বদলায়নি, বরঞ্চ আরো বদ্ধমূল হয়েছে। তিনি পাইথনের মতোই দীর্ঘাকৃতি, হৃষ্টপুষ্ট, বিচিত্রবর্ণা, সুন্দরী। কিন্তু ধীর স্থির, হঠকারিতায় অপারগ, দেহে ও কথায় ওজন রাখেন যথেষ্ট। তবে— নিষ্প্রাণ, রক্তে উত্তাপ নেই, দেহের ক্ষুধা কম, অল্পে তুষ্ট, মাথা ছোটো ও ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ-শীতল আবহাওয়াতেই তাঁর রুচি। চন্দ্রবোড়া ও শাঁখামুঠির মতো তীব্র বিষ বা রুক্ষ মেজাজ তাঁর নয়, তবে বারবার ছোবল দেওয়ার চেয়ে সুকুমার মুখের অধীশ্বরী হয়েও তিনি পুরোপুরি গ্রাসটাই পছন্দ করেন।

থাক, এসব গালগল্প ও পরচর্চা হয়তো আপনাদের কাছে অরুচিকর লাগছে। কিন্তু আমি তো মহিলাদের নিয়ে কুৎসা করতে বসিনি। আমার প্রতিপাদ্য বিষয় তো পূর্বেই বলেছি, দাঁতের সঙ্গে কোথায় যেন ব্যক্তিত্বের একটা যোগাযোগ রয়েছে। তাছাড়া, এযুগে এমন রোমাণ্টিক মনোভাব থাকাও তো ঠিক নয়। মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে তাঁরা কিছুই খান না, অথবা খাওয়াটা বাড়ির পুরুষের আড়ালে গোপনে সারাই ভালো, চোরের মতো সন্তর্পণে। কেউ দেখে ফেললে তাঁদের সাত্ত্বিক সতীত্ব ও পদ্মিনী-স্বপ্ন চুরমার হ'য়ে যায়। তাঁদের দাঁত থাকবে, ছোট্ট, সুগঠিত, ইঁদুরের মতো। বড়ো জোর তাঁরা একটু ঝাল চানা বা ডালমুট কুড়মুড় ক'রে মুখ ফাঁক না ক'রে চিবুতে পারেন, কিন্তু চুড়ির গোছা সামলে জামবাটিতে কব্জি ডুবিয়ে মাংস-খাওয়া রীতিমতো অমার্জনীয়। আমার একটি বন্ধুর এমনি একটা সংস্কার ছিল এবং

বিয়ের পরে তিনি তাঁর স্ত্রীর মাংসপ্রীতি চাক্ষুষ উপলব্ধি ক'রে ব্যথিত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু মুখ ও দাঁত যখন রয়েছে, তখন খাওয়া ব্যাপারটা অতখানি স্থূল ব'লে ভাববার কি কোনো কারণ আছে? স্বামীর মাথায় গলদা চিংড়ির চেয়ে বেশী ঘি থাকলে ভয়েরই বা কি কারণ? আমাদের মাসি-পিসি-ঠাকুমা জাতীয় মহিলাদের খাওয়া নিয়ে লজ্জাটা হয়তো সেকালে বেশি ছিলো। কিন্তু সকালে পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁতে কালো গুল পুরে দিয়ে বিশুদ্ধ ভাষায় অপর পল্লীবাসিনীর ভর্তা ও পুত্রের মাথা তাঁদের কাউকে কাউকে চিবুতে স্বকর্ণে শুনেছি। তাঁরা বেলা তিনটেয় হেঁসেলের পাট চুকিয়ে যে পরিমাণ অন্ন, সজনে ডাঁটা ও মাছের কাঁটার ঝাল চচ্চড়ি ওড়াতেন, সেটা তো নিতান্ত তুচ্ছ নয়। আসল কথা এই, আজকালকার মেয়েরা ঘোমটা দেন না, নথও পরেন না। নইলে ঘোমটার ফাঁকে, নথের আড়ালে অনেকখানি মুখব্যাদান করবার অবসর পেতেন।

আহারের সঙ্গে দাঁতের যোগটা যেমন যান্ত্রিক, হাসির সঙ্গে দাঁতের সম্পর্কটা তেমনি আত্মিক। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দাঁতের কি-ই বা মর্যাদা! কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দাঁত ও হাসির অনেকখানি গুরুত্ব। যে দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়েছে, সে মানুষের শ্লীলতার আবরণ খসেছে। যে মানুষ দেঁতো হাসি হাসে, সে মানুষের ব্যক্তিত্ব অশ্রদ্ধেয়। যার হাসিতে দাঁত ও মাড়ি বেরিয়ে আসে, তাকে আমরা সভ্য আখ্যা দিতে নারাজ। কথায় কথায় যার এক গাল হাসি, তাকে আমরা অন্তঃসারশূন্য উদারতায় ভূষিত করি। মোটা-সোটা গম্ভীর লোক যখন পান্তুয়া-হাসি হাসেন, তখনই আমরা কাছে এগুতে ভরসা পাই আর রুক্ষ, কৃশকায় ব্যক্তির আন্তরিক হাসিকেও আমরা সন্দেহের চক্ষে দেখি। এই সমস্ত হাসি দাঁতের উপর নির্ভর করছে, কেননা দাঁতের গড়নের সঙ্গে হাসির কোণ, খোঁচ ও টান অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যাদের সামনের দাঁত কোদালের মতো চৌকো ও বড়ো, তাদের হাসি দরাজ হবেই। মেজাজ তাদের মোটামুটি ভালো এবং উদার, কিন্তু সহজেই উত্তপ্ত হ'য়ে আবার সহজেই তারা শান্ত হয়। এসব লোক আমার মনে হয়, একটু আত্মম্ভরী, আবেগবান ও উত্তেজনাপ্রবণ হ'য়ে থাকে। ঝপ ক'রে যেমন কামড়ায়, টপ ক'রে চুমুও খায়। কথায় কথায় এরা বাজি ধরে, প্রায়ই হেরে যায়, হেরে গিয়ে বাজির টাকা দেয় না এবং না দিয়েও লজ্জা বোধ করে না। উপরন্তু তর্ক করে, এড়িয়ে যাবার হাসি হেসে গড়িয়ে পড়ে।

যাদের দাঁত সরু ও মিহি, উপরন্তু ঠোঁট পাতলা, আমি সে-সব লোককে এড়িয়ে চলি। কেননা, আমার অহেতুক সন্দেহ জাগে যে এরা একটু ফিচেল জাতের, ধূর্ত প্রকৃতির। স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতা এদের চরিত্রে বড়োই কম। যাদের 'মোলার' বা কশ দাঁত সোনাবাঁধানো, তাদের শঠ ও অসমসাহসী হ'তে বাধা নেই ; কেননা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে প্রায়ই দেখবেন যে, খুনী আসামী অথবা চতুর প্রতারক অর্থাৎ নায়কের দু-একটি দাঁত সোনা-বাঁধানো এ'লে আলোয় ঝকঝক ক'রে ওঠে আর ডিটেক্‌টিভ সেই সেই মুহূর্তে অনায়াসেই তাকে ধ'রে ফেলে পিস্তল তোলে। আর যাদের দাঁতের মধ্যস্থলে পিন-এর ছোট্ট মাথাটি দেখা যাচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা নির্বিকার। আমার মনে হয় তারা পান-দোক্তার রসে মশগুল, উড়িষ্যাবাসীরই সমগোত্র।

দাঁতের কথা বলতে গিয়ে পানের কথা এসে গেল। আসতেই হবে, যেহেতু ব্যক্তিগত রুচি ও রসবোধকে অস্বীকার করতে পারি না। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি যে পান-খাওয়া খারাপ, ওতে দাঁতের গোড়ায় পাথুরী হয়, দন্তমূল ক্ষয়ে যায়, জিব মোটা হয়, দাঁত তরমুজের বিচি হ'য়ে যায় ইত্যাদি। প্রত্যেকটি কথাই সত্য। ভুক্তভোগীর জীবনে প্রমাণিত তথ্য। কিন্তু পান না খেয়েও দাঁত পড়ে, দাঁতের রোগ হয়। দন্তচিকিৎসার যত ঔষধের বিজ্ঞাপন, সবই ইংরাজী। ইংরেজ পান জর্দা খায় না, খায় মাংস। অথচ তার পায়োরিয়া হয় এবং বিলেতে দন্তচিকিৎসার অবাধ পসার। তাহলে পায়োরিয়া রোগে পড়ে চল্লিশ বছরে দাঁত তুলে ফেলা আর বাঙালীর পঞ্চাশে পান খেয়ে দাঁতগুলোকে ঝামা ক'রে ফেলে দেওয়ার মধ্যে এমনকি আকাশ-পাতাল পার্থক্য ? আসলে পান-খাওয়াটা স্বাস্থ্যহানি যতখানি না করে, তার চেয়ে বেশি পীড়া দেয় হিতৈষী-হিতৈষিণীর চোখকে। পানের নেশা কী বস্তু, মাতালও সে কথা বুঝবে না। আমার এক আত্মীয় রাত জেগে পান খেতেন ও কৌটার পান না ফুরোলে শয্যা নিতেন না। আরেকজনকে দেখেছি, রাত্রে উঠে রাস্তায় গিয়ে ঘুমন্ত পান-ওয়ালাকে জাগিয়ে পান সাজিয়ে খেয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। একজন বিশিষ্ট ডাক্তারকে দেখেছি কলেরা-রুগী ঘেঁটে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ হাঁ করলেন আর দোকানী পানটা তাঁর মুখে ফেলে দিলো। ছোঁয়াচ বাঁচলো অথচ নেশাও জমলো। এই ডাক্তারের মুখেই শুনেছি পানের হরেক রকম উপকারিতা, যা কোনো ভেষজ-তত্ত্বে লেখা নেই। অপর একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে দেখেছি সকালে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিজের হাতে প্রায় শ'খানেক

পান-সাজতে। সারাদিনের খোরাক। এ নেশা বড়ো সংক্রামক। যাঁরা দাঁতের ভয়ে পরের নিন্দা করেন, কালক্রমে তাঁদেরও স্খলন হয়, মতিভ্রম ঘটে এবং বেপরোয়া হ'য়ে অবশেষে পান-জরদায় আসক্ত হ'য়ে পড়েন। এঁরা আবার দু নৌকায় পা রাখেন। সামনের দাঁত ক'টি প্রসাধনে বেশ পরিষ্কার ক'রে রাখেন, কিন্তু মুখগহ্বরে ঘন ঘোর অন্ধকার।

এই পান খাওয়ার সূত্রে একটি করুণ কাহিনী মনে পড়লো। এক ভদ্রলোক পান খেতেন বেশি, কিন্তু কোর্টশিপের সময় মহা মুশকিলে পড়লেন। ভদ্রমহিলা আধুনিক, ছিমছাম, শিক্ষিতা এবং পান-খাওয়া দেখতে পারেন না। ভদ্রলোক দুদিনেই ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। তারপর মোড়ের মাথায় মুখ থেকে পান ফেলে দিয়ে আড়ালে দাঁতের একটু ক্ষিপ্র সংস্কার ক'রে নিয়ে প্রণয়-পাত্রীর কাছে নিত্য সন্ধ্যায় হাজিরা দিতেন। ভদ্রমহিলা জানতেও পারতেন না যে তাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষীর হৃদয়ে প্রেমের স্পন্দনের চেয়ে ধরা-পড়ার গুরুগুরুটাই বেশি বাজছে আর তাঁর পকেটে রয়েছে ছোট্ট দু-চারটি নিমের দাঁতন। তাঁর এই জোচ্চুরিতে ভীত হ'য়ে আমি কতদিন সন্ত্রস্ত হয়েছি কিন্তু তিনি নির্বিকার চিত্তে অন্য সময়ে পান চালিয়ে যাচ্ছেন। বলেন, একবার ঘরে পুরতে পারলে তখন আর ভয়টা কিসের? কিন্তু বিয়ের পর দেখা গেল, দিন-দিন অবস্থাটা সঙ্গীন হ'য়ে উঠছে। স্ত্রী সামান্য এই পান-ছাড়ানোর ব্যাপারে নিজের অকৃতকার্যতায় নিজের জীবনকে ও অদৃষ্টকেই ধিক্কার দেন, মরণ-কামনা করেন, স্বামীকে অস্থির ক'রে তোলেন। আর স্বামী গো-বেচারীর মতো শুনে যান, না রাম, না গঙ্গা। প্রতিবাদ করেন না, একটু আধটু মিথ্যা কথা বলেন আর ছলনা করেন। পকেটে আবার নিমের দাঁতন থাকে, অলক্ষ্যে ভ্যানিটি-ব্যাগের ছোট্ট আয়না নিয়ে নিভৃতে দন্ত-সংস্কার চলে। কিন্তু অসাবধান মুহূর্তে যখন হেসে ফেলেন, স্ত্রী বলেন, 'জিব বার করো দেখি'। আবার সুরু হয় তর্জন-গর্জন, অঙ্গীকার-অভিমানের পালা। কিছুতেই কিছু হয় না। শেষকালে মরিয়া হ'য়ে ভদ্রলোক আমার সাহায্য ভিক্ষা করলেন। সুবিধা ও সুযোগ বুঝে আমি মহিলাটিকে একদিন কালিদাসের শ্লোক ব'লে একটি সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা শোনালুম—

বিনা খদিরসারেণ হারেণ হরিণীদৃশঃ।
নাধরে জায়তে রাগো নানুরাগঃ পয়োধরে॥

শ্লোকটির শেষ চরণটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা তেমন করিনি। তবে প্রথম চরণের

ব্যাখ্যা খুব কবিত্বময় ক'রে শোনালুম যে পান-খয়েরের লাল রঙটুকু নইলে সুন্দরীর অধর-শোভাই জন্মায় না। আশ্চর্য কাজ হয়েছিলো, বলতে হবে। কেননা, এখন তিনি পান-জরদায় ডুবে আছেন। ঠোঁট সমস্তক্ষণই বন্ধ এবং গাল ঈষৎ ফোলা, স্বামীকে গঞ্জনা শিক্ষা দেবার মতো মুখ খোলার অবকাশ নেই।

ব্যাপারটা আরো খোলসা ক'রে দেখা যাক। দাঁতের প্রতি যে মমতা, সেটা নিতান্তই স্বার্থের খাতিরে। 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা' না থাকাই স্বাভাবিক। যেহেতু যে জিনিস প্রিয়, অপরিহার্য ও সর্বক্ষণ ব্যবহারের বস্তু, তাকে সব সময়ে আমরা কদর করি না বা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি না। অমন যে ধর্মপত্নী, যাঁর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হিন্দুশাস্ত্রের পাতায় পাতায়, তাঁরও মর্যাদা আমরা কি রাখি দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্তে? সন্তর্পণে, সযত্নে পটের বিবি সেজে তাঁরাও থাকেন না, সংসার-সমাজও পছন্দ করেন না। আমরা ভালবাসি যে আমাদের মেজাজ বুঝে তাঁরা সুসজ্জিত হবেন এবং ক্ষণমাহাত্ম্যে সুসংস্কৃত বেশে একটু পুরোনো রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলবেন। ব্যস্—ঐ পর্যন্ত। নইলে বেশিরভাগ সময়েই তাঁরা ঢিলেঢালা, এমনকি অর্ধমলিন বসন প'রে সংসারের বেগার খাটবেন। পান থেকে চুন খসলে আমরা তম্বি করবো, মধ্যে মধ্যে এক একখানা শাড়ি-গয়না দেবো। এহেন নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহবস্তুটির দেহান্ত ঘটলে আমরা চোখে সর্ষের ফুল দেখি, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' রচনা করি, আবার শান্ত নিরুদ্বেল চিত্তে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করি। সেই রকম দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা আমরা দিই না। দাঁত-নড়ার যন্ত্রণা সুরু হ'লে আহা-উহু করি, গ্যাম্পেন্‌ট্ করি। সতৃষ্ণ নয়নে সুস্থ দাঁতের চর্বণ-লীলা দেখি। তারপর দাঁত পড়ে, লালা ঝরে। লোলুপ আগ্রহে নকল দাঁতের সেট্ বসাই। ছোটোদের ডেকে বলি, তোমাদের বয়সে পাথর চিবিয়ে খেয়েছি। দোজবরে বা তেজবরে যেমন নবযৌবনা পত্নী নিয়ে বিব্রত, নতুন দাঁতের প্লেট নিয়ে আমরাও সেই রকম বিপর্যস্ত হ'য়ে উঠি। সবটাই স্বার্থ, ভোগের ইচ্ছা আর অসময়ের বিলাপ বিড়ম্বনা।

তবে দাঁত নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী হ'লেও তার অনেকখানি আভিজাত্য আছে, এটা মানতেই হবে। দাঁতের শোভা মানুষের মুখকে আভিজাত্য দেয়, এটা ঠিক। দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়, কিন্তু হাড় থাকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কী চিহ্ন আজো রয়েছে? খানকয়েক কঙ্কাল, ম্যামথের হাড় ও দাঁত। সেই সুদূর অতীতের ফসিল থেকে চ'লে আসুন ঐতিহাসিক যুগে। দেখবেন দন্তপূজা ও দন্ত-সংস্কার, বর্বরতার নিদর্শনই বলুন আর সভ্যতার প্রতীকই বলুন।

বৌদ্ধরা বুদ্ধদন্ত সযত্নে পূজাবস্তু ক'রে রেখেছেন। আর আমাদের প্র্যাকটিক্যাল মনুও দন্তধাবন ও সংস্কার নিয়ে সংহিতার অর্ধেক অধ্যায়ই লিখে ফেলেছেন। কাজেই দাঁতের ঐতিহ্য গর্বের সামগ্রী। প্রাচীন ইতিহাসেও দন্তের মূল প্রবেশ করেছে। এক হিসাবে সর্ব দেহের মধ্যে দন্তেরই জাত্যাভিমান থাকা উচিত, কেননা সে ব্রাহ্মণতুল্য, দ্বিজ। উপনীত হ'য়ে ব্রাহ্মণ-তনয় প্রকৃত স্নাতক পদবাচ্য হন। তেমনি দুধে দাঁত পড়ে, আবার নবকলেবর নিয়ে সংসারী দাঁত গজায়। কঠিন তপশ্চর্যায় ব্রহ্মচারীর সিদ্ধিলাভ। আক্কেল-দাঁত ওঠায় মানুষের যন্ত্রণা-দায়ক সাবালকত্ব অর্জন।

অতএব দেখা যাচ্ছে দাঁতের একটা নিজস্ব ইতিহাস, চরিত্র ও দর্শন আছে যা মানুষকে দেয় চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং জগৎকে আহ্বান ও গ্রহণ করবার ভঙ্গী। আরেকটি কথা। দাঁত দেখা ও দাঁত দেখানো, এ দুটি প্রক্রিয়া আমরা আমাদের আদিমতম পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছি। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজী দাঁত আমরা চিনেছি, সেখানে আছে চতুর গন্ধবণিকের কুটিল হাসি। আমরা প্রত্যুত্তরে দুর্বল দাঁত খিঁচোই। স্বর্ণমানে সুপ্রতিষ্ঠিত আমেরিকান দেঁতো হাসি আমরা সম্প্রতি দেখছি, চিনেছি তার সুবর্ণ-বণিকের কারবারী হাসি। খালি ধরতে পারছি না ঠিকমতো দুর্জ্ঞেয় রুশ হাসি। গোঁফের নীচে দাঁত দেখা যায় না। তবে গত ছ' বছর ধ'রে অনেক দাঁত দেখলুম ও দেখালুম। এতে মনে হয়, আমরা দাঁতকে অবহেলা করিনি, তার ঐতিহ্যকে যথাযথ মূল্য দিয়েছি রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজে ও চোরা-বাজারে।

দাঁত নিয়ে অনেক বাজে কথার আলোচনা করলুম। তার উদ্দেশ্য অবশ্যই ব্যক্তিগত সান্ত্বনা। আমার মনে হয়, দাঁত থাকলেই পড়বে। এতে বিচলিত হবার কিছু নেই। যাদের দাঁত ভালো, তারা আশাবাদী। অতবড় ব্যক্তিগত শোক পেয়েও যে ব্রাউনিং 'র‍্যাবিবেন এজরা'তে বার্ধক্যের জয়গান করলেন, তা কিসের জোরে? তখনও কবির দাঁত পড়েনি, এইটেই আসল কথা। আমি কিন্তু তেমন ভরসা পাচ্ছি না। কেমন হেন হীনবল ও হৃতশক্তি ঠেকছে নিজেকে, যখনই দৃষ্টি পড়ছে আমার টেবিলে ঐ দুটি দাঁতের ওপরে। একটি আমার, যদিও অকালে গেল আজ সকালেই। বিবর্ণ, স্থানচ্যুত, গতমূল। অপরটি ছোট্ট সাদা দুধে দাঁত, আমার পুত্রের। সুকুমার, উচ্ছিন্নকোরক।

তবু বলি, নবজীবনেরই জয়।

আড্ডা

বুদ্ধদেব বসু

পণ্ডিত নই, কথাটার উৎপত্তি জানি না। আওয়াজটা অ-সংস্কৃত, মুসলমানি। যদি ওকে হিন্দু ক'রে বলি সভা, তাহলে ওর কিছুই থাকে না। যদি ইংরেজি ক'রে বলি পার্টি, তাহলে ও প্রাণে মরে। মীটিঙের কাপড় খাকি কিংবা খাদি; পার্টির কাপড় ফুরফুরে কিন্তু ইস্ত্রি বড়ো কড়া; সভা শুভ্র, শোভন ও আরামহীন। ফরাশি সালঁর অস্তিত্ব এখনো আছে কিনা জানি না, বর্ণনা পড়ে মনে হয় এতো সমারোহ ভালো না। আড্ডার ঠিক প্রতিশব্দটি পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষাতেই আছে কি? ভাষাবিদ্ না হ'য়েও বলতে পারি, নেই; কারণ আড্ডার মেজাজ নেই অন্য কোনো দেশে, কিংবা মেজাজ থাকলেও যথোচিত পরিবেশ নেই। অন্যান্য দেশের লোক বক্তৃতা দেয়, রসিকতা করে, তর্ক চালায়, ফুর্তি ক'রে রাত কাটিয়েও দেয়, কিন্তু আড্ডা দেয় না। অত্যন্ত হাসি পায় যখন শুভানুধ্যায়ী ইংরেজ আমাদের করুণা ক'রে বলে—আহা বেচারা, ক্লব কাকে বলে ওরা জানে না। আড্ডা যাদের আছে ক্লব দিয়ে তারা করবে কি? আমাদের ক্লবের প্রচেষ্টা কলের পুতুলের হাত পা নাড়ার মতো, ওতে আবয়বিক সম্পূর্ণতা আছে, প্রাণের স্পন্দন নেই। যারা আড্ডাদেনেওলা জাত, তারা যে ঘর ভাড়া নিয়ে, চিঠির কাগজ ছাপিয়ে চাকরদের চাপরাশ পরিয়ে ক্লবের পত্তন করে, এর চেয়ে হাস্যকর এবং শোচনীয় আর কিছু আছে কিনা জানি না।

আড্ডা জিনিসটা সর্বভারতীয়, কিন্তু বাংলা দেশের সজল কোমল মাটিতেই তার পূর্ণ বিকাশ। আমাদের ঋতুগুলি যেমন কবিতা জাগায়, তেমনি আড্ডাও জমায়। আমাদের চৈত্র সন্ধ্যা, শ্রাবণের ঝিম্‌ঝিম্ দুপুর, শরতের জ্যোছনাঢালা রাত্রি, শীতের মধুর উজ্জ্বল সকাল—সবই আড্ডার নীরব ঘণ্টা বাজিয়ে যায়, কেউ শোনে, কেউ শোনে না। যে দেশে শীত গ্রীষ্ম দুই-ই অতি তীব্র, সেখানে আড্ডার ক্ষীণতা অনিবার্য। বাংলার কমনীয় আবহাওয়ায় গাছপালার ঘন শ্যামলিমার মতোই আড্ডার উচ্ছ্বাস। ছেলেবেলা থেকে এই আড্ডার প্রেমে

আমি আত্মহারা। সভায় যেতে আমার বুক কাঁপে, পার্টির নামে দৌড়ে পালাই, কিন্তু আড্ডা। ও না হ'লে আমি বাঁচি না। বলতে গেলে আড্ডার হাতে আমি মানুষ। বই পড়ে যা শিখেছি তার চেয়ে বেশি শিখেছি আড্ডা দিয়ে। বিশ্ববিদ্যাবৃক্ষের উচ্চশাখা থেকে আপাতরমণীয় ফলগুলি একটু সহজেই পেড়েছিলুম—যেটা আড্ডারই উপহার। আমার সাহিত্য রচনায় প্রধান নির্ভর-রূপেও আড্ডাকে বরণ করি। ছেলেবেলায় গুরুজনেরা আশঙ্কা করেছিলেন যে আড্ডায় আমার সর্বনাশ হবে, এখন দেখছি আড্ডায় আমার সর্বলাভ হলো। তাই শুধু উপাসক হ'য়ে আমার তৃপ্তি নেই, পুরোহিত হ'য়ে তার মহিমা প্রচার করতে বসেছি।

যে-কাপড় আমি ভালোবাসি আড্ডার ঠিক সেই কাপড়। ফর্শা, কিন্তু অত্যন্ত বেশি ফর্শা নয়, অনেকটা ঢোলা, প্রয়োজন পার হ'য়েও খানিকটা বাহুল্য আছে, স্পর্শ-কোমল, নমনীয়। গায়ের কোথাও কড়কড় করে না, হাত পা ছড়াতে হ'লে বাধা দেয় না, লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়তে চাইলে তাতেও মানা নেই। অথচ তা মলিন নয়, তাতে মাছের ঝোল কিংবা পানের পিক লাগেনি, কিংবা দাওয়ায় ব'সে গা-খোলা জটলার বেআব্রু শৈথিল্য তাকে কুঁচকিয়ে দেয়নি। তাতে আরাম আছে, অযত্ন নেই ; তার স্বাচ্ছন্দ্য কোনোখানেই ছন্দোহীনতার নামান্তর নয়।

শুনতে মনে হয় যে ইচ্ছা করলেই আড্ডা দেয়া যায়। কিন্তু তার আত্মা বড়ো কোমল, বড়ো খামখেয়ালি তার মেজাজ, অতি সূক্ষ্ম কারণেই উপকরণের অবয়ব ত্যাগ ক'রে সে এমন অলক্ষ্যে উবে যায় যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বোঝা যায় না। আড্ডা দিতে গিয়ে প্রায়ই আমরা পরাবিদ্যার—মানে পড়া-বিদ্যার আসর জমাই, আর নয়তো পরচর্চার চণ্ডীমণ্ডপ গ'ড়ে তুলি। হয়তো স্থির করলুম যে সপ্তাহে একদিন কি মাঝে দু দিন সভা ডাকবো, তাতে জ্ঞানী-গুণীরা আসবেন এবং নানারকম সদালাপ হবে। পরিকল্পনাটি মনোরম তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম কয়েকটি অধিবেশন এমন জমলো যে নিজেরাই অবাক হ'য়ে গেলাম, কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেলো যে সেটি আড্ডার স্বর্গ থেকে চ্যুত হ'য়ে কর্তব্যপালনের বন্ধ্যা জমিতে পতিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে যাওয়ার মতো নির্দিষ্ট দিনে যেখানে যেতে হয় তাকে, আর যাই হোক, আড্ডা বলা যায় না। কেননা আড্ডার প্রথম নিয়ম এই যে, তার কোনো নিয়মই নেই ; সেটা যে অনিয়মিত, অসাময়িক, অনায়োজিত, সে বিষয়ে সচেতন হ'লেও

চলবে না। ও যেন বেড়াতে যাবার জায়গা নয়, ও যেন বাড়ি; কাজের শেষে সেখানেই ফিরবো, এবং কাজ পালিয়ে যখন-তখন এসে পড়লেও কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না।

তাই ব'লে এমন নয় যে এলোমেলো ভাবে আড্ডা গ'ড়ে ওঠে, নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে তার পিছনে কোনো একজনের প্রচ্ছন্ন কিন্তু প্রখর রচনাশক্তি চাই, অনেকগুলি শর্তপূরণ হ'লে তবে আড্ডা ঠিক আড্ডা হ'য়ে ওঠে। একে-একে সেগুলি পেশ করি।

আড্ডায় সকলের মর্যাদা সমান হওয়া চাই। ব্যবহারিক জীবনে মানুষে-মানুষে নানারকম প্রভেদ অনিবার্য, কিন্তু সেই ভেদবুদ্ধি আপিসের কাপড়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যারা ঝেড়ে ফেলতে না জানে, আড্ডার স্বাদ তারা কোনোদিন পাবে না। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি এতোই বড়ো যে তার মহিমা কখনো ভুলে থাকা যায় না, তাঁর পায়ের কাছে আমরা ভক্তের মতো বসবো, কিন্তু আমাদের আনন্দে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই, কেননা তাঁর দৃষ্টিপাতেই আড্ডার ঝর্ণাধারা তুষার হ'য়ে জমে যাবে। আবার অন্যদের তুলনায় অনেকখানি নীচুতে যার মনের স্তর, তাকেও বাইরে রাখা দরকার, তাতে তারও শান্তি। আড্ডার লোকসংখ্যার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, ঊর্ধ্বসংখ্যা দশ কি বারো, নিম্নতম তিন। দশ-বারো জনের বেশি হ'লে অ্যালবার্ট হল হ'য়ে ওঠে, কিংবা বিয়ে-বাড়িও হ'তে পারে; আর যদি হয় ঠিক দুজন, তার সঙ্গে কূজনই মেলে—পদ্যেও, জীবনেও। যে-কজন থাকবেন তাঁদের স্বভাবের উপর-তলায় বৈচিত্র্য তো থাকবেই, কিন্তু নীচের তলায় মিল না থাকলে পদে পদে ছন্দপতন ঘটবে। অনুরাগ এবং পারস্পরিক জ্ঞাতিত্ববোধ স্বতঃই যাদের কাছে টানে, আড্ডা তাদেরই জন্য এবং তাদেরই মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত; চেষ্টা ক'রে সংখ্যা বাড়াতে গেলে আড্ডার প্রাণ-পাখি কখন উড়ে পালাবে কেউ জানতেও পাবে না।

কিন্তু এমনও নয় যে ঐ কজন এক-সুরে-বাঁধা মানুষ একত্র হ'লেই আড্ডা জমে উঠবে। জায়গাটিও অনুকূল হওয়া চাই। আড্ডার জন্য ঘর ভাড়া করা আর শোক করার জন্য কাঁদুনে ভাড়া করা একই কথা। অধিগম্য বাড়িগুলির মধ্যে যেটির আবহাওয়া সবচেয়ে অনুকূল, সেই বাড়িই হবে আড্ডার প্রধান পীঠস্থান। সেই সঙ্গে একটি দুটি পারিপার্শ্বিক তীর্থ থাকাও ভালো, মাঝে মাঝে জায়গা বদলি করাটা মনের ফলকে শান দেয়ার শামিল। ঋতুর বৈচিত্র্য এবং

চাঁদের ভাঙা-গড়া অনুসারে ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে ছাতে, এবং ছাত থেকে খোলা মাঠে বদলি হ'লে সেই সম্পূর্ণতা লাভ করা যায়, যা প্রকৃতিরই আপন হাতের সৃষ্টি। কিন্তু কোনো কারণেই, কোনো প্রলোভনেই ভুল জায়গায় যেন যাওয়া না হয়। ভুল জায়গায় মানুষগুলোকেও ভুল মনে হয়, ঠিক সুরটি কিছুতেই লাগে না।

আড্ডার জায়গাটিতে আরাম থাকবে পুরোপুরি, আড়ম্বর থাকবে না। আসবাব হবে নীচু, নরম, অত্যন্ত বেশি ঝকঝকে নয়; যদি মরজি মতো অযথাস্থানে সরিয়ে নেবার আন্দাজ হালকা হয় তাহলে তো খুবই ভালো। চেয়ার-টেবিলের কাছাকাছি একটা ফরাশও থাকবে—যদি রাত বেড়ে যায়, কিংবা কেউ খুব ক্লান্ত থাকে, তাহলে শুয়ে পড়ার জন্য কারও অনুমতি নিতে হবে না। পানীয় থাকবে কাঁচের গেলাশে ঠাণ্ডা জল, আর পাতলা সাদা পেয়ালায় সোনালি সুগন্ধি চা; আর খাদ্য যদি কিছু থাকে তা হবে স্বাদু, স্বল্প, এবং শুকনো, যেন শুয়ে-শুয়েও খাওয়া যায়, আবার পরে হাত মুখ ধোবার জন্য উঠতে হয় না। বাসনগুলি জমকালো হবে না, পরিচ্ছন্ন হবে; এবং ভৃত্যদের ছুটি দিয়ে গৃহকর্ত্রী নিজেই যদি খাদ্য পানীয় নিয়ে আসেন এবং বিতরণ করেন তাহলেই আড্ডার যথার্থ মানরক্ষা হয়।

কথাবার্তা চলবে মসৃণ, মন্থর, স্বচ্ছন্দ স্রোতে তার জন্যে কোনো চেষ্টা কি চিন্তা থাকবে না; মনের মধ্যে যে-সব ঢেউ সব সময় উঠছে পড়ছে, কেজো দিনের আবর্তের তলায় যা চাপা প'ড়ে থাকে, কথাগুলি তারই যেন ছলছলানি। এখানে সংকোচ নেই; বিষয়-বুদ্ধি নেই, দায়িত্ববোধ নেই। ভালো কথা বলবার দায় নেই এখানে। ভালো কথা না আসে এমনি কথাই বলবো। এমনি কথারও যদি খেই হারিয়ে যায়, থাকবো চুপ ক'রে—চুপ ক'রে থাকতে ভয় কিসের। জোর ক'রে মেকি কথার অবতারণার চাইতে ঢের ভালো চুপ ক'রে থাকা। নানা কথার টানা-পোড়েনে যে কাপড়টি বোনা হয়, চুপ ক'রে থাকা তো তারই সোনালি পাড়। পাড় জিনিসটা কাপড়কে রূপ দেয়, চুপ ক'রে থাকাটা কথাকে সুস্পষ্ট ক'রে তোলে। এই জন্যই চুপ ক'রে থাকাকে যাঁরা বুদ্ধির পরাভব কিংবা সৌজন্যের ত্রুটি ব'লে মনে করেন, আড্ডা জিনিসটা তাঁরা বোঝেন না। তার্কিক এবং পেশাদার হাস্যরসিক, আড্ডায় এই দুই শ্রেণীর মানুষের প্রবেশ নিষেধ। যাঁরা প্রাজ্ঞজন কিংবা যাঁরা লোকহিতে বদ্ধপরিকর, তাঁদের সম্মানও বাইরে রাখতে হবে। কেননা আড্ডার ইডেন থেকে যে সূক্ষ্ম সর্প বারবার আমাদের

ভ্রষ্ট করে তারই নাম উদ্দেশ্য, যত মহৎই হোক, কিংবা যত তুচ্ছই হোক, কোনো উদ্দেশ্যকে ভ্রমক্রমেও কখনো ঢুকতে দিতে নেই। এটা ধ'রে নিতে হবে যে আড্ডা কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নয়; তা থেকে কোনো কাজ হবে না, নিজের কিংবা অন্যের কিছুমাত্র উপকার হবে না। আড্ডা বিশুদ্ধ; নিষ্কাম, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

শুধু পুরুষদের নিয়ে কিংবা শুধু মেয়েদের নিয়ে আড্ডা জমে না। শুধু পুরুষরা একত্র হ'লে কথার গাড়ি শেষ পর্যন্ত কাজের লাইন ধ'রেই চলবে, আবার কখনো লাইন থেকে চ্যুত হ'লে গড়াতে গড়াতে একেবারে সুরুচির সীমাও পেরিয়ে যাবে হয়তো। শুধু মেয়েরা একত্র হ'লে ঘরকন্না, ছেলেপুলে, শাড়ি-গয়নার কথা কেউ ঠেকাতে পারবে না। আড্ডার উন্মীলন স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণে। মেয়েরা কাছে থাকলে পুরুষের, এবং পুরুষ কাছে থাকলে মেয়েদের রসনা মার্জিত হয়, কণ্ঠস্বর নীচু পরদায় থাকে, অঙ্গভঙ্গি শ্রীহীন হ'তে পারে না। মেয়েরা দেন তাঁদের স্নেহ, তাঁদের লাবণ্য, ন্যূনতম অনুষ্ঠানের সূক্ষ্মতম বন্ধন; পুরুষ আনে তার ঘর-ছাড়া মনের উদ্দামতা। বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েদের দ্বারা এবং পুরুষের দ্বারা পৃথিবীতে অনেক ছোটোবড়ো কাজ হ'য়ে থাকে; ছন্দ হয় দুয়ের মিলনে।

আড্ডা স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের বদল হয়। মন যখন যা চায়, তাই পাওয়া যায় আড্ডাতে। কখনো কৌতুকে উজ্জ্বল, কখনো খামকা ভালো লাগায় ভরপুর, কখনো স্বপ্নে মদির। বুদ্ধিতে লাগে হৃদয়ের স্পর্শ, হৃদয়ে পড়ে বুদ্ধির আলো। আড্ডা যা দিতে পারে, আর কিছুই তা পারে না। আর কিছুই আড্ডার মতো নয়। বিশ্বসভায় অখ্যাতির কোণে আমরা নির্বাসিত; যারা ব্যস্ত এবং মস্ত জাত, যাদের কৃপাকটাক্ষ প্রতি মুহূর্তে আমাদের বুকে এসে বিঁধছে, তারা এখনো জানে না যে পৃথিবীর সভ্যতায় আড্ডা আমাদের অতুলনীয় দান। যারা ছিলো বিশ্বজয়ী তারা আজ স্বরচিত পুঞ্জ-পুঞ্জ উপকরণের তলায় চাপা প'ড়ে মরছে—প্রকৃতির প্রতিশোধের হাত থেকে তো বিশ্বজয়ীরও নিস্তার নেই। এই প্রায়শ্চিত্তের মহাযজ্ঞ যখন শেষ হবে, তখন নবজন্মের দুয়ার খুলে বেরিয়ে পড়বো আমরা, অস্ত্র নিয়ে নয়, মানদণ্ড নিয়ে নয়, ধর্মগ্রন্থ নিয়েও নয়, বেরিয়ে পড়বো নিশান উড়িয়ে, বিশুদ্ধ বেঁচে থাকার মন্ত্র নিয়ে, আনন্দের উদ্দেশ্যহীন ব্রত নিয়ে, আড্ডা দিয়ে পৃথিবী জয় করবো আমরা, জয় করবো কিন্তু ধ'রে রাখবো না;

কেননা আমরা জানি যে ধ'রে রাখতে গেলেই হারাতে হয়, ছেড়ে দিলেই পাওয়া যায়। পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি বলে, কাড়ো; আমাদের আড্ডা-নীতি বলে, ছাড়ো।

বিকিকিনি

পরিমল রায়

আজকাল পুস্তকের দোকানগুলিতে পুস্তক ব্যতীত আরো নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফ্ল্যাট ফাইল আছে ?"—দেখিবেন, দোকানী ক্ষণমধ্যে একখানি ডিক্‌শনারি আনিয়া হাজির করিয়াছে। আপনার আভিধানিক প্রয়োজন হয়তো আপাততঃ নাই। সুতরাং আপনি আশ্চর্য এবং ততোধিক বিরক্ত হইয়া বলিবেন, "এ কী আনলেন, মশায় ? আমি চাইলাম ফ্ল্যাট ফাইল।" দোকানী অবিচলিত কণ্ঠে বলিবে, "কেন, এগুলো তো আজ-কাল খুব চলছে। নিয়ে যান না এক কপি।"

আপনি পুনরায় আপনার প্রয়োজন নিবেদন করিবেন : "শুনতে ভুল ক'রে থাকবেন। আমি ডিক্‌শনারি চাইনি ! ফ্ল্যাট ফাইল আছে ?"

"হ্যাঁ, সে তো শুনেছি, ফ্ল্যাট ফাইল চাইছেন। না, সে এখন স্টকে নেই। তা' এর এক কপি—"

অতঃপর আর দোকানে সময় নষ্ট করা চলে না। আপনি অন্যত্র বাহির হইবেন।

যাহা বলিলাম, খুব একটা অতিরঞ্জন নহে। কোনে কোনো দোকানের নিয়মই হইল—না, খদ্দের চটানো নহে—তাহার প্রয়োজন সৃষ্টি করা। ফ্ল্যাট ফাইল নাই তো কী হইয়াছে ? ডিক্‌শনারি তো আছে। উহা যে আপনার লাগিবেই না, এমন কথা শপথ করিয়া বলিতে পারেন না। দোকান হইতে বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ছেলেটা একটা ডিক্‌শনারির জন্য সত্যই বড়ো আবদার করিতেছে। নিয়া যাইব নাকি এক কপি ? কিছু বলা যায় না, হয়তো পুনরায় দোকানে ঢুকিয়া ফ্ল্যাট ফাইলের পরিবর্তে একখানি অভিধান লইয়া বাড়ি ফিরিলেন।

এরূপ হামেশাই ঘটিতেছে, এবং আমার মনে হয়, এই ধরনের দোকানীদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেনাকাটায় বাহির হইয়া প্রয়োজনগুলি প্রায়ই মনে থাকে না। ফলে তিন মাইল পথ দুই বার দৌড়াতে হয়। ইঁহারা

সেই পথভ্রান্তি দূর করেন বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। অনেকে কিন্তু বিরক্ত হন। সেটা ঠিক নহে। প্রথমটায় একটু বিরক্ত হইবার কথা। এক ঘটি জলের পরিবর্তে তৃষ্ণার্তের নিকট একটি বিল্বফল আনিয়া হাজির করিলে ক্রোধ অনিবার্য। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝিবেন, অভিধানখানি আনা হইয়াছে নিতান্তই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে, সেই মুহূর্তেই আপনার রাগ পড়িয়া যাইবে। অবশ্য ফ্ল্যাট ফাইলের প্রশ্নটি নিষ্পত্তি হইয়া যাইবার পরই অভিধানের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা উচিত। কিন্তু দোকানীর দিক হইতে যদি বিষয়টি বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আর ও-কথা বলিবেন না। "ফ্ল্যাট ফাইল নাই" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তো আপনি চলিয়া যাইবেন, অভিধান সন্দর্শন কখন ঘটিবে? সুতরাং ঐ পথ অবলম্বন ব্যতীত দোকানীর গত্যন্তর নাই।

অনেকে বলেন, দোকানীর পক্ষে এই প্রকার দুষ্ট ফন্দিতে জিনিস গছাইয়া দেওয়া নিতান্তই জুলুম। কিনিতে গেলাম খোকনের জন্য ধাত্রীপাত, কিনিয়া ফিরিলাম খোকনের মায়ের জন্য সীবনশিক্ষা। কিন্তু ইহাতে ফন্দিটাই বা কী, জুলুমটাই বা কোথায়? বিজ্ঞাপনকে জুলুম বলিবেন কী হিসাবে? বাজারে খদ্দেরই রাজা। তাহার উপরে কথা বলে কাহার সাধ্য। বিক্রেতা কেবল অভিধানখানি দেখাইতেই পারে, কিন্তু কিনিবেন কিনা, সে আপনার মর্জি। অবশ্য বলিতে পারেন, উহারা লোভ দেখায় কেন? চোখ-কান বুজিয়া এক গজ মার্কিন কিনিয়া বাড়ি ফিরিবার কথা, তা নহে তো রাজ্যের শাড়ি আর ব্লাউস্-পিস আনিয়া হাজির। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে তো কথাই নাই, একা গেলেও উহার দু-একখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতেই বাণ্ডিলভুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও দোকানীকে দোষ দেওয়া চলে না। মিষ্টান্নের দোকানে গিয়া আপনি অবশ্যই আশা করিতে পারেন না যে, আপনাকে দেখিবামাত্র উহারা সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি উৎকৃষ্ট সামগ্রীগুলি সরাইয়া ফেলিতে থাকিবে, যাহাতে দু-একখানি তেলেভাজা জিলিপি কিনিয়াই আপনি হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিতে পারেন।

কথাটি মনে ধরিল না বুঝি? আচ্ছা, অন্য এক রকম দোকানের কথা ভাবিয়া দেখুন। ছাতাটি বন্ধ করিয়া দোকানে গিয়া উঠিলেন। আপনাকে দেখিয়া কেহ সম্ভাষণও করিল না, আগাইয়াও আসিল না। যে যাহার স্থানটিতে মহা বৈরাগ্যভরে উপবিষ্ট হইয়া রহিল। আপনি নির্বোধের মতো ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপর দ্বিধাসহকারে একজনের দিকে অগ্রসর

হইতেই সে প্রকাণ্ড এক হাই তুলিল। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমুক দ্রব্যটি আছে?" হাই তখনও শেষ হয় নাই। সেই আল-জিহ্বা-প্রদর্শিত মুখব্যাদানের বিকৃত ভঙ্গিটি না মিলাইবার পূর্বে কণ্ঠ হইতে একটি মিশ্র ধ্বনি উদ্গত হইয়া আসিল। উহা যে নঞ্-বোধক তাহা মালুম হইল সমসাময়িক হস্ত সঞ্চালনের ইঙ্গিতে। বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

এখন বলুন, দুই-চারিটা উৎকৃষ্ট জিনিসের নমুনা দেখা ভালো, না ঐ বিশ্বরূপ-দর্শনই বাঞ্ছনীয়?

বাজারে যাওয়া আর দোকানে যাওয়ার মধ্যে তফাত আছে। তফাতটা হইল, বাজারে দরদস্তুর করা চলে, দোকানে চলে না।

"দাম কত?"

"ডে-ট্টাকা।"

"বলেন কী? এই জিনিসই তো ঐ দোকানে দেখে এলাম পাঁচসিকে।" আপনি ভাবিলেন খুব জব্দ করা গিয়াছে। কিন্তু দোকানী কি বলিবে, জানেন?

"তাহলে ওখান থেকেই নিন গে।"

বলিয়া, পরম নিরুদ্বেগে অন্য খদ্দেরের প্রতি মনোনিবেশ করিবে। আবার কোথাও দেড় টাকা দাম শুনিয়া যদি পাঁচ সিকার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে ঈষৎ উন্নাসিকতা সহকারে কিঞ্চিৎ আশ্চর্যান্বিতভাবে দোকানী বলিবে, "দরাদরি কচ্ছেন? এখানে ওসব নেই", এবং এমন সুরে যে, আপনি লজ্জিত হইবেন। মনে হইবে, তাই তো, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরগণ আমাদের সুবিধার নিমিত্ত দয়া করিয়া পসরা সাজাইয়া বসিয়াছে, আর আমি কিনা চার আনা পয়সা ঠকাইয়া জিনিসটি হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

কিন্তু এই দুইটির কোনোটিই দোকানীর পক্ষে প্রশংসনীয় নহে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগসূত্রই হইল জিনিসের দাম। দেড় টাকাই যে উপযুক্ত এবং ন্যায্য মূল্য তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করাটা দোকানীর দায়। ঔদাসীন্য, তাচ্ছিল্য কিংবা অপমানসূচক কথা এস্থলে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। 'মূল্য' জিনিসটি আলোচনার বিষয়। মাথা বিক্রয় করিয়া জিনিস কিনিবার জন্য কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। দাম যদি একটু বেশি লইতে হয়, বেশিটার জন্য জিনিসটিকে একটু শিষ্টতার মোড়কে বাঁধিয়া হাতে তুলিয়া দেওয়া দোকানীর কর্তব্য।

সাহেবী দোকানে কোনোদিন গিয়াছেন? মেমসাহেব আপনাকে দেখিবামাত্র হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, "আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করিয়া ধন্য হইতে পারি?"

আপনি হয়তো বলিবেন, "আমার একটি ঝর্ণা-কলমের প্রয়োজন।"

মেমসাহেব কৃতার্থ : "অতি আনন্দের কথা। ইজ্ ইট্ টু বি এ গিফ্ট্ ফর দি লেইডি ?"—বলিয়া, বত্রিশখানি লেডিজ ফাউন্টেন পেন আপনার সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া বসিবে। ইহা শিষ্টতার চূড়ান্ত চাতুরী। এতখানির প্রয়োজন নাই, উচিতও নহে। তবে ক্রেতা বিরক্ত হইয়া না ফেরে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা দোকানীর কর্তব্য।

সাহেবী দোকানের অনুকরণে ইদানীং কোনো কোনো দিশি দোকানে (বিশেষতঃ কাপড়ের দোকানে, কাপড় কিনিতে অনেক সময় যায়) ভদ্রতা পরিবেশন সুরু হইয়াছে। কেবল মিষ্ট হাসি নহে, পান-সিগারেটের বন্দোবস্তও থাকিতে দেখা যায়। কাউন্টারে এদেশে এখনো নারীর আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং হাসিটা ঠিক রমণীয় হয় না বলিয়া তাম্বূলাদির আয়োজন রাখিতে হয়। আপনি দোকানে প্রবেশ করিতেই পাঁচ-ছয় জোড়া বিকশিত দন্তপঙ্‌ক্তি আপনাকে অভ্যর্থনা করিবে। ভাবটা, আপনি কালেভদ্রে এখান হইতে দু-এক গজ লংক্লথ কিনিয়া লইয়া যান বলিয়াই না উহারা এখন পর্যন্ত কোনো প্রকারে টিকিয়া আছে। একটি বিষয়ে কিন্তু সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার। যদি পাসিং-শো খাইবার অভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে নিজের একটি ধরাইয়া দোকানে প্রবেশ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

এযাবৎ কেবল বিক্রেতার কথা বলিয়াছি। এবার অপরপক্ষ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলি। ক্রেতার দিক হইতে যে একেবারেই কোনো ত্রুটি নাই, তাহা নহে। তাঁহাদেরও কোনো কোনো বিষয়ে দোষ দেখা যায়। মূল্যের ব্যাপারটাই ধরুন। দেড় টাকা চাহিলে চোদ্দ পয়সায় দিবে কিনা এইরূপ বিজাতীয় অনুসন্ধান না করাই ভালো। উহাতে কোনো পক্ষের সুবিধা হইবার কথা নহে, বরং বৃথা সময়ের অপচয়। এ বিষয়ে মেয়েদেরই বেশি নির্লজ্জ হইতে দেখা যায়। মেয়ে মাত্রেরই ধারণা, তাহার চটকে (সে যে-কারণেই হউক) ষোলো আনা হইতে বারো আনাই ঠিকরাইয়া পড়িবে।

মেয়েদের আর একটি দোষ দেখা যায় দ্রব্য নির্বাচন ব্যাপারে। ইঁহারা কী চান তাহা জানেন না, কী চান না, তাহাই কেবল বলিতে পারেন। ফলে, কাপড়ের দোকানে শাড়ির উপর শাড়ি পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠে, স্টেশনারি দোকানে হরেক রকম জিনিসে কাউন্টার বোঝাই হইয়া যায়, জুতার দোকানে গিয়া আবিষ্কৃত হয়, ঠিক তাঁহার পছন্দ-মাফিক জোড়াটিই এখন পর্যন্ত তৈরি

হইয়া আসে নাই। আপনি যদি ইঁহার সাথী হইয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে লজ্জিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যদি একটা কিছু সমাধা তাড়াতাড়ি করাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় বলেন, "এই শাড়িটাই নাও না," শুনিবেন, উহার পাড়টি অত্যন্ত বোকা-বোকা। "তাহলে এটা?" উহার রঙের বোকামিটা আরো ঘোরতর। শাড়ির অরণ্যের মধ্যে চালাক শাড়িটি আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। জুতা কিনিতে গিয়া যখন দোকানের সমস্ত বাক্সগুলি নামানো হইয়া গিয়াছে, তখন দেখিবেন, আপনার সঙ্গিনী অম্লানবদনে বলিতেছেন, পাশের দোকানটা দেখে আসি। সেখানে আবার সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। এই সময়ে বাহিরে আসিয়া যদি দুই দোকানের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ান, তাহা হইলে দেখিবেন, এক দোকানে জুতা র‍্যাকের উপর উঠিতেছে, আর দোকানে জুতা র‍্যাক হইতে নামিতেছে।

ক্রেতার আর ক'টি দোষ উল্লেখযোগ্য। সেটি হইল জিনিস অন্যায়ভাবে পরীক্ষা করা। স্নো কিংবা ক্রীম কিনিতে গিয়া পট্‌ হইতে এক খাবলা আঙুলে উঠাইয়া লওয়া (মেয়েরা হয়তো একটু মাখিয়াও দেখেন), চিরুনির ধার নির্ণয়ের জন্য উহা মাথার চুলে চালাইয়া দেখা, ব্লেড কিনিতে গিয়া মরিচার সন্ধানে মোড়কটি আদ্যোপান্ত খুলিয়া ফেলা, টুথব্রাশটি ভোঁতা কিনা বুঝিবার জন্য হাতের তেলোতে ক্ষৌরকারের ক্ষুর চালানোর পদ্ধতিতে বারকতক ঘষিয়া দেখা ইত্যাদি। যদি অপছন্দ হয়, জিনিসগুলি অল্পবিস্তর নষ্ট হইয়া রহিল, তাহাতে দোকানীর ক্ষতি। এটুকু বিবেচনা ক্রেতার থাকা উচিত, এবং জিনিস পরীক্ষার সময় কোনো ক্ষতিকর প্রণালী অবলম্বন করা কখনোই শোভনীয় নহে।

জিনিস দেখিয়া বেড়ানো কোনো কোনো ব্যক্তির ব্যসন। কিনিবার উপস্থিত বাসনা কিংবা শক্তি নাই, তবে নয়নানন্দটাই মন্দ কি? অনেক অবসর-প্রাপ্তগণ বাজারে বেড়াইতে যান। চাউলের দর কত চড়িল, ইলিস মৎস্যের আয়তন আরেকটু বাড়িল কিনা, নূতন গুড় কবে উঠিবে ইত্যাদি মহামূল্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা বাড়ি ফেরেন। দোকানে দোকানে কাচের আলমারি দেখিয়া বেড়ানোটাই খুব নির্দোষ আমোদ। ঘ্রাণে ও দর্শনে অর্ধেক ভোজ হইয়া যায়। কিন্তু যাহারা না-বাজার না-দোকান অর্থাৎ যাহারা ফেরিওয়ালা, তাহাদের পক্ষে এই ব্যসন অত্যন্ত মারাত্মক। হরেকরকম ছিট এবং বহুবিধ কটাহ সন্দর্শনের পর গৃহিণী অত্যন্ত নির্বিকার চিত্তে দ্বাররুদ্ধ করিয়া কার্যান্তরে

মনোনিবেশ করিলেন। ফেরিওয়ালার বহু সময় নষ্ট হইল। একখানি জিনিসও বিকাইল না। তবে, মুটেটার কিছুটা বিশ্রাম হইল।

বোধ হয় মমতাময়ীর উহাই আসল উদ্দেশ্য ছিল।

আধুনিকা

যাযাবর

পশ্চিমের শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারা আমাদের দেশে এনেছে নূতন আবেষ্টন। তার ফলে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের কর্মে এবং চিন্তায়। আমাদের আহার, বিহার, বসন, ভূষণ বদল হয়েছে। বদল হয়েছে রীতি, নীতি ও ধ্যান-ধারণা। এতকাল নারীকে আমরা শুধুমাত্র পুরুষের আত্মীয় রূপেই দেখেছি। সে আমাদের ঠাকুমা, দিদিমা, মাসি, পিসি, দিদি, বৌদি কিংবা শ্যালিকা। কিন্তু জননী, জায়া এবং অনুজা ছাড়াও নারীর যে আরও একটি অভিনব পরিচয় আছে, সে সম্পর্কে আমরা বর্তমানে সচেতন হয়েছি। তার নাম সখী।

প্রাণিজগতের মতো মনোজগতেরও বিবর্তন আছে। তার ফলে বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি বা নীতির মূল্য সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। নারীর মূল্যেরও যুগে যুগে তারতম্য ঘটেছে।

একদা সমাজে মায়ের স্থান ছিলো সর্বপ্রধান। সেদিন পরিবার-পরিচালনা থেকে বংশ-পরিচয় এবং উত্তরাধিকার নির্ণীত হতো মাতার নির্দেশ, সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক দিয়ে। ক্রমে এই ম্যাট্রিয়ার্কল ফ্যামিলি বিলুপ্ত হলো। রাজমাতার চাইতে রাজরানীর মর্যাদা হলো অধিক। সাধারণ পরিবারেরও পরিধি পরিমিত হলো। সংসারের কর্ত্রী হলেন জননী নয়, গৃহিণী। ছেলেরা মায়ের কোল ছেড়ে বউএর আঁচলে আত্মসমর্পণ করলো।

বলা বাহুল্য, এই হস্তান্তরের ফলে মায়েরা খুশি হলেন না। কেউ কেউ অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ফল হলো না। হার হলো তাঁদেরই, শুধু বউকাঁটকী শাশুড়ী আখ্যা পেয়ে নাটক-নভেলে তাঁরা নিন্দিত হলেন। যাঁরা বুদ্ধিমতী, তাঁরা কালের লিখন পাঠ করলেন দেয়ালে, মেনে নিলেন অবধারিত বিধি। নিঃশব্দে,—কিন্তু স্বচ্ছন্দ চিত্তে নয়। জগতের সমস্ত বিক্ষুব্ধ মাতৃকুলের অনুক্ত অভিযোগ আজও জেগে রইলো বধূশাসিত আধুনিক গৃহের বিরুদ্ধে। য়ুরোপ ও আমেরিকার সমাজে পত্নীকর্তৃত্ব পুরোপুরি স্বীকৃত। বিবাহের পরে ছেলের সংসারে তার মায়ের স্থান নেই, কিংবা থাকলেও সে স্থান উল্লেখযোগ্য

নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের লুপ্ত-অকারচিহ্নের মতো তাঁর অস্তিত্ব আছে, গুরুত্ব নেই।

কিন্তু স্ত্রী বলতে যেদিন ভাবী সন্তানের গর্ভধারিণী বা গৃহকর্ত্রী মাত্র বুঝতেম, সেদিনও বিগত। স্ত্রীর মধ্যে চাই সচিবঃ সখী মিথ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। কিন্তু একজনের কাছে এতখানি প্রত্যাশা করা শুধু কালিদাসের কাব্যেই শোভা পায়, বাস্তবক্ষেত্রে নয়।

এ যুগের পুরুষের কাছে ঘরের চাইতে বাইরের ডাক বেশী। সে দশটা-পাঁচটায় আপিসে যায়, কারখানায় খাটে, শেয়ার-মার্কেটে ঘোরে। সেখান থেকে টেনিস, রেস, কিংবা মিটিং। রাত্রিতে ক্লাব, অথবা সিনেমা। এর মধ্যে গৃহের স্থান নেই, গৃহিণীরও আবশ্যকতা নেই। আগে সস্ত্রীক ধর্মাচরণ করতে হতো। যাগ-যজ্ঞ-ব্রত-পার্বণে প্রয়োজন ছিলো ভার্যায়। কিন্তু ধর্ম এখন শুধু ইলেকশনে ভোট সংগ্রহ ছাড়া ভারতবর্ষেও বড়ো একটা কাজে লাগে না। তাই এ যুগে সহধর্মিণীর চাইতে সহকর্মিণীকে নিয়ে বেশি রোমান্স লেখা হয়।

পুরুষের জীবনে আজ গৃহ ও গৃহিণীর প্রয়োজন সামান্যই। তার খাওয়ার জন্যে আছে রেস্তোরাঁ, শোয়ার জন্য হোটেল, রোগে পরিচর্যার জন্য হাসপাতাল ও নার্স। সন্তান-সন্ততিদের লালনপালন ও শিক্ষার জন্য স্ত্রীর যে অপরিহার্যতা ছিলো বোর্ডিং-স্কুল ও চিলড্রেনস-হোমের উদ্ভব হ'য়ে তারও সমাধা হয়েছে। তাই স্ত্রীর প্রভাব ক্রমশঃ সংকুচিত হ'য়ে ঠেকেছে এসে সাহচর্যে। সে পত্নীর চাইতে বেশিটা বান্ধবী, সে কর্ত্রীও নয়, ধাত্রীও নয়,—সে সহচরী।

নারীর পক্ষেও স্বামীর সম্পর্ক এখন পূর্বের ন্যায় ব্যাপক নয়। একদিন স্বামীর প্রয়োজন মুখ্যতঃ ছিলো ভরণ, পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের। কিন্তু এ-যুগের স্ত্রীরা একান্তভাবে স্বামী-উপজীবিনী নয়। তারাও দরকার হ'লে আপিসে খেটে টাকা আনতে পারে। তাই স্বামীর গুরুত্ব এখন প্রধানতঃ ভর্তারূপে নয়, বন্ধুরূপে।

ভারতবর্ষও এই নব ভাবধারার বন্যাকে এড়িয়ে থাকতে পারে নি। ঢেউ এসে লেগেছে তার সমাজের উপকূলে। আমাদেরও পরিবার ক্রমশঃ ক্ষুদ্রকায় হচ্ছে, আত্মীয়-পরিজনের সম্বন্ধ সংকীর্ণ হচ্ছে। গ্রাম্য সভ্যতার ভিত বিধ্বস্ত, কলকারখানাকে কেন্দ্র ক'রে নগর-নগরীর বিস্তৃতি ঘটছে ধীরে ধীরে। তার সঙ্গে নূতন সভ্যতা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন জীবন-ধর্মের উদ্ভব অপরিহার্য।

এদেশেও পুরুষের জীবনে এবার আবির্ভূত হয়েছে সখী; নারীর জীবনে সখা। সেটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক করতে পারো, মনু পরাশর উদ্ধৃত

ক'রে মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখতে পারো। কিন্তু তাকে ঠেকাতে পারবে না।

স্ত্রী-পুরুষের জীবনে সখাসখীর যে উপলব্ধি, তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সমাজকর্তারা একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু পতিকে পরমগুরু এবং পত্নীকে সেবিকা বানিয়ে দাম্পত্যে তাঁরা সখীত্বের অবকাশ রাখতে পারেন নি। ট্রান্সফার্‌ড এপিথেটের মতো সেটা পুরুষের পক্ষে বউদি এবং স্ত্রীর পক্ষে দেবরের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। সংসারে এর চাইতে মধুরতর সম্পর্ক আমার জানা নেই।

সীতার সাথী ছিলেন লক্ষ্মণ, তাঁর অপর কোনো বন্ধুর প্রয়োজন ছিলো না। বুড়ো হ'লেও ঋষি বাল্মীকি সে-কথা জানতেন। পাঞ্চালীর পাঁচ-পাঁচটা স্বামী থাকতেও একটি দেবরের অভাব ঘোচেনি। তাই বেদব্যাসকে আনতে হলো,—শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দ্রৌপদীর সখা,—সংকটে শরণ্য এবং সম্পদে স্মরণীয়।

এ-যুগে জীবনযাত্রার উপচার বহুবিধ এবং ব্যয়সাধ্য। যে-লোক দু'শ' টাকা পায় তার পক্ষে বউকে কাছে রাখাই কঠিন, বউদি দূরে থাক। মেয়েরাও জানেন, পণের টাকা ও সোনার হার না হ'লে বরই জুটবে না অনেকের, দেবর তো পরের কথা। তাই আধুনিকারা ঘা খেয়ে মন দিয়ে মেনে নিয়েছেন যে, বেশি আশা ক'রে ফল নেই, একটি নির্ভরযোগ্য সহৃদয় বন্ধু পেলেই ভাগ্য। আধুনিকেরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছেন যে, অনেক লোভে লাভ নেই, তার চেয়ে বরং চাই শুধু একটি বান্ধবী। প্রিয়বান্ধবী।

কিন্তু সাধারণ হিন্দু পরিবারে অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বের পথ উন্মুক্ত নয়। সাধারণ মুসলমান পরিবারেরও নয়। সেখানে বান্ধবীর স্বীকৃতি মাত্র নেই। সেখানে পুরুষের জীবনে প্রথম যে অনাত্মীয়া নারীর সান্নিধ্য ঘটে, তিনি নিজের স্ত্রী। তাই ক্লাবে-পার্টিতে বিলাত-ফেরত ও বড় চাকুরেদের ড্রয়িংরুমে তরুণের দল আসে। কাউকে ডাকে ললিতাদি, কাউকে বলে বীণাবউদি, কাউকে বা শুধু পদবীর আগে 'মিস্' বা 'মিসেস্' জুড়ে দিয়ে সম্বোধন করে—মিস্ গুপ্ত. মিস্ আয়েঙ্গার বা মিসেস্ সোনেরা জাহীর।

মধুসংহিতা

সুবোধ ঘোষ

ওঁ মধু। মধু। মধু।

মন্ত্রোচ্চারণ করছি না, নিছক পেটুকে আহ্বান। মধু নামে একটি খাদ্য-বস্তুকেই অভিনন্দন জানাই। পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে মধুর চেয়ে রোমান্টিক খাদ্য আর কি হ'তে পারে? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাসায়নিকের জ্ঞানের অহংকারকে খর্ব ক'রে দিয়ে একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গ আজও পৃথিবীর কুঞ্জে-কাননে যে রসাল কীর্তি রচনা ক'রে চলেছে, তারই দানের গুণে যুগ যুগ ধ'রে মানুষের গলা মিষ্টি হয়েছে। কবি সেক্সপীয়ারের কাছে আমাদের এই ক্ষুদ্র পতঙ্গটি শ্রদ্ধা আদায় ক'রে ছেড়েছে—

...... So work the honey bees,
Creatures that, by rule in nature, teach
The art of order to a peopled kingdom

মধুপ্রীত কবি ভার্জিল হুলায়ুধ মৌমাছিকে 'কালো আঙুর' ব'লে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

জীবনের সর্ব আচরণে আমরা আন্তরিকভাবে মধুরতাকে কামনা করি। ওঁর স্বভাব মধুর, তাঁর দৃষ্টি মধুর, ছোটো ছেলেটির হাসি কী মধুর! মানুষের জীবনের যত প্রাপ্য ও কাম্যের প্রকৃতিকে অজস্র ভাষা দিয়েও যখন বুঝিয়ে উঠতে পারি না, তখন একটি মাত্র উপমা দিয়ে তা প্রকাশ ক'রে ফেলি—মধুর। সকল মনের মাধুরী মিশায়ে মানুষ একমাত্র তাকেই রচনা করতে চায়, জীবনের ঊর্ধ্বলোকে যা অপ্রত্যক্ষের রহস্য হ'য়ে আছে। চরন্ ইব মধু বিন্দতি—যুগ যুগ ধ'রে আমরা যে এগিয়ে চলেছি তার প্রাপ্তি ও আনন্দ একমাত্র মধুর সঙ্গেই তুলনীয়।

মধু আমাদের জীবনের মাঙ্গলিক উপচারের মধ্যে একটি। রাজ-অভিষেকের কাজে মধু চাই, শিশুর জাতকৃত্যে মধু চাই। কবি ভার্জিল মধুর বন্দনা করেছেন। মধু ও মধুপতঙ্গ আরিস্টটলের প্রিয় ছিলো, মেটারলিঙ্ক জীবনের দর্শনকেই

মধুময়রূপে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন।

সারা পৃথিবীর আয়ুঃশাস্ত্রী পণ্ডিত ও চিকিৎসকের দল মুক্তকণ্ঠে মধুর মহিমাকে স্বীকার ক'রে গেছেন। আয়ু-কান্তি-মেধা—জীবনের স্বরূপকে সুন্দর করার আয়োজনে মধুর চেয়ে মধুরতর কিছু আর হ'তে পারে না। আমাদের ভাষায় 'মধু' আজও নিরুপম হ'য়ে রয়েছে, মধুর সঙ্গে আমরা অন্যকে তুলনা করি, মধুকে কারও সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

মধুকে নিছক খাদ্য আখ্যা দিলে যেন এর গৌরবকে ছোটো করা হয়। আধুনিক রাসায়নিকের লেবরেটরীতে হাজার টন নকল শর্করা তৈরী হ'তে পারে, কিন্তু 'মধু' হবে না। মানুষের বুদ্ধির চেয়ে একটি ছোটো পতঙ্গের প্রবৃত্তি যে সূক্ষ্মতায় ও দক্ষতায় এখনো কত বেশি উন্নত হ'য়ে আছে, তার প্রমাণ এই মধু। দিনের আলো দেখা দিতে-না-দিতে এই কোটি কোটি পতঙ্গ-কেমিস্টের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চাক ছেড়ে উড়ে চ'লে যায় দূরে ও সুদূরে—বনে উপবনে। ডি-এস্‌সি ডিগ্রী নেই, তবুও ফুলের বুকে কোথায় তার মধুময় আত্মাটি লুকিয়ে আছে, তার সন্ধান বিনা মাইক্রোস্কোপে খুঁজে বার করে। নিরাস্বাদ জগৎ থেকে এক বিচিত্র স্বাদুতা আহরণ ক'রে নিয়ে যায়। জড় ও জঙ্গমের জগতে এক গোপন পদার্থলীলাকে সে বন্দী করে, সুললিত করে, তাকে মধুতে পরিণত করে। মধুর মধ্যে তাই যেন মহাকাব্যের আস্বাদ আছে।

একটা আশঙ্কার বিষয়, আমাদের মধ্যে তবুও মধু সম্বন্ধে একটা উদাসীনতা এসেছে। আগে ছিলো না, এটা বর্তমানের লক্ষণ। এই লক্ষণটা যেন পরোক্ষ-ভাবে আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক দীনতাটুকু স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুকে খাদ্য হিসাবেও আহ্বান করতে আমরা আজ ভুলে গেছি। স্যাকারিন-উপাসনার যুগে আমাদের এ ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু এ ভুল বড়ো ভয়ানক ভুল। মধু কালচার ঠিক ঔদরিক কালচার নয়। এর সঙ্গে ফুলের বন জড়িয়ে আছে। কমল-বন আছে। শিল্পীর সৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে কোমল উপকরণ নবনীত-সদৃশ মোম এর সঙ্গে সঙ্গে আছে। মৌমাছির জীবনে জৈব প্রবৃত্তির এক বিরাট প্রকাশ রয়েছে। মৌচাকের গঠনে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি। মৌচাকের অভ্যন্তরে সমাজ রয়েছে, যে সমাজের রীতি-নীতিতে কত বিচিত্র সত্য কাজ করছে। দেখবার, শিখবার ও বুঝবার মতো এক পরম গবেষণার আধার এই মৌচাক।

গান্ধীজী বলেছেন মানুষের শ্রমের আদর্শ হবে মৌমাছির মতো। মানুষের

তৈরী পণ্য হবে মধুর মতো—পৃথিবীর কোনো ফুলের প্রাণকে আঘাত না ক'রেও তারই ভেতর থেকে প্রয়োজনের পণ্য সৃষ্টি হ'তে পারে। একমাত্র এই পণ্যই নিষ্কলঙ্ক পণ্য। মানুষের শ্রম হবে মধুকরের শ্রম—এই শ্রমের মধ্যে শিল্পীর সাধনা, গানের গুঞ্জন, কাব্য, বিজ্ঞান-বিচিত্রতা, সামাজিকতা, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সাম্য—একই বিধানে মিশে আছে। একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ কাজের জীবনের আদর্শ। কাজের মধ্যেই গান, কাজের মধ্যেই শিল্পসৃষ্টি, কাজের মধ্যেই রোমান্স।

গান্ধীজী প্রবর্তিত গ্রাম-উদ্যোগের মধ্যে মৌমাছি পালন অন্যতম বিষয়। এই নূতন শিল্পটির একটি বড়ো অর্থ আজ আমরা নতুন ক'রে উপলব্ধি করতে পারি। একটি পুষ্টিকর খাদ্যবস্তুকে শুধু বেশি ক'রে পাওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টা নিশ্চয় নয়। শ্রম ও রুচির একটি বড়ো আদর্শকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার সুযোগ এর মধ্যে রয়েছে। সব খেয়ালের বড়ো খেয়াল, সবচেয়ে সুন্দর hobby, বিজ্ঞানে ও কবিত্বে মণ্ডিত এই একটি খেলা যদি ঘরে ঘরে সত্য হ'য়ে উঠে, জাতির মন কী মধুর ঐশ্বর্যে ভ'রে উঠবে, তা অনুমান করতে পারি।

জানি না, চৌষট্টি কলার মধ্যে মৌমাছি-পালনের স্থান আছে কিনা। কিন্তু মানুষের মনের ধর্মের উপযোগী এর চেয়ে বড়ো আর্ট আছে ব'লে মনে হয় না। মৌমাছির মতো ফুলবিলাসী রাগী পতঙ্গও তার প্রবৃত্তি ভুলে যায় যে মমতার খেলায়, যে খেলার প্রয়োজনে ঘরের আঙিনায় যুঁই, গন্ধরাজ ও গাঁদা ফুলের বর্ণ ও সৌরভকে আমন্ত্রণ করতে হয়, এ হলো সেই খেলা। অ্যালসেসিয়ান আর টেরিয়ার পুষে ফ্যাশানের পরীক্ষা আমাদের হ'য়ে গেছে। একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি—Bee-Culture আমাদের কালচারকে ছোটো করে না বড়ো করে ?

বই হারানো

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বই কেনা ও বই পড়ার নিয়মিত অভ্যাস যাঁদের আছে, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে বই হারানো ব'লেও একটা বিশেষ ব্যাপার আছে, যার হাত থেকে কারুর অব্যাহতি নেই। কোথা দিয়ে কখন যে কোন বইটা হারায় এবং একবার হারালে আর সেটা পূর্ব মালিকের হাতে কেন যে ফিরে আসে না, এ আমার কাছে চিরদিনই একটা রহস্য। এ থেকে আমার ধারণা হয়েছে এই যে বই জিনিসটা আসলে সচল—ওর ধর্মই হচ্ছে এক হাত থেকে আর এক হাতে, তা থেকে আবার আর এক হাতে খালি উড়ে-উড়ে বেড়ানো। যত সাবধান হ'য়েই থাকুন এবং যেমন খুশি মনোযোগ দিয়েই আগলে রাখুন, একদিন দেখবেন, সমস্ত অবরোধ ভেঙেই কোথা দিয়ে দু-চারখানি বই ভেগেছে এবং তা আজো গেছে, কালও গেছে। গোটা পৃথিবীটা হাতড়ালেও আর তাদের পাত্তা পাবেন না।

যখন থেকে সাহিত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ, তখন থেকেই সুরু হয়েছে এই বিভ্রাট এবং যতদিন বাঁচবো, ততদিনই এটা চলবেও সমান বেগে। তাই এ নিয়ে আর নালিশ নেই। তবে সময় সময় দুঃখ পাই প্রচুর এবং বাড়ির সকলকে, বিশেষ ক'রে স্ত্রীকে সাময়িক ভাবে বিব্রত ক'রেও তুলি রীতিমতো ভাবে। হঠাৎ কোনোদিন অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই একটা বইয়ের স্মৃতি মনকে পেয়ে বসে, মনে হয় সেটা তখনি না পেলে নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ঠিক সেই বইটিই আর পাওয়া যায় না। আলমারি, ড্রয়ার, টেবিল, চৌকির তলা, সুটকেশ, কাগজের বাক্স, সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গা তোলপাড় ক'রে ফেলি, বাড়ির ছেলেমেয়েদের ধমকাই, গৃহিণীকে বকুনি দিই, বইয়ের মূল্য বা মর্যাদা যারা বোঝে না, কোন বইটা কখন দরকার হ'তে পারে সে ধারণাই নেই যাদের, যারা মনে করে, ছাতা, হারিকেন বা স্টোভের মতো সংসার-জীবনে বইয়ের একটা অপরিহার্যতা নেই, তাদের উদ্দেশে কটূক্তি করি এবং অন্যের বই ব'লে বা না ব'লে যারা নিয়ে যায় এবং তা ফেরত দিয়ে যেতে যাদের হয় উৎসাহ

থাকে না, নয় ইচ্ছে থাকে না, তারা যে আসলে বই পড়ে না, এ-কথাও যথেষ্ট তর্জন-গর্জন সহকারেই বোঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মনটা স্থির হ'য়ে যায়, পড়বার স্পৃহাটাও হ'য়ে আসে স্তিমিত এবং হারানো বইটাকে বাতিলের দলে ফেলে দিয়েই নিশ্চিন্ত হই। বলা বাহুল্য এর পর সে বইটি পাওয়া গেলেও আর লাভ নেই, কারণ পড়ার যে নেশাটা জন্মেছিলো ভেতর থেকে, এখন বাইরে থেকে তাকে খুঁচিয়ে তুলতে হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি, মন তাতে নারাজ। সে মেজাজটাই থাকে না আর। তবে সৌভাগ্য এই যে পাওয়া খুব কমই যায় এবং নিজে থেকেও হারানো বইগুলোর জায়গা খুব কমই পূরণ করা হ'য়ে থাকে—অর্থাৎ যা যায়, তা চিরদিনের জন্যেই যায়।

পূরণ হবে কি ক'রে? কোনো বইটা দিয়েছিলেন কোনো সাহিত্যিক বন্ধু—তাঁর স্বহস্ত-লিখিত প্রীতির স্মারকচিহ্ন স্বরূপ। কোনোটা এসেছিলো সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে সমালোচনা ক'রে দেবার জন্যে। কোনোটা চলতি পথের একান্তে স্তূপীকৃত বাজে বইয়ের আবর্জনা ঘাঁটকে অল্প মূল্যে সংগৃহীত হয়েছিলো। কোনোটা বা পাওয়া গিয়েছিলো কোনো গুণমুগ্ধ ব্যক্তির সাদর উপহার স্বরূপ। এ-ছাড়া নগদ মূল্যে কেনা, কিস্তিতে কেনা, ডাকখরচা দিয়ে বাইরে থেকে আনানো বইও জমা হয়েছিলো নেহাত কম নয়। এর কতক পড়া, কতক আধ-পড়া, কতক বা কোনো অনিশ্চিত ছুটির অপেক্ষায় অপঠিত মমতায় রক্ষিত। কিন্তু হায় রে মানুষের আহরণী বুদ্ধি, এই পুঁজি ভেঙেই লোকে বই সরায় এবং কেমন ক'রে সরায় তা টেরও পাই না আমি।

আপনারা হয়তো এতক্ষণে বুঝেছেন যে বই আমি কারুকে ধার দিই না। অন্ততঃ নীতি আমার তাই। আমাদের দেশে অধিকারী-ভেদ ব'লে কোনো কথা নেই—বই দেখলেই দেশসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষের হাত সুড়সুড়িয়ে উঠে। দুঃখের বিষয় পড়বার শক্তি তাঁদের নেই, মানে পড়ে রস পাবার, অথচ নিয়ে যাবার লোভটি আছে—কাজেই মলাট ছিঁড়ে, নস্যি বা পানের ছোপ লাগিয়ে, কোনো জায়গায় beautiful, নয়তো rubbish, নয়তো '—লেখক' এমনি কোনো অমূল্য মন্তব্য খোদাই ক'রেই তাঁরা দায় সেরে থাকেন। তারপর ক্রমাগত তাগাদা চালাতে পারলে, হয়তো সেই খণ্ড-বিখণ্ডিত বই ফিরে আসবে, আর ভুলে গেলেন তো আপদ চুকেই গেল। হ্যাঁ, নিজের চাড়ে যিনিই নিয়ে যান বই, ফেরত আনার চাড় কিন্তু আপনার। তাও তাগাদা দিলেই ঘরের বই ঘরে ফিরবে, এমন নিশ্চয়তা নেই—কারণ আপনার কাছ থেকে বই নিয়ে গিয়ে তাঁরা যে

আবার তা sublet ক'রে বসে আছেন। নির্লজ্জতার সঙ্গেই জানাবেন যে উক্ত ভদ্রলোক বা সম্ভবস্থলে ভদ্রমহিলা আবার তা আর-একজনকে পড়তে দিয়েছেন। এইভাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, টেরই পাওয়া যায় না।

এইজন্যেই আমি কারুকে বই ধার দিই না। নিতান্ত অসভ্যের মতোই জানাতে বাধ্য হই যে প্রার্থিত বইগুলো উপস্থিত আমার দরকার—একটা প্রবন্ধ লিখছি, নয়তো সমালোচনা লিখবো। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হয় না। কেউ অতি আত্মীয়তা ক'রে বলেন, আরে, সে হবে'খন, লিখছেন তো হরদমই—দু-দিন পরেই লিখবেন, দুটি দিন মাত্র, এর মধ্যেই আমি পড়ে শেষ ক'রে ফেলবো। ব্যস, এইখানেই শেষ। এরপর আমাকে নিতে হবে তাঁর পিছু এবং তিনি তখন শেলির spirit of delight, rarely rarely 'cometh he'! কেউ বা বলবেন, আচ্ছা, শনিবার দিন আসছি—এর মধ্যেই কাজ সেরে রাখবেন কিন্তু। যেন আইনতঃ আমি বাধ্য ঐ সময়ের ভেতর আমার কাজ সেরে, তাঁর গ্রহণের জন্যে বইগুলি মোতায়েন রাখতে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে তিনি ঠিকই আসবেন এবং বইগুলির কথাও ভুলবেন না। মজার কথা এই যে একখানা বই হ'লেই চলবে না, একসঙ্গে একগাদা না হ'লে এঁদের কারুরই পেট ভরবে না, আর ফেরত দেবার নীতিও এঁদের সকলেরই এক। অর্থাৎ এঁদের হাত থেকে বই বাঁচানো রীতিমতো বেহায়া হ'য়েও আমার সাধ্যাতীত!

কিন্তু এঁরা তবু চেয়ে নেন, কাজেই এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অনেকে আছেন, দয়া ক'রে যাঁরা জানাবারও দরকার বোধ করেন না। তাঁরা আসেন মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে, নয়তো আত্মীয়তার ছুতোয় নিজেদের বড়-মানুষীর কাহিনী কীর্তন করতে এবং যাবার সময় বহুমূল্য উপস্থিতি দানের বিনিময়ে হঠাৎ থাবা মেরে খানকতক বই উড়িয়ে নিয়ে যান র‍্যাক অথবা টেবিল থেকে—যেন উঠানের নটের শাক ছিঁড়ে নিলেন, যার জন্য কোন কৈফিয়তের দরকার নেই। কোনোটা পড়তে পড়তে রেখে গেছি, কোনোটা সমালোচনা করছি, কোনোটা এনেছি কারুকে উপহার দোব বলে—কোনোটা লেখকের অনুরোধে নূতন সংস্করণের জন্যে সংশোধন করছি, ফিরে এসে দেখি নেই, বেবাক খোয়া গেছে। মেয়েদের ওপর তম্বি করবো সে ভাগ্যও করিনি। পরম ঔদাস্যের সঙ্গেই বলবেন কেউ, তার হয়েছে কি? গেলোই বা দু-খানা বই নিয়ে, খেয়ে তো আর ফেলবে না। যদি বোঝাতে চাই যে বই খাবে না, খাবে আমার মাথা, তাহলেই গৃহিণী বলবেন, কে জানে বাপু, বইয়ের খবর রাখতে পারি না অত। টাকা নয়,

ধন-দৌলত নয় যে আগলে রাখবো—কাগজের পাহাড়, ইঁদুর, উই, আর আরশোলার ডিপো, ঘরের জঞ্জাল, ও থাকলেই কি, আর গেলেই কি? আগেই বলেছি যে বই স্টোভ নয় যে জল-গরমে লাগবে, ছাতা নয় যে রোদে-বৃষ্টিতে মাথা বাঁচাবে, সুতরাং আমারই হার। মুখ কালো ক'রে ভাবি, শিশি-বোতল-ওয়ালাকে ধ'রে বাকি বইগুলো বিক্রি ক'রে ফেলবো। ও-আপদ আর রাখবোই না ঘরে। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই আবার জমে ওঠে বই। নসীবকে ধন্যবাদ যে এক হাতে দান ও আর এক হাতে হরণ ক'রে তিনি বরাবরই আমার ভাড়াটে বাড়ির ভারসাম্য রক্ষা ক'রে থাকেন, নইলে আরো কি বিপদই না ঘটতো।

অবসর সময়ে মাঝে মাঝে ভাবি, এই হারানো বইগুলো যায় কোথায়? একদিন যা পড়েছি অগাধ আনন্দ নিয়ে, কারুর খোলা পৃষ্ঠার ওপর মাথা রেখে কেঁদেছি শিশুর মতো, হয়তো করেছি কোনো জায়গায় মতামত নিয়ে তীব্র সমালোচনা, নয়তো লিখেছি কোথাও কোনো নোট, কোনোদিন ব্যবহার করবো ব'লে এবং তা আর করা হ'য়ে ওঠেনি—হয়তো কোনো একটা অংশে দাগ দিয়ে রেখেছি বুঝতে না পেরে, সেই সমস্ত কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, ইতিহাস ও দর্শন-বিজ্ঞানের রাশি রাশি নূতন পুরানো স্বদেশী বিদেশী বইগুলো যায় কোথায়? বেশ বুঝতে পারি, আমার হাত থেকে যাঁর যাঁর হাতে পড়েছিলো, সেখানেই তারা স্থির হ'য়ে নেই, উড়ো পাখির মতো তারা শুধু উড়ে-উড়েই বেড়াচ্ছে! এক শাখা থেকে আর এক শাখায় বসা, সে তাদের মুহূর্তের খেয়াল, আসলে তারা হলো অসীম শূন্যের জীব। আকাশে-আকাশেই তাদের চলাফেরা। বৃথা মমতায় আমরা তাদের ওপর খাটাতে যাই মালিকানা, আমাদের সেই অহমিকা চূর্ণ ক'রেই একদিন তারা পালায়, এবং কোথায় পালায় তা আর জানা যায় না।

অবশ্য হারানো বই দু-একটার সাক্ষাৎ আর কখনো পাইনি এমন নয়। পথের পুরানো দোকানে একদিন দেখলাম বিয়র্নসনের নাট্য-গ্রন্থাবলী—মলাট ওলটাতেই চোখে পড়লো একটি নাম, যা শিরিষ কাগজ দিয়ে উঠানোর চেষ্টা ক'রেও বেয়াড়া ভাবে বেঁচে রয়েছে। বলুন তো কে সে? দ্বিতীয় বারের জন্যে কিনে আনলাম, কিন্তু আবার পালালো এবং এবার বেপাত্তা পলায়ন। আর একবার একটি বন্ধু এলেন খানকতক মোটা মোটা second hand বই বেচতে। বললেন, বড়ো অভাব, বইগুলো রেখে আর কি করবো? শুধু ঘরের ভার বৃদ্ধি।

কিন্তু একদিন সখ ক'রে কিনেছিলাম—আপনি গুণী লোক, আপনার হাতে পড়লে তবু মনটা খুশি থাকবে, জানবো, অপাত্রে পড়েনি। কিনলাম। তার ভেতর থেকে বেরুলো আমারই পরলোকগত এক বন্ধুর নাম-লেখা দু-খানা গ্রীক কবিতার অনুবাদ-সংকলন, যা একসময় তাঁর কাছ থেকে এনে পড়েছিলাম। অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলাম, এ দুটো বই ওঁর হাতে পড়লো কি ক'রে? অনেকক্ষণ ধ'রে উল্টে-পাল্টে দেখলাম, কয়েকটা কবিতা দুজনে একসঙ্গে পড়েছিলাম, সেগুলোর মার্জিনে এখনো রয়েছে আমাদের হাতের লেখা নোট। কোথায় সেই বন্ধু, যিনি বাঁচলে আর কিছু না হন, অন্ততঃ আমার চেয়ে ভালো সাহিত্যিক হতেন। কিন্তু আশ্চর্য এই দুটি বই কিছুদিন পরেই আবার উধাও হলো। একজন কবি নিয়ে গেলেন অনুবাদ করতে—হয়তো নেপথ্যে অনুবাদ তাঁর সম্পূর্ণও হয়েছিলো, কিন্তু মূল আর মালিকের হাতে ফিরে এলো না।

যদি

কালপেঁচা

বাংলাভাষায় এমন একটি 'শব্দ' আছে যাকে সাহিত্যিকরা উপেক্ষা করেন, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা অবহেলা করেন, অথচ যার আকর্ষণশক্তি দুর্বার, মাধুর্য অনির্বচনীয় এবং ব্যঞ্জনার কোনো আদি-অন্ত নেই। বাংলাভাষার মহারণ্যে মাত্র দুই অক্ষরের সেই শব্দটি ঠিক নিরাভরণ বনদুহিতার মতো ন। কোনো ঝংকার নেই তার, কোনো রূপলাবণ্য নেই। আলংকারিকের দৃষ্টিতে অলংকারের চিহ্ন তার গঠন-বিন্যাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। তবু তারই জন্যে 'সাহিত্য' সচল এবং 'জীবন' দুর্বিষহ বোঝার ভারে আজও অচল হয় নি। কাব্যের উপেক্ষিতা সে আমাদের 'আ মরি বাংলাভাষার' নগণ্য 'যদি'।

আমরা কোনোদিন ভেবে দেখিনি, আমাদের অলংকার-বহুল জীবনে এই নিরলংকার নির্বিকার 'যদি' যদি কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার ক'রে রয়েছে। 'চলন্তিকা' অভিধানে 'যদি' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু লিখেছেন: "অবধারণে বা বিকল্পে, if (যদি বৃষ্টি হয় তবে ঠাণ্ডা পড়বে, যদি আসতে তো ভালোই হতো) ; সংশয়ে বা আশঙ্কায়, lest (যদি রাত হয় তাই লণ্ঠন এনেছি, ভয় হয় যদি সে রাগ করে) ; সংশয়াধিক্যে (যদি মরি তাতে ক্ষতি কি ইত্যাদি)।" এই হলো 'যদি'র আভিধানিক অর্থ। অবধারণে বা বিকল্পে, ইংরেজী 'ইফ্-এর' মতোন, সংশয়ে বা আশঙ্কায়, ইংরেজী 'লেস্ট'-এর মতোন, অথবা সংশয়াধিক্যে, ইংরেজী 'ইভ্ন ইফ্'-এর মতোন, আমাদের বাংলা-ভাষার 'যদি'। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, আভিধানিক অর্থের এই নির্দিষ্ট সীমানা ছাড়িয়ে বাংলার 'যদি' তার গভীর দ্যোতনার ইন্দ্রজাল মানসিক ভাবানুভাবের নিঃসীম দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তার ক'রে রয়েছে। ইংরেজীর 'ইফ্' আছে, 'লেস্ট' আছে, 'ইভ্ন-ইফ্' আছে, 'দ্যো' আছে, 'অল্‌দ্যো' আছে, কিন্তু বাংলায় আছে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, হিমাদ্রির মতোন অচল অটল অদ্বিতীয় 'যদি'।

আমাদের জীবনের একমাত্র পাটাতন 'যদি', যেমন ওদের লাইফের 'ইফ্';

সারাজীবনের সমস্ত সঞ্চিত পাথেয় থেকে যে কোনো সময় একটি একটি ক'রে সবগুলি 'যদি' একবার যদি খসিয়ে নেন, তাহলে দেখতে পাবেন বিয়োগফল যা পড়ে রইলো সেটা শুধু একটা শূন্য খোলস-মাত্র, একটা স্কেলিটন বা কঙ্কাল; রক্ত-মাংস, রূপলাবণ্য কিছুই তার নেই। তার কারণ জীবনের রক্ত-মাংস, জীবনের রঙবেরঙের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য, জীবনের মনোহর লাবণ্য, সবই ঐ 'যদি'। জীবন যাদের বিশাল হাজারদুয়ারী রাজপ্রাসাদের মতোন জমকালো, তাদেরও হাজার স্তম্ভের প্রতিটি স্তম্ভ ঐ 'যদি'। জীবন যাদের পর্ণকুটীরের মতোন জীর্ণ, তাদেরও প্রত্যেকটি ঘুণধরা খুঁটি ঐ 'যদি'। তা না হলে আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ, এরা ওরা সকলেই তো মানুষ, তবু কেন এক নবকৃষ্ণ শোভাবাজারের মহারাজা হলেন এবং আর এক নবকৃষ্ণ দেনার দায়ে তার শুধু দুই বিঘে জমি বেচে দিয়ে লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে গেল। এক জনের জীবনে স্বপ্নলোক থেকে 'যদি' নেমে এলো মাটির পৃথিবীতে, আর এক জনের জীবনে 'যদি' চিরদিন স্বপ্নাকাশে তারার মতো উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে রইলো। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান কেবল 'যদি'র ব্যবধান, জীবনের সঙ্গে জীবনের দূরত্ব কেবল 'যদি'র দূরত্ব। জীবনের কোনো এক সময়ে আপনার নিজের পায়ে-হাঁটা পথের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যদি স্থির দৃষ্টিতে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে-যাওয়া কোনো জীবনের মূর্তির দিকে চেয়ে থাকেন, তাহলে দেখবেন গভীর অন্তস্তল থেকে একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো এবং পিছনে পড়ে-থাকা আপনি ও এগিয়ে-যাওয়া সে, এই দুই জীবনের মধ্যে যে পথের দূরত্ব, তার মধ্যে অসংখ্য মাইল-পোস্ট দৃষ্টিপথে ভেসে উঠলো, প্রত্যেক পোস্টের পাথুরে গায়ে বড়ো বড়ো হরফে খোদাই-করা 'যদি'। এই 'যদি'-ই আপনার দীর্ঘনিশ্বাসের উৎস এবং জীবনধারণের একমাত্র জীবিকা। যে যাচ্ছে সে কেবল চলার আনন্দে মশগুল হ'য়ে চলছে না, 'যদি'র টানে চলছে, 'যদি' আরও একটু চলা যায়, 'যদি' আরও কয়েকটা পর্বতচূড়া পার হওয়া যায়, 'যদি' জীবনের নন্দাগিরি, ধবলগিরি অতিক্রম ক'রে এভারেস্ট পর্যন্ত পৌঁছোনো যায়, 'যদি' তার পরেও কোনো তুষারশৃঙ্গ থাকে—। জীবনের আঁকাবাঁকা পথ দিগন্তবিস্তৃত, সেই পথের বাঁকে-বাঁকে 'যদি'র মাইল-পোস্ট। আপনার চলার ইতিবৃত্ত কয়েকটা 'যদি' পার হওয়ার করুণ বা রোমাঞ্চকর কাহিনী, আপনার ব্যর্থতার ইতিহাস সামনে অসংখ্য দুরতিক্রম্য 'যদি'র মর্মান্তিক ইতিহাস এবং আপনার সার্থকতার ইতিহাস কেবল কতকগুলি অতিক্রান্ত 'যদি'র রোমাঞ্চকর ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

জীবনে যে ব্যর্থ হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, দেখবেন যখন জীবন-কাহিনী সে বলা সুরু করবে তখন অনর্গল ধারায় মুখ থেকে উৎসারিত হবে "যদি, যদি, যদি"। প্রত্যেক 'যদি'র পর এক একটা দীর্ঘশ্বাসের ছেদচিহ্ন, একটা সকরুণ ভাব, একটা গ্লানিবোধ, একটা প্রতিহিংসার লেলিহান প্রবৃত্তিশিখা। যদি ওটা পেতাম তাহলে এই করতাম, এই হতো, যদি পারতাম, যদি ঘটতো, যদি ঐ ভুলটা না করতাম, যদি একবার বাগে পেতাম, তাহলে তাহলে ব'লে বক্তা উত্তেজিত হ'য়ে উঠবেন। যদির কাহিনী শুনতে শুনতে অবসন্ন হ'য়ে পড়বেন। যত মহাজন যত আত্মজীবনী লিখেছেন আজ পর্যন্ত তার সবটাই প্রায় 'যদি'। জীবনে যার প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে, প্রতিহিংসার আগুনে সে নিয়ত জ্বলছে আর ভাবছে "যদি একবার পাই—"। প্রেমিক যে সে ভাবছে "যদি সে আসে—"। শিশুর স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা তাজ্জব দুনিয়ায় 'যদি' ছাড়া আর কিছু নেই। যদি সে ছাড়া পায় তাহলে গাছে ওঠে, পাহাড় ডিঙোয়, নদী পার হয়। যদি তার ছোট্ট খেলনা-এরোপ্লেনটা উড়তে পারতো তাহলে তাতে চ'ড়ে সমস্ত আকাশটা সে একবার বোঁ ক'রে ঘুরে আসতো, দেখে আসতো মেঘগুলোকে। যদি মা না মানা করতো, তাহলে ঠিকই সে কাগজের নৌকায় চ'ড়ে ভেসে পড়তো নদীর বুকে, কত দূর দেশ-বিদেশ চলে যেতো। শৈশব থেকে কিশোর-জীবনের 'যদি' আরও একটু পাল্লার মধ্যে এলো। "যদি উকিল হই তবে রাসবিহারী ঘোষ হবো, যদি ডাক্তার হই তাহলে গরীব-দুঃখীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করবো, যদি পড়াশুনা করতে পারি, তাহলে বিদ্যাসাগর হবো, যদি ব্যবসা করি তবে বিড়লার চেয়েও বড়ো হবো, যদি শ্যামসুন্দরের মতো বীর হ'তে পারি তাহলে বাঘের গলায় বগ্‌লস দিয়ে শিকল বেঁধে কুকুরের মতোন টেনে নিয়ে বেড়াবো, আর দেশের সমস্ত বন্দিনী, অভাগিনী, কুমারী কন্যাদের দস্যুদের কবল থেকে ছিনিয়ে আনবো। অর্থাৎ 'যদি' একবার ড্যাশ্‌ হই, তাহলে দেখে নেবো, দেখিয়ে দেবো কি করতে পারি, যা কেউ করেনি কখনও, ইতিহাসে যে কাহিনী লেখাজোখা নেই।" এই হলো কৈশোরের 'যদি'। এ 'যদি' এমনই জীবন্ত যে, যদি একবার কিশোর রাজপুত্র তার ও-বাড়ির বা ও-পাড়ার কিশোরী রাজকন্যাকে পায়, তাহলে তার হাত ধ'রে সে এই কমলালেবুর মতোন পৃথিবীটাকে স্বচ্ছন্দে জয় ক'রে তার মাথার উপর বিজয়দর্পে দাঁড়িয়ে বিষাণ বাজিয়ে ঘোষণা করতে পারে যে সে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। দিল্লী থেকে মক্কা, মক্কা থেকে কামশ্চাট্‌কা, টাঙ্গানিকা থেকে সাইবেরিয়া

সে এক এক লাফে চ'লে যেতে পারে, গিয়ে সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে সেখানে, ঠিক এস্‌কিমোদের মতোন, নিগ্রোদের মতোন, বেদুইনদের মতোন, অবশ্য যদি সে তাকে পায়, যদি তাকে তেমনি ক'রে পাওয়া যায়, যদি তাকে ঐ রুদ্ধ ঘরের জানালার গরাদ ভেঙে একবার ছিনিয়ে আনা যায়, যদি—যদি—। এই হলো দুরন্ত কৈশোরের দুর্ধর্ষ 'যদি'। শৈশবের 'যদি' রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়া, কৈশোরের 'যদি' দুর্বারগতি গ্যালপিং ঘোড়া। শৈশবের 'যদি' কাগজের নৌকা, কৈশোরের 'যদি' হাজার-দাঁড়ি ময়ূরপঙ্খী নাও। যৌবনের 'যদি' উত্তাল তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে ভাসমান স্টীম-লাইণ্ড জাহাজের মতোন, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে তার বিরামহীন যাত্রা। অনুসন্ধানী মন চির-অতৃপ্ত, "যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না", তাই যদির টানে কেবল খোঁজা আর চলা, যদি পাই, যদি সার্থক হই, যদি জয়ী হই, যদি—যদি—। প্রৌঢ়ত্বের বালুচরে যৌবনের তরঙ্গায়িত জাহাজটা হঠাৎ যখন ধাক্কা লেগে আটকে যায় তখন বিস্তীর্ণ বালুচরের দিকে চেয়ে-চেয়ে হিসেবী মনটা সজাগ হ'য়ে ওঠে, চোখের সামনে অস্তগামী সূর্যের আলোয় জীবনের বালু-স্তূপে ঝিক্‌মিক্ ক'রে ওঠে অসংখ্য ফেলে-আসা পাশ-কাটানো 'যদি', মনে হয়, হায় হায়। যদি না ওটা করতাম, যদি আর একটু বুদ্ধিমান অথবা যদি অতটা লোভ, অতটা বাড়াবাড়ি না করতাম, যদি—যদি—। বালুতটের অস্বস্তি ও হা-হুতাশের মধ্যে বার্ধক্যের সন্ধ্যা নামে, জীবনের সূর্য যায় অস্তাচলে। শেষদিনের শেষ মুহূর্তটিতে অসংখ্য 'যদি' এসে ভিড় করে ক্ষীয়মাণ দৃষ্টিপথে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলে যখন চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন মনে হয় যেন প্রত্যেকে এক একটি মূর্তিমান 'যদি'। বৃদ্ধা মা'র দিয়ে চেয়ে মনে হয় জীবনে তাঁর প্রতি কত অন্যায়, কত অবিচার করেছি, ক্ষমা চাওনা হয়নি—অমনি কোথা থেকে 'যদি' উদ্বেল হ'য়ে ওঠে, মনে হয়, যদি একবার প্রাণ খুলে ক্ষমা চাইতে পারতাম, যদি "মা" ব'লে ডাকতে পারতাম। কিন্তু সে সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, ডাকবার শক্তি নেই, তাই 'যদি যদি' ক'রে নিভ-নিভ চোখে জল জমে শুধু। স্ত্রী-পুত্র, স্বজন-বন্ধুদের দিকে চেয়েও ঐ কথা মনে হয়, কেবলই মনে হয়, যদি একবার সকলকে মনের আসল কথাটা বলতে পারতাম তাহলে কত ভুলের বোঝা হালকা হ'য়ে যেতো। কিন্তু সে সময় নেই। কেবল 'যদি', আর অন্ধকার। অন্ধকার গাঢ়তর হয়, বৃহত্তর হ'তে হ'তে মাথার উপরে সিলিং স্পর্শ করে—যদি আর একটা দিন, মাত্র একদিন, যদি—যদি—।

জীবনের 'দি এণ্ড' বা 'ঐ শেষ'। হাজার হাজার অসংখ্য 'যদি'র ভগ্নস্তূপ এই জীবন। কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়। যার শেষ হ'য়ে গেলো সে তো জানলো না যে, যারা বেঁচে রইলো তাদেরও জীবন কতদিন কতবার ঐ 'যদি' জর্জরিত করবে। তারা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ঐ 'যদি' তাদের হণ্ট্ করবে, যে চ'লে গেল তার কথা ভেবে মনে হবে মধ্যে মধ্যে, ভীষণভাবে মনে হবে—যদি তাকে পেতাম, যদি একদিনের জন্যেও পেতাম, যদি একবারটি জীবন্ত পেতাম তাকে—যদি—তাহলে—। চলার পথে জীবনের বাঁকে বাঁকে মাইল-পোস্ট যেমন 'যদি', জীবনের এপার থেকে ওপারের সেতুও তেমনি 'যদি'। 'যদিশূন্য' জীবন-মাত্রেই মৃত্যু আর 'যদিদীপ্ত' জীবন মানেই এগিয়ে চলা।

নির্জনতার আনন্দে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তখন আকাশে, মাটিতে, স্বর্গে, মর্ত্যে অনন্ত শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই শূন্যতার রঙ নেই, স্পর্শ নেই, গন্ধ নেই—শুধু স্রষ্টার মহাচৈতন্যের এক স্পন্দনহীন স্পন্দন ছাড়া বস্তুর চিহ্নমাত্রও নেই। বহু যুগ এইভাবে বয়ে যেতে যেতে একদিন সেই শূন্যতা-ব্যাপী মহাচেতনা ক্লান্ত হয়ে উঠলেন। এই নিঃসঙ্গতার ভার আর সহ্য হয় না—অতএব 'আমি বহু হইব'।

দেখতে দেখতে সমীরিত হ'ল দখিন বলয়, উচ্ছ্রিত হ'ল পাহাড়, উদ্‌গীথ জাগল সমুদ্র-তরঙ্গে, উল্লোলিত হ'ল মৌন অরণ্য। জীবাণুর সঞ্চার জীবের সঞ্চরণ। সশব্দ আর নিঃশব্দ কোলাহলে, জৈবিক আর আরণ্যক চঞ্চলতায়, জড় আর চেতনের ঐকতানে পৃথিবী উদ্বেলিত হ'ল। নিঃসঙ্গতা কোথাও রইল না—এমনকি মরুভূমির মৃত পঞ্জরেও অলক্ষ্য অগণ্য জীবনবিন্দু সামুমের ক্ষ্যাপা ডানায় ভর দিয়ে উড়ে চলতে লাগল। তা হলে বিশ্বপ্রকৃতিতে কোলা-হল, কলহ, ভিড় (এমনকি মহাশূন্যও শূন্য নয়—সেখানে বিচিত্র রশ্মির বিকিরণ), তার দিনের জীবন নীরব হয়ে গেলে, রাত্রির জীবন জাগ্রত। একজন ফরাসী লেখকের লেখায় পড়েছিলুম দিন হ'ল 'অ্যাৎর' অর্থাৎ প্রাণীর জন্যে; আর রাত্রির ওপর 'শোজ' অর্থাৎ বস্তুর অধিকার। সবাই জীবিত, সবাই মরব। যে কথা বলছিলুম—স্রষ্টা কোথাও কারো জন্যে নিঃসঙ্গতা রাখেননি, কখনো নয়, কোথাও না।

আমার এই গভীর গম্ভীর আলোচনায় নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছেন এবং হঠাৎ কেন যে এই ধরনের উচ্চচিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে এ নিয়ে আপনাদের মনে নানা কূট প্রশ্ন জাগছে। তা হলে কারণটা সরল বাংলাতেই খুলে বলি। আমি শ্রীভগবানের ইচ্ছার বিরোধিতা করেছিলুম—অর্থাৎ কামনা করেছিলুম নির্জন-তার। কিন্তু নিঃসঙ্গতা যেমন প্রকৃতির ধর্ম নয়, তেমনি নির্জনতাও মানুষের স্বভাববৃত্তি হতে পারে না। মাটিতে মাথা দিয়ে হাঁটতে গেলে যেমন বিপর্যয় অনিবার্য, সেইরকম যে যা নয় তার পক্ষে তাই হতে যাওয়া একেবারে

আগ-বাড়িয়ে ট্র্যাজিডিকে ডেকে আনা।

তরুণ বয়সে ম্যাথু আর্নল্ডের একটি কবিতা পড়েছিলুম। তাতে বোধ হয় এইরকম কিছু বাণী ছিল (এতদিন পরে লাইনগুলো আর মনে আসছে না): 'দ্যাখো বন্ধু, মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে কখনোই দোস্তী হতে পারে না। প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনেই বাঁচে—আমাদের বাঁচতেও বাধা দেয় না। সূর্যটাকে সে জ্বালিয়ে রেখেছে সকলের উপকারার্থেই—ব্যাস্—এর বেশী কিছু আর আশা ক'রো না'।

বলা অনাবশ্যক, অল্প বয়সে এই বক্তব্য ঠিক পছন্দ হয়নি। কারণ তখন অভিভাবকের শাসনে কলেজে পড়বার আভিজাত্য ভুলে গিয়েও সন্ধ্যার পরেই বাড়ি ফিরতে হ'ত এবং আমাদের এই মফস্বল শহরেও কংক্রীটে বাঁধানো রাস্তা আর ইলেকৃট্রিকের আলো ছিল। কাজেই নির্জনতার স্বপ্ন এতদিন নিশ্চিন্তে লালন করতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। কিন্তু সম্প্রতি জ্ঞান-বৃক্ষের একটি ফল চর্বণ করবার পরে আমি আর নির্জনতা-বিলাসী নই। আমার মনে আপাতত যে ভাবোদয় ঘটেছে, এই লেখার সূচনায় তারই পরিচয় আপনারা পেয়েছেন।

শাল, মহুয়া, পাহাড়, টিলা, পাহাড়ী নদী, ধানক্ষেত, পাখি ; আর এদের ভেতরে ফল-ফুলের বাগানে সাজানো ছিমছাম বাড়িটি নির্জন-বাসের পক্ষে নিশ্চয় আদর্শ, এমন স্বভাব-কবি যদি কেউ থাকেন—তাঁর কায়িক প্রয়োজন নামমাত্র, তাহলে ছ'-মাস তিনি এখানে বাস ক'রে কাগজের বাজারে টান ধরিয়ে দিতে পারেন। তাঁকে প্রণামান্তে সুনন্দর নিবেদন, কখনো কখনো প্রো-কলকাতা প্রশস্তি দরকার, এমনকি পিণ্ডি খেজুরের মতো মানুষের পিণ্ডি মাখানো বড়বাজারও সানন্দে বন্দনীয়।

এই নির্জনতায় যা যা আনন্দ পাচ্ছি, সংক্ষেপে তার কিছু তালিকা দিই :

(১) বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, সাতদিন খবরের কাগজ পড়িনি। সংবাদপত্রে আমার অনীহা এর কারণ নয় ; আসলে কাগজ আমি যোগাড় করতে পারিনি।

(২) সকালে চা খেতে গিয়ে পাঁউরুটির দরকার পড়ল। রুটি অবশ্যই পাওয়া যাবে, কিন্তু মাত্র সাড়ে তিন মাইল দূরে। ভোরবেলায় মাইল সাতেক মর্নিং-ওয়াক এমনকি আর শক্ত কথা।

(৩) একটি দেহাতী সরল ব্যক্তি সাড়ে পাঁচ টাকা সের দরে মাছ বিক্রি

ক'রে যায়। মাছ নাকি সে নিজেই ধরে। চোখে-মুখে তার শালবন আর পাহাড়ী নদীর পবিত্রতা। সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি, সাড়ে তিন মাইল দূরের শহর থেকে চার টাকা সেরে মাছ কিনে আনে এবং যে মাছ সে দেড় সের ব'লে চালায়—আসলে সেটি তিন পোয়া। গ্রাম্য সরলতা বোধ হয় একেই বলে।

(৪) কাল রাত্রে প্রাচীরের ওপর থেকে কাঁটা-তারের বেড়া টপকে, কে যেন নীচে লাফিয়ে পড়েছিল। খুব সম্ভব কেউ বাড়ি ভুল করেছিল—অবোধ গ্রাম্য মানুষ কিনা। অথবা অনেক রাত্রে পরের বাড়ির প্রাচীর টপকাতে কেমন লাগে—কেউ সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখছিল। কিন্তু আমাদের শহুরে পাপ-মনে নানা সন্দেহ জেগেছে—আমরা নির্জনতার সুখে নিদ্রামগ্ন থাকলে সে কেবল পাঁচিল টপকে ফিরে যেতো এরকম ভরসা হচ্ছে না।

(৫) সবচেয়ে আনন্দের সংবাদ এই যে, সকালে একজন পুলিশ-কন্স্টেবল এসে সেলাম দিয়েছে থানা থেকে। তার দেওয়ালী বক্শিশ চাই এবং সে নাকি দু'টাকার কমে বক্শিশ ছোঁয় না। তাকে আগন্তুকের সংবাদ জানাতে, তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'চোরউর হোগা।' 'তুমি আছো কি জন্যে ?' সে আছে বোধ হয় বক্শিশের জন্যে, কিন্তু তা আর মুখে বললে না, একটু হুঁশিয়ার থাকবার উপদেশ দিয়ে গেছে।

অবশ্য নির্জনতা সুখ—অর্থাৎ শাল-মহুয়ার বন, পাখির ডাক-টাক, এগুলো সব ঠিক আছে। রাত্রে লাখ মশা ছেঁকে না ধরলে মহামৌনের ধ্যানেও বসা যেত। কিন্তু আর পেরে উঠছি না। আপাতত সাড়ে তিন মাইল দূরে একখানা দাড়ি-কামানোর ব্লেড আনতে যেতে হবে ; সেই চিন্তাতেই ওপরের গভীর-গম্ভীর থীসিসটি বেরিয়ে এসেছে। ভাবছি, কলকাতায় ফিরে বড়বাজারের বন্দনাই লিখব।

মানচিত্র ও ব্র্যাড্‌শ

রঞ্জন

পড়ার ব্যাপারে আমি দ্বিতীয় ভাগের সুশীল। যাহা পাই তাহা পড়ি।

রাস্‌কিন আমার এই অভ্যাসটির নিন্দা করবার ভাষা খুঁজে পেতেন না। সমগ্র মুদ্রিত গ্রন্থরাজি তাঁর মনে সাদা-কালো, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ এমনি দুটো স্পষ্ট ভাগে ভাগ করা ছিলো। এক রকমের বই পড়া যেন সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে কথা বলা, আত্মোন্নতি তার অবধারিত পুরস্কার। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বই পড়া হচ্ছে দাসীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ; অথবা কালক্ষেপ তো বটেই, রুচিহীন চিত্তবিক্ষেপও।

রানী দেখলে আমারও রাজা হবার ইচ্ছা হয়। তাঁর প্রতি আমার অনুরাগ রাস্‌কিনের চেয়ে অণুমাত্র কম নয়। কিন্তু আমি পড়েছি শরৎবাবুর উপন্যাস, পাত্রবিশেষে আমার দাসীবিদ্বেষ আমি সানন্দে জয় করতে প্রস্তুত। আরেকটা উপমা দিয়ে বলি, আমি দুর্লভ ভিন্‌টেজের কোনো পেয় পেলে সাগ্রহে তা ওষ্ঠে তুলে নেবো, কিন্তু হাতের কাছে এক গেলাস ড্রাফ্‌ট্‌ পেলেও ঠোঁট ফুলিয়ে ফেলে দেবো না। প্রথম উপমাটি রাস্‌কিনের নিজের; দ্বিতীয় উপমাটি রাস্‌কিনের চাইতে তাঁর বাবা বেশি উপভোগ করতেন। তিনি মদ্য-ব্যবসায়ী ছিলেন।

সোজা কথায়, আমি নির্বিচারে প্রায় সব কিছু পড়ি। হাতের কাছে একটা মানচিত্র বা ব্র্যাড্‌শ থাকলে—এবং আর কিছু না থাকলে—তাই পড়ি।

ব্র্যাড্‌শর কথায় মনে পড়ে গেল বার্নার্ড শ'র কথা। তিনি বলতেন, পাঠক যা নিয়ে বই পড়তে আসে তাই নিয়ে তাকে ফিরে যেতে হয়। তার বেশি পায় না সে। বহু শ-তত্ত্বর মতো এটাও বোধহয় অর্ধসত্য। তা নইলে আমি কখনোই কিছু পড়তেম না, শ তো নিশ্চয়ই নয়। সে কেমন ব্যবসা যাতে মূলধন থাকে অবর্ধিত? যা আনবো পড়বার আগে, তাই যদি ফিরিয়ে নিতে হয়—ঝুলির চাল যদি সোনা হ'য়ে না ফলে, তবে কাজ কী অমন ভিক্ষায়? না, পড়া অমন ব্যবসা কখনোই নয়।

কিন্তু মানচিত্র, ব্র্যাড্‌শ বা রেলওয়ের টাইম-টেবল পড়তে গেলে সত্যি পাঠকের নিজের থাকা চাই মোটা রকম মূলধন। তা নইলে সে কিছুই পাবে না ওসব কাগজ পড়ার বদলে। ম্যাপ পড়তে গেলে সত্যি চাই উদার কল্পনা—যার সাহায্যে মানচিত্রের উষর মরুভূমি পরিণত হবে লক্ষ-অধ্যুষিত বর্ধিষ্ণু জনপদে, যা ব্র্যাড্‌শর কঠোর কঙ্কালের উপর কোমল মেদের আবরণ দিয়ে গড়ে তুলবে জীবন্ত মানুষ। আমি সব সময়ই ব'সে ব'সে কিছু ম্যাপ আর ব্র্যাড্‌শ পড়িনে, কিন্তু আঁদ্রে জীদ যাকে বলেছেন অদণ্ডিত আসক্তি, আমি সেই নেশার দাসত্বে এই রকমের অনেক জিনিস মাঝে মাঝে পড়তে বাধ্য হই, এবং পড়ে যে একেবারেই কোনো আনন্দ পাইনে তাও ঠিক নয়।

মানচিত্র খুললেই আমার মন ভরে ওঠে বৈষ্ণবী বিনয়ে। কত জিনিস, কত জায়গা আজো র'য়ে গেল আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বাইরে। আমি বরাবর সন্দেহ করেছি যে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি' নামক কবিতাটি লিখেছিলেন তখন তাঁর সামনে প্রসারিত ছিলো একটি বৃহৎ মানচিত্র। প্রত্যক্ষলভ্য জ্ঞানের হাস্যকর নগণ্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে মানচিত্রের মতো শিক্ষক আর নেই। ম্যাপ খুললেই মনে হয় জানার স্বল্পতা আর অজানার অন্তহীনতা।

কিন্তু বিনয় আমার চরিত্রে অত্যন্ত পরিমিত। একটা বড়ো রকমের দম্ভ আমার মজ্জাগত। তাই মানচিত্রের চাইতে গ্লোব আমার বেশি প্রিয়—যাতে তাকে নিয়ে আমি যা ইচ্ছা করতে পারি। পদাঘাতে তুলে দিতে পারি কড়ি-বরগার কাছে, তারপর তৃপ্তি-সহকারে প্রত্যক্ষ করতে পারি তার অসহায় অধঃপতন—'দি গ্রেট ডিক্‌টেটর' ছবিতে চার্লি চ্যাপলিন যেমন ক'রে দেখিয়েছিলেন স্বৈরাচারীর দুরভিলাষের প্রতীক। আমি গোটা বিশ্বটিকে নিয়ে খেলতে চাই আপন খেয়াল মতো, শিশু যেমন খেলে তার মার্বল নিয়ে, বিরাট শিশু যেমন খেলছেন তাঁর আপন হাতে গড়া অগণিত মানুষের দুর্নিবার ভাগ্য নিয়ে।

বিশ্ববিজয়ের এই দৃপ্ত কল্পনাও আবার অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই গ্লোব ফেটে যায় ফানুসের মতো। আর অমনি ইতিহাসের বিশ্বজয়-কামী বীরবৃন্দ সারি বেঁধে দাঁড়ায় এসে আমার সামনে। আসে আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, হিটলার আর মুসোলিনি; বলে, "একদা মোদের যেথা শেষ, সেথায় তোমারও অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।"

শান্ত-শিষ্ট ছেলের মতো আমি আবার তখন আমার নিরীহ মানচিত্র খুলে

বসি। উচ্চাভিলাষ তুলে রাখি রাত্রিতে নিদ্রার স্বপ্নবিলাসের জন্যে। আমার মানচিত্রে উঁচু-নীচু নেই, সমতল সেই ম্যাপে মুশকিল নয় এক লাফে পাহাড় পেরিয়ে যাওয়া, এক ঝাঁপে সাগর উত্তীর্ণ হওয়া। আমি তাই করি। ওই যে ছোট্ট দাগটা, ওটা বার্সেলোনা। আমি ওখানে যেতে চাই এবং চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নিমেষে সত্যি ওখানে পৌঁছে যাই। কেন যে ওখানে যেতে চাই জানিনে। বোধহয় কখনো যাইনি ব'লে। বোধহয় এইজন্যে যে ওটা আমাদের ঠিক আগেকার যুগের তরুণদের শত আশার সমাধি, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ইণ্টারন্যাশানাল ব্রিগেডে যুদ্ধ ক'রে গণতন্ত্রের ভরাডুবি রোধ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই আজ নিরাশা-নিমজ্জিত হ'য়ে নিষ্ক্রিয়। তবু বার্সেলোনা যেতে আমার প্রবল লোভ।

আর শুধু কি বার্সেলোনা? সামনে বিছানো মানচিত্রে যখন যে নাম দেখি তাই মনে আনে অতৃপ্ত কোনো কামনা বা অবিস্মৃত তৃপ্তি। এই দুয়ে মিলে আমার পৃথিবী। মনসা যার পরিক্রমা ক'রে কখনোই আমার সাধ মিটবে না।

মনে যতই ভবঘুরে হই, পরিব্রাজক হিসাবে আমি একান্তই অক্ষম। একবার ভ্রাম্যমাণ হ'য়ে আবার ভ্রাম্যমাণ হ'তে আমার মন উঠতে চায় না, পা তো নয়ই। বিধাতা আমায় অনেক দিয়েছেন, সেজন্যে কৃতজ্ঞতার সীমা নেই আমার। কিন্তু লঘু সংলাপে যে কুশলতা থাকলে পথ চলতে চলতে বন্ধু কুড়িয়ে এগুনো যায়, আমি সেই গুণটি থেকে একেবারেই বঞ্চিত। এর অভাবে বিশ্বসংসারে আমার মতো নিঃসঙ্গ বুঝি কেউ নেই। গাড়িতে বসে আমি সাথী খুঁজি আকাশের তারাগুলির মধ্যে, জাহাজে আমার একমাত্র সঙ্গী সেই তরঙ্গগুলি যারা নিয়তই দূরে সরে যেতে ব্যস্ত। এমন হতভাগ্যের জন্যে ভ্রমণ সর্বদাই নৈরাশ্য-সংকুল। এমন লোকের পক্ষে মানচিত্রের উপর হাত বুলিয়ে ব্রেইল্‌ পদ্ধতিতে বিশ্বপর্যটনই নিরাপদ। তা নইলে তার দেখা হবে এমন সহযাত্রীর সঙ্গে যাঁকে তার ভালো লাগবে না। আরো বেশি সম্ভব, দেখা হবে এমন সহযাত্রিণীর সঙ্গে যাঁর তাকে ভালো লাগবে না।

কাল্পনিক এই বিশ্বপরিক্রমায় ব্র্যাড্‌শ'র বিশদ বিবরণ যোগায় বাস্তবতা। এ থেকে জানি কখন কোন প্লেনে চড়ে কখন পৌঁছোনো যায় বার্সেলোনায়। স্পেস্‌ আর টাইম এমনি ক'রে জয় ক'রে, বিনা আয়াসে আমি যেখানে খুশি চ'লে যেতে পারি। দায় নেই ভাড়া দেবার, ভয় নেই বিমান-দুর্ঘটনার। আহা, সত্যি কেন এমন হয়না মাগো?

হঠাৎ চোখে পড়লো ব্র্যাড্‌শ'র একটা জায়গায়। লেখা আছে ঝাঝা ব'লে একটা জায়গার কথা। কলকাতা থেকে নাকি মাত্র ২২৮ মাইল। অমনি মনে পড়লো অনেক দিন আগের একটা কথা। অনেক, অনেক দিন আগে। আমার বয়স তখন পাঁচ কি ছয় হবে। আমাদের বাড়িতে কে একজন এসেছিলেন। কে যে তাও মনে নেই, শুধু আজো মনে আছে জায়গাটির নাম: ঝাঝা। সেদিন ওখানে যেতে চেয়েছিলাম ওই লোকটির সঙ্গে। সে কি যেমন-তেমন চাওয়া? সেদিন সব কিছু দিতে পারতেম ওই ঝাঝা যাওয়ার জন্যে। আর আজ? ঝাঝাতে আজ সোনার খনি আবিষ্কৃত হ'লেও আমি সেদিকে পা বাড়াবো না। সেদিনকার সে-শিশু কোথায় মিলিয়ে গেছে সময়ের নিঃসীম শূন্যতায়, তার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে সে-শিশুর ঝাঝারূপী স্বপ্নলোক। কে জানে, একদিন হয়তো বার্সেলোনাও যেতে চাইবো না।

আনমনা হ'য়ে ব্র্যাড্‌শ'র পাতা উল্টালে এমনি কত কথাই না বেঁচে উঠবে মরে-যাওয়া অতীত থেকে। ঠিক তেমনি দুয়েকটা ভাবনা ভেসে আসবে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ থেকে। ওই যে, ১০১-এর পাতায় লেখা আছে বস্তী ব'লে একটা জায়গার কথা। কানপুর থেকে ১১৭ মাইল দূরে। রোমানদের নাকি রোম নিয়ে বড়াইয়ের শেষ নেই, বস্তীর অধিবাসীদেরও নিশ্চয়ই তাঁদের গ্রাম বা শহর নিয়ে একটু-আধটু গর্ব আছে। তাই যদি হয়, তাহলে বস্তীর মতো এমন একটা প্রোলিটারিয়ান নাম কে রাখলে এর জন্যে? হাজার হাজার বছর পরে উত্তরপ্রদেশের সরকারের নগরনির্মাণ পরিকল্পনাগুলি যদি এবং যখন বাস্তব রূপ পাবে তখন কি বস্তীর নতুন ক'রে নামকরণ করতে হবে না। নতুন নাম দিলেও এমন সম্ভাবনা থেকে যাবে যে ভালো নামটা আলমারিতেই তোলা থাকবে, কেউ সে নামে ডাকবে না জায়গাটাকে। আমার পাশের বাড়ির খুকীকে যেমন কেউ ডাকে না তার মধুচ্ছন্দা নাম ধ'রে।

ব্র্যাড্‌শ'র পাতার লতা বেয়ে আসল কল্পনা এমনি কত অলীক সমস্যায় চিন্তিত হয়, অলীকতর আশায় উদ্ভাসিত হয়। হঠাৎ চোখ পড়ে অদ্ভুত একটা জায়গার নামের উপর। নামটা রেনটিয়া। বম্বে সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে মাত্র ৩৩১ মাইল। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৮৷৶০ মাত্র। এখানে আমার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই, কিন্তু রেনটিয়া নামটা কেন জানিনে মনে মনে জপ করতে থাকি। রেনটিয়া, রেনটিয়া। অমনি মনে পড়ে যায় লর্ড কীন্‌সের বিখ্যাত কথা —Euthanasia of the rentier। ভাবি রেন্টিয়া-র লোকেরা বুঝি মৃত্যুকে

চিনেছে বন্ধু ব'লে, বুঝি মরতে শিখেছে সক্রেটিসের মতো নির্ভয়ে, নিরভিযোগে?

মৃত্যুর কথা মনে আসতেই আর আমার চোখ নড়ে না, স্থির থাকে রেক্টিয়ার উপর। অমনি মরণকে দেখি দ্রুত অগ্রসরমান এক অজানা অচেনা অতিথি ব'লে। ওই এলো, ওই আসছে।

একেবারে এসে পড়ার আগে যে ক'টা মুহূর্ত আমার হাতে ছিলো তার মধ্যে দশ-দশটা মিনিট ব্যয় করেছি এই কথিকা প্রচার করতে। সত্যি যখন অতিথি এসে পৌঁছবে তখন কত কথা না-ব'লে থেকে যাবে, কত কথা না-লেখা। কত বই থাকবে না-পড়া। তখন আমি ম্যাপ বা ব্র্যাড্‌শ পড়ে যেমন সময় নষ্ট করবো না, তেমনি মডার্ন পেইন্টার্স পড়েও উপকৃত হবো না। অতিথি এসে আমার হাত ধ'রে নিয়ে যাবে জীবনের পরপারে। সেই চিরদিনের আবাস-খানার রূপটি কেমন? মৃত্যুলোকের নেই কেন কোনো মানচিত্র? পরলোকের উল্লেখ কেন নেই ব্র্যাড্‌শ'তে?

তখনি আমি ছুঁড়ে ফেলে দিই আমার খেলার-পড়ার ম্যাপ আর ব্র্যাড্‌শ। পড়তে বসি রাস্কিনও যাদের সম্রাজ্ঞীর আসন দিতে দ্বিধা করতেন না। কিছুক্ষণ বাদে আবার ও-দুটো তুলে রাখি। ওরাই তো আমার সে পথের হদিস দিয়েছিলো যার শেষ থেকে কেউ ফিরে এসে আঁকতে পারে না মানচিত্র, সংকলন করতে পারে না ব্র্যাড্‌শ। হ্যাঁ, আমার লাইব্রেরিতে ওদেরও জায়গা হবে।

সেই বাঙালী বাবুটি

রমাপদ চৌধুরী

'বাবু' শব্দটি কোত্থেকে এলো তা নিয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা আত্মকলহে ব্যাপৃত থাকুন, কিন্তু আমাদের নামের আগে মিস্টার যোগ করায় এখন আর ইংরেজদের কার্পণ্য না থাকলেও এই বাবুকে আমরা আমাদের নামের শেষে দিব্যি সসম্মানে কায়েম করে রেখেছি। এর মধ্যে কোনো হেনস্থা আছে বলে আমরা মনে করি না। যদু ও মধু নামক ব্যক্তিকে, কী সম্বোধনে, কী সম্মানপ্রদর্শনে, আমরা যদুবাবু ও মধুবাবু বলি। রাজনীতির ক্ষেত্রে এখনো একজন বাবুজী রয়েছেন, এবং আমাদের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে আমরা বাবুবর্জিত দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম না। সমাজে এখনো কেরানীবাবু থেকে শুরু করে ডাক্তারবাবু, উকিলবাবু, ঠিকাদারবাবু, মাস্টারবাবু সকলেরই বেশ সম্ভ্রমের আসন। আর নীচুতলার মানুষরা বাবুদের আজো খুব সমীহ করে। এবং তাদের ছেলে-পিলেরা একটু লিখাপড়ি করে একদিন বাবু বনে যাবে এ-স্বপ্নও তারা কেউ কেউ দেখে।

শুধু বাঙালী কেন, সারা পূর্বভারতেই 'ভদ্রলোক' বলতে মধ্যবিত্ত, এবং মধ্যবিত্ত বলতে এই বাবুদেরই বোঝায়, যার সঙ্গে মাথার ওপর পাখার বাতাস এবং আপিসে উপবিষ্ট থাকার জন্যে একটি চেয়ার প্রায় ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত; যদিও প্রায়ক্ষেত্রে চেয়ারটি থাকে শূন্য এবং গায়ের কোট বা শীতের চাদর তা থেকে ঝোলুল্যমান থেকে আসনাধিপতির উপস্থিতি ঘোষণা করে বিত্তে কিংবা বৃত্তিতে মধ্যবিত্তকে চেনা দুঃসাধ্য, কারণ বাবুরা এখন কলে-কারখানায়, গ্রামে-গঞ্জে, রেলে-প্লেনে, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কোথায় নয়? কিন্তু পড়ন্ত মধ্যবিত্ত শ্রমের কাজ নিয়েও শ্রমিক হ'তে পারে না, ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে আবার বাবু বানাতে সে বদ্ধপরিকর।

উনবিংশ শতাব্দীর বাবু কাল্‌চার নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। তার বাটারফ্লাই গোঁফে আতর লাগাতো, কোঁচানো ধুতির তোড়া হাতে নিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াতো, বাঈ নাচাতো, ঘুড়ি লড়াতো, পায়রা ওড়াতো। কিন্তু

সেই সচ্ছল অথচ অভব্য কালচারকেই কেন বাবু কালচার বলা হয় আমি জানি না। তখন যারা সমাজ সংস্কার করেছে, মেয়েদের ইস্কুল খুলেছে, কবিকে পুরস্কৃত করেছে, দুঃসাহসী নাটক মঞ্চস্থ করেছে, গানের সমঝদার হয়েছে, মহাভারত কিংবা পুরাণ অনুবাদ করেছে এবং মিল বা কোঁতের মতবাদ নিয়ে তুমুল ঝড় তুলেছে, কুসংস্কার ভেঙে মেডিকেল কলেজে মড়া কেটেছে এবং বন্দে মাতরম্ মন্ত্র দিয়েছে, তাদের ঠিকানার বেলায় নামের আগে বাবু বসতো, সম্বোধনে নামের পরে। অর্থকৌলীন্যের ফলেই নয়, সাংস্কৃতিক কারণেও এই বাবুরাই কখনো কখনো 'রাজা' উপাধি পেয়ে গেছেন, একালে পদমর্যাদায় যেমন বিলেতী উকিলবাবু হয়ে যান ব্যারিস্টার-সাহেব, এবং বিলেতফেরত না হ'লেও বিচারককে বলি জজসাহেব। তাছাড়া বোসবাবু বা দত্তবাবুও দু' ধাপ প্রোমোশন পেয়ে অফিসার বনে' গেলেই হয়ে যান বোস-সাহেব বা দত্ত-সাহেব। আরো উপরওয়ালা তখন তাঁদের সম্বোধন করে মিস্টার বাসু বা মিস্টার ডাটা বলে।

মধ্যবিত্তের প্রকৃত কোন সংজ্ঞা নেই। না অর্থে, না শিক্ষায়, না পেশায়। যদিও বিত্তের বিচারে কেউ নিম্ন, কেউ উচ্চ। আসলে এই বাবু মানসিকতা ছাড়া মধ্যবিত্তের আর কোন সংজ্ঞা নেই, সাহেব হয়ে যাওয়ার পরও সে-মানসিকতা ভিতরে ভিতরে থেকেই যায়। ছাত্রাবস্থায় যে ছেলেটি সিনেমা হলের সামনে পঁচাত্তর পয়সার সুলভতম টিকিটের জন্যে কিউ দেয়, একদা বেশ স্থূলবেতনের চাকরি পেয়ে সুসজ্জিত ইউকে সঙ্গে নিয়ে সেই ব্যক্তিটিই ব্যালকনির দুর্মূল্য আসনটির শোভাবর্ধন করে। এই মধ্যবিত্তেরই এক ভাই যখন সসম্মানে বিদেশী ডিগ্রি নিয়ে আসে, অন্য ভাই তখন গণ-টোকাটুকিতে হাত পাকিয়েও সহাস্য মুখে ফেল করে। একই বাড়িতে পাওয়া যাবে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর নকশাল, ধুতি-পাঞ্জাবি এবং বুশশার্ট-চোঙাপ্যান্টের সহাবস্থানও সেই মধ্যবিত্তের সংসারেই।

বাবুরাই প্রোমোশন পেয়ে শ্যামবাজারের গলি থেকে ক্যামাক স্ট্রীটের কোম্পানি ফ্ল্যাটে এসে ওঠেন, ছেলেদের পড়ান তখন ডন বসকো বা লা মার্টিনে, ক্লাবে পার্টিতে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যান, যে-স্ত্রীর নগ্নবক্ষ ঢেকে রাখে সামান্য একটু বড় আকারের একটা কাপড়ের প্রজাপতি, কিন্তু উভয়েই যত বিদেশী সেন্ট-ই মাখুন না কেন, গা থেকে মধ্যবিত্তের গন্ধ যায় না। কারণ

মধ্যবিত্ত যতই আধুনিক কিংবা বড় চাকুরে, অথবা অর্থবান, তার আশেপাশেই থাকে দুঃস্থ পিসীমা, দরিদ্র মেসোমশাই, বিধবা জ্যেঠী। মেয়ের বিয়ে, বাপের শ্রাদ্ধ, ছেলের পৈতে ইত্যাদির সূত্রেই যে যোগাযোগ রাখতে হয়, তা নয়। যে কোন মাল্‌টিন্যাশনালের নাম্বার-টু দূর সম্পর্কের আত্মীয় কিংবা সম্পর্কহীন মধ্যবিত্ত মোসাহেবটিকেই বলেন একাদশী মেয়ের জন্যে সচ্চরিত্র গৃহশিক্ষক জুটিয়ে দিতে। কারণ, খবরের কাগজের ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনে তাঁর আস্থা থাকলেও একালের যুবকদের ওপর তাঁর আস্থা কম, এবং মেয়েদের লিব্‌টিব ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ নিজের মেয়েকে স্ল্যাক্‌স বা ম্যাক্সি বা শর্টস পরানো অবধি। তেমন তেমন যোগ্যপাত্র হলে মেয়েদের প্রেমপ্রণয়ের ব্যাপারেও তিনি উৎসাহী, কিন্তু মেয়েদের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা বিষয়ে তাঁদেরও অধিকাংশই মনুসংহিতার চেয়েও গোঁড়া। যারা মিড্‌ল-মিড্‌ল ক্লাস তারা পণের টাকা যোগানোর চেয়ে ফ্ল্যাট-কেনা বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনা করে মেয়ের স্বয়ংবরা হওয়াই পছন্দ করে বটে; মডার্ন বানানোর জন্যে, বাড়িতে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড একখানা মোটরগাড়ি থাকলে, মেয়েকে ড্রাইভিং জানা আত্মীয় বা বন্ধুর পাশে বসিয়ে ড্রাইভিং শেখায়। তবে শেখার সময় মেয়ের মা, অভাবে ছোট ভাইটি পিছনের সীটে বসে থাকে। আর যারা বেশ নিম্ন মধ্যবিত্ত, সেখানেও পিতার সামর্থ্যের তুলনায় কন্যার পাত্র নির্বাচন যদি 'উৎকৃষ্টতর' হয়, সেক্ষেত্রে তার প্রেমের ব্যাপারে একটু পারিবারিক প্রশ্রয় থাকে। তবে সর্বশ্রেণীর মধ্যবিত্তের বাড়িতেই মেয়েদের জন্য সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে, সম্ভবত এই ধারণা থেকে যে সেই নির্দিষ্ট সময়ের আগে কোন দুর্ঘটনা ঘটা কোন ঐশ্বরিক কারণে অসম্ভব। কিন্তু কি উচ্চ, কি নিম্ন, শতকরা নব্বই ভাগ মধ্যবিত্ত চিন্তাভাবনায় নারী-স্বাধীনতা বিষয়ে উদার, কার্যক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী। যুবতী কন্যার দিকে তাঁদের একটু প্রখর দৃষ্টিই থাকে, বিয়ের ব্যাপারে শাড়ি, গয়না, আসবাবপত্র মেয়ের পছন্দমতোই হয়, মেয়ের পছন্দের দাম দেওয়া হয় না শুধু পাত্রনির্বাচনে।

মধ্যবিত্তের রঙ্গমঞ্চে প্রায় প্রতিটি মানুষকেই একাধিক চরিত্র অভিনয় করতে হয়। তার কোন্ চরিত্রটি যে সঠিক বলা খুব মুশকিল। কলেজে, অফিসে, চায়ের দোকানে বা কফি হাউসে সে যতক্ষণ তর্করত, ততক্ষণ মনে হবে তার মতো উদার এবং কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী কমই আছে। কিন্তু বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে দেখা যাবে মাদুলি তাবিজ, জ্যোতিষে ভক্তি, জাতিভেদ, গোত্র মেল, বৃহস্পতি-

বারের বারবেলা, হাঁচি, পাঁজি-দেখা, কি নেই তার মধ্যে? সে নিয়মিত 'এ সপ্তাহ কেমন যাবে' পড়ে, কুপিত গ্রহকে কব্জা করার জন্যে আংটিতে রত্নধারণ করে, কিন্তু বাড়িতে মুর্গী-রান্নায় নিষেধ থাকলে মা'র সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তর্ক শুরু করে দেয়। আবার সুযোগ পেলেই সে এ-সবকে উপহাস করে, এবং যুক্তি দিয়ে যখন এইসব বিশ্বাসকে ভাঙবার চেষ্টা করে তখন বেশ বোঝা যায় সে নিজের সঙ্গেই যুদ্ধ করছে। তবে মধ্যবিত্তের একমাত্র বিলাস বোধহয় রাজনীতি। ধর্মীয় গুরুবাদের প্রতি যদি-বা তার অসীম ঘৃণা থাকে রাজনৈতিক গুরুবাদে তার অবিচল আস্থা। সুযোগ পেলেই সে অপরিচিতের মধ্যেও রাজনীতির কথা এনে ফেলবে, এবং আশ্চর্য ব্যাপার, দেশবিদেশের ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি যেন তার নখদর্পণে। ভিয়েৎনামের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকলেও আপীল-দরখাস্তে সই করা বা রাস্তায় প্রশেসন বের করায় তার উৎসাহ অকৃত্রিম। মধ্যবিত্তের ন্যায়বোধ সদাজাগ্রত। অসাধু ব্যবসাদার ও অসৎ রাজকর্মচারীদের নিকটস্থ ল্যাম্পপোস্টে কেন ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে না সে-বিষয়ে তার প্রচণ্ড উষ্মা, যদিও বাসে-ট্রামে কখনো কখনো অন্যমনস্ক থাকার ফলে টিকিট কাটতে সে ভুলে যায় এবং বিনাটিকিটে রেল-ভ্রমণকে সে অনেকসময় নিতান্তই স্পোর্টস হিসেবে গ্রহণ করে। সম্ভবত খেলার মাঠ যথেষ্ট নেই বলে।

এই স্ববিরোধী চরিত্রের মধ্যবিত্ত বাবুটিকে প্রচণ্ড উপহাস করা ছাড়া উপায় নেই, কারণ তার ভিতরে দুঃস্থ দুঃখময় চেহারাটা দেখতে পেলেই সমস্ত পৃথিবী বিস্বাদ হয়ে যায়। এরা যা রোজগার করে তার বেশির ভাগটাই ছিনতাই করে নেয় বাড়িওয়ালা, যার সঙ্গে তার দিবারাত্র ঝগড়া জল নিয়ে। একটা মোটা অঙ্ক সে খরচ করে ছেলেমেয়ের শিক্ষার পেছনে, কারণ টিভি ফ্রীজ কিংবা মোটরকারের চেয়েও ছেলের স্কুলের নামটাই তার কাছে স্ট্যাটাস সীম্বল, এবং এরপর আছে ডাক্তার ও ওষুধ, কারণ অভাবে অভাবে তার স্বাস্থ্য যত না খারাপ তার চেয়ে তার স্বাস্থ্যবিধির সতর্কতা অনেক বেশী। সুতরাং শেষ অবধি তার হাতে কিছুই থাকে না, ফলে রাগ গিয়ে পড়ে চালের দাম ও মাছের দুষ্প্রাপ্যতার ওপর। যদিও ও-দুটি সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির কিছুটা কারণ এই যে, ও-দুটির উৎপাদকরাও বাবু হয়ে উঠতে চাইছে।

বিলাসের প্রতি মধ্যবিত্তের প্রচণ্ড লোভ, কিন্তু ব্যবসায়ীদের বিলাসব্যসন দেখলে সে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কারণ নীতিগতভাবে সে বিশ্বাস করে দেশের

সেরা বস্তুগুলি উপভোগের যোগ্যতা থাকা উচিত কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কেরই। অবশ্য মনে-মনে সে বিশ্বাস করে যে সেরা মস্তিষ্কের মধ্যে সেও একজন। ছেলেদের শিক্ষিত করার জন্যে সে প্রাণপাত করে, কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার ওপর তার অসীম তাচ্ছিল্য, কারণ তা থেকে অর্থ উপার্জন হয় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অল্পশিক্ষিত অথচ রোজগেরে মানুষগুলোকে সে মানুষ বলেই গণ্য করে না। শিক্ষা তাকে একটা দম্ভ দিয়েছে, তাই কোন কিছুই সে সরাসরি মেনে নিতে রাজি নয়, নিজের মতটাও সে অপরের মুখে শুনলে সঙ্গে সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়।

কিন্তু এত অভাব-অনটনের মধ্যেও তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার একটি চলমান প্রতিষ্ঠান, যার নাম আড্ডা। কলেজে, অফিসে, চায়ের দোকানে, কফি হাউসে অবিরাম চলছে এই আড্ডা। স্থানাভাবে মাঠে পার্কে, বাড়ির রকে, রাস্তার মোড়ে। এখানেই সে কালাপাহাড়ের মতো মন্দির ভাঙে, মূর্তি বিনষ্ট করে, আবার এখানেই সে ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে, পৃথিবীর জানালা খোলে। সুইডেনের কী ছবি হলো, ফরাসী ভাষায় কোন উপন্যাস, আমেরিকায় কে কী আবিষ্কার করেছে, রুমানিয়ার নাচ, মেনুহিনের বাজনা, ইংলণ্ডের নাটক, চীনের চিত্রকলা, রাশিয়ার সাহিত্য, পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে তার সর্বক্ষণের পরিচয়কে মধ্যবিত্ত বাঙালী এখানেই মানিয়ে নেয়, চুলচেরা বিচার করে। বিদেশের উৎকৃষ্ট কিছু পেলে সে সহজেই গ্রহণ করে, কিন্তু নোবেল পুরস্কারের তকমা-আঁটা বইকেও সে নির্ভয়ে বলতে পারে ওয়ার্থলেস। সে সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি ছবিকে নির্দয়ভাবে সমালোচনায় ছিন্নভিন্ন করে, কারণ আর-সব পরিচালকরা তার কাছ থেকে অর্জন করেছে একমাত্র চরম উপেক্ষা। মধ্যবিত্তরা আছে বলেই আর্ট বা কালচার টিকে আছে। রবীন্দ্রনাথে তার অচলা ভক্তি, বাড়ির মেয়েটিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখানোয় তার অকৃত্রিম উৎসাহ, যদিও বাড়িতে রেডিওয় অবিরাম চলে বিবিধ ভারতী। সভ্যতার সংকট এই বাবুদের সৃষ্টি, সভ্যতার বিবেক সেও বাবুরা।

তবু কাব্য, দর্শন, শিল্পবোধ তার সমস্ত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, অর্থকরী বিজ্ঞানে তার উৎসাহ কম। এই বাবুদেরই একজন খুঁজে বের করেছিলেন উদ্ভিদের অনুভূতি, কেউ কেউ অনন্ত রহস্যের সন্ধানে নিজেদের ব্যাপৃত করেছেন। যেখানে যা কিছু আলো, তার মধ্যে যে বোসোন ঘুরছে তা এই বাবুদেরই একজনের নামে। হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো এই বাবুদেরই আবিষ্কার, তিব্বত আর নেপাল থেকে পুঁথিপত্রের স্তূপ এনে পাঠোদ্ধার করেছেন এঁরাই।

আমরা প্রেসার-কুকার বানাইনি বটে, তেরোতলা বাড়ি এখানে দেরিতে তৈরি হয়েছে, কিন্তু একই শহরে একটা গড়ের মাঠের পরেও দু-দুটো লেক বানানোর কথা বাবুরাই ভাবতে পারে।

আমাদের সভ্যতার যা কিছু গর্ব, কাব্য সাহিত্য শিল্প নৃত্যকলা সঙ্গীত নাটক চলচ্চিত্র সব-কিছু সৃষ্টি করেন এই বাবুরাই, সমাদরও জানান তাঁরাই। আমিও নিজেকে বাবুদেরই একজন বলে গর্ব বোধ করি। কারণ আমাদেরই একজন একদা সারা পৃথিবীকে ভারতীয় নৃত্য চিনিয়েছেন, আমাদেরই একজন সারা পৃথিবীকে সেতার শেখাচ্ছেন। আমাদেরই সমাদরে বাঁকুড়ার ঘোড়া আজ বিদেশেরও ড্রয়িংরুমে, আমাদের কোন-না-কোন শিল্পীর ছবি বিদেশের মিউজিয়ামে। আমরা আছি বলেই পেঙ্গুইন বইয়ের প্রকাশকরা সর্বপ্রথম ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়, নোগুচিকে আসতে হয় শান্তিনিকেতনে। আমরা বৈষ্ণবদের দিয়েছি শ্রীচৈতন্য, শাক্তকে দিয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণ। পৃথিবীকে বেদান্ত শুনিয়েছেন আমাদেরই বিবেকানন্দ। আমরাই পৃথিবীকে ভারতবর্ষ চিনিয়েছি। আমাদের মধ্যে এই সেদিনও ছিলেন সুনীতি চাটুজ্যে। আছেন এখনো সত্যজিৎ, রবিশঙ্কর। আমরা ভারতবর্ষকে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি দিতে পারিনি, কিন্তু চৌদ্দ বছরের ছেলের হাতে আমরাই সর্বপ্রথম বোমা তুলে দিয়েছি, তারা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে তাদের জীবন। আমরাই দিয়েছি অজস্র বিপ্লবী এবং একজন নেতাজী। সতীদাহ বন্ধ করেছি আমরাই, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অভিমত গড়ে তুলেছি। বিধবার বিয়ে দিয়েছি। আমরা অস্পৃশ্যতা দূর করেছি সবার আগে। সুতরাং এই মধ্যবিত্ত বাবু যদি কখনো কখনো অহঙ্কার প্রকাশ করে ফেলে, তা অন্যায় হতে পারে, অকারণ নয়।

দোহাই কলকাতানবীশ মহোদয়গণ! বাবু কালচার নাম দিয়ে বাবুদের কালচারকে হেনস্থা করবেন না।

বসন্ত কেবিন

নীলকণ্ঠ

"যদি আরো একটু কম আড্ডা দিতাম তখন, যদি—আরো একটু দূরে হতো বসন্ত কেবিন···"

—বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ দরজায় এসে, শিক্ষার শেষ রাজতোরণের তলা দিয়ে যেতে যেতে,—ঠিক যাবার মুখেই, উপরোক্ত করুণ স্বগতোক্তি শোনা যায় সকলের মুখে। চরম পরীক্ষা যখন এগিয়ে আসে, বিভীষিকার বৈতরণী পার হ'তে সদ্য-কেনা নোট-বইয়ের ভারে জ্ঞানতরণী যখন ভরাডুবির আশঙ্কায় ভারি হয়ে ওঠে, তখনই বসন্ত কেবিনের হাতল-ভাঙা কাপে পরিবেশিত অমৃতও এক মুহূর্তে বিস্বাদ লাগতে থাকে। তারপর অবশ্য ভয় আর থাকে না। এমনকি বিভীষিকার বৈতরণী পার হ'য়ে, প্রথম শ্রেণীর সংকীর্ণ জমিতে মুখ থুবড়িয়ে কেউ কেউ গিয়ে পড়েও এবং তখন কলেজ স্কোয়ারের সেই অন্ধকার ছোট্ট ঘরটার বাইরে নর্দমার ধারে ব'সে শেষ-চায়ের কাপ হাতে নিয়ে, বহুপরিচিত বন্ধুর কাছে বিদায় নেওয়ার চেয়েও মর্মান্তিক দুঃখে মন অভিভূত হয়।

এ দুঃখ আমার একার নয়। কিংবা কারুরই একার নয়। কলেজ স্ট্রীট আর কলুটোলার মোড়ে ওই সাদা থামওয়ালা বাড়িগুলোয় দু বছর ধ'রে কিংবা তারও বেশি যাদের যেতে আসতে হয়েছে, এ দুঃখ তাদের সকলেরই।

বাস্তবিক, ওই ছোট্ট নোংরা অপরিসর অন্ধকার কুটুরিতে পঁয়ত্রিশ-টাকা দামের পাঞ্জাবি-পরা সখের ডিগ্রীলোভী শৌখিন কাপ্তেনের সঙ্গে স্কলারশিপ-সম্বল প্রতিভা বিক্রয়ের ঘৃণ্য ব্যবসায়ে বাধ্য দরিদ্রতম কেরানী-সন্তানের পাশা-পাশি জায়গা ক'রে নিতে এতটুকু দেরি হয়নি কোনোদিন। এমনকি পরবর্তী জীবনে প্রথম যৌবনের অদৃষ্টকে হাস্যমুখে অস্বীকার করবার সৌভাগ্য অর্জন করলো যারা তারাও কি এমন ভাবে ভোগ করতে পারলো তাদের বহু-আকাঙ্ক্ষার, অনাস্বাদিত অবসরের নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার মুহূর্তগুলোকে?

অর্থের অনটনে সেদিনকার বহু কামনার অকালমৃত্যু ঘটেছে, সত্যি। কিন্তু শূন্য পকেটের মতো আমাদের মনও কিছু রিক্ত ছিলো না। অর্থের দুর্ভাবনার

প্রপীড়িত বহু দ্বিপ্রহর না-ভেবে-চিন্তে ধার করেছি। অত্যন্ত প্রয়োজনের বহুমূল্য সঞ্চয় ছড়িয়েছি হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো আনন্দের পেছনে। পরবর্তী জীবনে সেই দুর্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে প্রথম যৌবনের এই মেজাজ। হাতে-না-রেখে বিলোবার এই বদ-অভ্যাস, সাংসারিক পরি-ভাষায় যার নাম অবিবেচনা, তার পুরস্কার আমরা পেতাম হাতে হাতে। কিন্তু সে-দুঃখ একেবারে অবিমিশ্র নয়। সে-দুঃখ সঙ্গে নিয়ে আসতো অব্যক্ত অসহ্য, উত্তেজনায় অস্থির এক আনন্দ। তারপর বিজ্ঞ হয়েছি। সংসারের শক্ত পাথরে মাথা ঠুকে ঠুকে বুঝেছি তার পথ অত্যন্ত সর্পিত। অতি-সাবধানে চলতে অভ্যস্ত আমাদের মন এখন আর হঠাৎ আবির্ভূত, অভাবিত আকাঙ্ক্ষার অতীত সেই মুহূর্তটিকে সহসা পুরোপুরি গ্রহণ ক'রে নিতে প্রস্তুত নয়।

সেদিন বসন্ত কেবিনের সামনে দিয়ে বহুদিন বাদে আসতে আসতে এই-সব কথাই মনে হচ্ছিলো। একদিন ছিলো যখন বসন্ত কেবিনে না-আসার কথা ভাবতেই পারতাম না। আবার একদিন এলো যখন বসন্ত কেবিনও তার দরজা আমাদের মুখের ওপরই বন্ধ করে দিলো। না, ভুল বললাম, আমরাই তার দরজা থেকে দূরে সরে এলাম। কিন্তু তবু তার ছবি মন থেকে মুছে গেল না। যেমন আমাদের সারা বছরের দিনপঞ্জীতে সমস্ত মিলিয়ে আমাদের স্মৃতিতে ছুটির দাগগুলোই জ্বলজ্বল করতে থাকে, ঠিক তেমনই গতানুগতিক জীবনযাত্রার মধ্যপথ থেকে যে-সব আনন্দ ও উত্তেজনা হঠাৎ ছুটি নিয়েছে, তারাও আমাদের মনে দাগ রেখে যায়।

বসন্ত কেবিনে যেমন অনেক সময়েই অকারণে যাওয়া হতো তেমনি সেখানে আমাদের আলোচনার বাঁধাধরা কোনা ধারা ছিলো না। সব-কিছু মিলিয়ে মনে হয় বুঝি ধারাবাহিক কিন্তু আসলে তা নয়। আমাদের আড্ডা-লোকে তর্কের যে অশ্রান্ত ঝড় বইতো, তার যে অনর্গল প্রস্রবণ নিত্যবহমান ছিলো, তা মন দিয়ে শ্রবণ করলে ধরা শক্ত হতো না যে এর শেষের সঙ্গে সুরুর মিল নেই। বহু তথ্যপূর্ণ গম্ভীর আলোচনা হয়তো অতর্কিতে কোনো টুকরো কথায় ঘুরে গেছে কোনো রসে ভরপুর রঙিন হৃদয়ের কূল-না-মানা সমস্ত ভাবনা ভাসিয়ে-দেওয়া উদ্বেল জোয়ারে? হয়তো উড়ে গেছে কোনো চিন্তাশূন্য নীল নীলিমায়।

অমিত রায় লাবণ্যকে বলেছিলো: 'মানুষের জীবনটাকে দেখে মনে হয়, ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে তা আকস্মিকের মালা-গাঁথা।' আমাদের আড্ডার

সেই ক্ষণস্থায়ী জীবনে এমনি সব-কিছুই ছিলো আকস্মিক। জীবন-জিজ্ঞাসার দার্শনিক গভীরত্ব থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং নীতিবিগর্হিত কোনো আলোচনাই বাদ যেতো না। তখন আমাদের প্রথম ভালো-লাগার বয়স। যে কোনো মেয়েকে যখনই দেখেছি তখনই তাকে মনে হয়েছে মনোরম। মনে হওয়ার অবশ্য আর কোনো কারণ ছিলো না এক মনের রোগ ছাড়া। কারণ এম.এ.-পড়তে-আসা সেইসব মেয়েদের মধ্যে বাস্তবিক সুন্দরী ছিলো খুব কম। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের দু বছর সুন্দর-ই ছিলো না কেউ। শুধু এম.এ.-পড়া মেয়ে নয়, পরে বুঝেছি, পৃথিবীর খুব কম রমণীই সত্যিকারের রমণীয়।

কিন্তু তখন কোনো কুশ্রী মেয়েও যদি একটু হেসে চোখ নামাতো, কিংবা নোট-নেওয়ার ছল ক'রে আঙুল ঠেকে যেতো দৈবাৎ, তখন মনে হতো,—কিংবা মনে হওয়ার মতো অবস্থাই হয়তো মনের থাকতো না। সেই ছল থেকে যার শুরু, তা যে নিতান্তই ছলনায় সারা হবে,—এ কথা যে একেবারে বুঝতাম না, এমন নয়, কিন্তু নাগালের বাইরের আঙুরের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করবার জন্যে কথামালা রচনা করাই সোজা, তাকে উপেক্ষা করা শক্ত কাজ। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই আমরা আমাদের মানসীকে আবিষ্কার করতাম। দুঃখের বিষয় প্রত্যেক মেয়ের সঙ্গেই আমাদের কিছু যোগাযোগ ঘটতো না, যদি কারুর সঙ্গে কখনো ঘটে যেতো, তবে তাকেই যোগ-বিয়োগ ক'রে নিয়ে, তাকেই আমাদের মানসীকে-উদ্দেশ্য-করা কাব্য-শ্লোক যা কিছু, এবং সঙ্গে বিরহের শোককাব্যও না শুনিয়ে ছাড়তাম না। তবে ওই কবিতা পর্যন্তই। মানসীকে পাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতো না—উঠলেও ব্যর্থ প্রয়াসে শেষ হতো। জীবনে এমনই হয়। যাকে পাওয়ার কথা নয়, তাকে পেয়েই,—যাকে পাওয়ার কথা, তাকে না-পাওয়ার দুঃখ ভুলি।

কিন্তু শুধু মেয়ে নয়, মেয়ে বাদ দিয়েও আমাদের উদ্বৃত্ত সময় কাটতো রাজনীতি চর্চা ক'রে। এমনকি কোনো কোনো দল তো অন্ততঃ প্রকাশ্যে মেয়ের ওপরই রাজনীতির আলোচনাকে স্থান দিতো, মেয়ের চেয়ে রাজনীতিতেই মত্ত হতো বেশী। তখন রাজনীতির উন্মত্ত হাওয়া ছাত্রসমাজে পুরোপুরি বইতে আরম্ভ করেছে। সে-আলোচনায় বাদ যেতো না কেউ। মেয়েরাও নয়। ইকনমিক্সের সাধারণ জ্ঞানে সে-সব মেয়ে পাস-মার্কসও পায়নি, তারাও কার্ল মার্কস বলতে বিহ্বল হতো। সে-সব আলোচনা সুরু হতো অত্যন্ত

শান্ত, ভদ্র, নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে; নিছক জ্ঞানার্জনের স্পৃহা থেকেই যার জন্ম। মুখ দেখে তাদের এর বেশি আর কিছু বোঝা যেতো না। একটু বাদেই এ মুখোস যেতো খুলে। ভদ্রতার সীমা অতিক্রম ক'রে এমন সব কথা তারস্বরে উচ্চারিত হ'তে থাকতো, যা অশিক্ষিত, অভদ্র, অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও প্রকাশ্যে প্রচলিত ছিলো খুব কম। মতান্তর গিয়ে গড়াতো মনান্তরে। সে-সব বন্ধু-বিচ্ছেদ এত হাস্যকর, এতই অযৌক্তিক ছিলো, যে পরে তা মনে ক'রে নিজেরাই লজ্জিত হয়েছি। সে লজ্জা আবার ঝগড়ার মতোই ক্ষণস্থায়ী।

কিন্তু কেন এমন হয়? এর কারণ আর কিছুই নয়। যখন যৌবনের বন্যায় আমাদের সত্তার দুকূল সহসা প্লাবিত হয় তখন আমাদের উদ্‌বৃত্ত জীবনীশক্তি তার প্রকাশের পথ খোঁজে। সেই প্রকাশের প্রয়াসই কাউকে কবি করে, কাউকে শিল্পী, কাউকে টেনে নিয়ে যায় রাজনীতির রুক্ষতায়। আবার তা প্রকাশ-অসাফল্যে চরম অচরিতার্থতায় কাউকে বিপথে আকর্ষণ করে।

বসন্ত কেবিনে চা খেতে খেতে তখন একটা কথা আমাদের প্রায়ই মনে হতো। মনে হতো বসন্ত কেবিন যদি আরো একটু বড় হতো, কিংবা আসতে পেতো সেখানে আরো একটু আলো। এইসব চিন্তা ও সমস্যার কোনো সমাধান তখন পাইনি। আজ মনে হয় বসন্ত কেবিন যা হয়েছে তার চেয়ে ভালো হ'তে পারতো না। হয়তো আর একটু বড়ো হ'লে কি আর একটু কম অন্ধকার হ'লে ব্যবসার দিক থেকে মন্দ না হ'লেও আমাদের আড্ডা তেমন জমতোনা। কেন জমতো না, সে-কথা আজ চৌরঙ্গীর শৌখিন রেস্তোরাঁয় ব'সে এখন বেশ বুঝতে পারি। এখানে একটু দূরে কোনো বন্ধুকে হঠাৎ দেখলেও জোরে ডাকা যায় না। চা-খেতে জোরে চুমুক দেওয়া বারণ, তাতে পাশের লোক অসভ্য ভাবতে পারে। দম বন্ধ ক'রে অত্যন্ত মনোযোগী হ'য়ে ছুরিকাঁটা সামলাতে ভাবতে হয় কত টিপ্‌স দিলে ভদ্রতা রক্ষা হবে। বসন্ত কেবিনে এ-আরাম ছিলো না, কিন্তু স্বস্তি ছিলো। কারণ সেখানে যে-বসন্ত বইতো তা ছিলো সহজ অন্তর্লোক থেকে স্বতঃ-উৎসারিত। বসন্ত কেবিনে এমন অনেককেই ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতে দেখেছি যাদের বাড়িতে ওই পরিবেশে তাদের ছেলের চা খাওয়ার কথা ছিলো কল্পনারও বাইরে। কী করে তারা কাটাতো? হয়তো অতি-ভদ্রতার মুখোস-আঁটা কয়েদী-জীবন থেকে হঠাৎ-ছুটির সম্পূর্ণ সুখটুকু তারা বসন্ত কেবিনেই সম্পূর্ণ বেপরোয়াভাবে ভোগ করতে ভালবাসতো।

বসন্ত কেবিন বড়ো হ'লে, আরো বড়ো হ'লে, ওখান থেকে উঠে এসে

চৌরঙ্গী কি ড্যালহাউসী স্কোয়ারে ব্যবসা ফেঁদে বসলে যেমন লাভ হবে, তেমনি লোকসানও কম হবে না। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, বসন্ত কেবিনের দৈনন্দিন অতিথিরা, যদি চৌরঙ্গীর বসন্ত কেবিনে খেতে আসতো, তাহলেও ঠিক সে-স্বাদ থেকে বঞ্চিত না হ'য়ে পারতো না। তাই ভাবি ওই সব ছাত্ররা যারা ভবিষ্যতের খ্যাতিমান নাগরিক, তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির দিনের জন্যে ফিরপো ও গ্র্যাণ্ড তো আছেই, তাদের অখ্যাত, অবজ্ঞাত প্রথম যৌবনের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলির জন্যে থাক না একটুখানি কিন্তু অনেক বড়ো—বসন্ত কেবিন।

একথা ঠিকই যে বসন্ত কেবিন কিছু চিরকাল ছিলো না কিংবা অনন্তকাল থাকবেও না। আমরা যতই চিন্তিত হই না কেন এর জন্মের আগেও যেমন এর মৃত্যুর পরেও তেমনই দিন কাটবে। এখনই তো আমাদের মন কফি-গন্ধে উতলা হয়েছে। কফি-হাউসে আবার উচ্চ-নীচ শ্রেণীর ভেদ-প্রাচীর খাড়া করা হয়েছে। তার ব্যালকনিতে ব'সে রুগ্ন, কুব্জ, কুশ্রী কোনো মেয়ের সঙ্গে আইসক্রীম-কফি খাওয়ার সৌভাগ্যগর্বিত জনৈক কেউ যখন ব্যালকনি থেকে কৃপাকটাক্ষে দোতলার অভ্যাগতদের সাদর সম্ভাষণ জানান, তখন নিচের অধিবাসীদের জমে-ওঠা আড্ডার তাল হঠাৎ কেটে যায়। ওদের অনেকেই আগে একান্ত-ভাবেই ছিলো বসন্ত কেবিনের। কিন্তু আগেকার সেই উদ্বেলতা আর নেই। সেই অপ্রতিরোধ্য বাক্-বন্যা আজ কোথায়? তার বদলে মিহিকণ্ঠে মেয়েলি আলাপ ন্যক্কারজনক। যেন মনে হয়, আদিম হিংস্রতার বুনো গন্ধ গা থেকে মুছে ফেলে লোহার গরাদের আড়ালে পোষমানা বাঘের মতো আজ যেন ওরা থাবা গুটিয়ে বসেছে।

তা হোক। তবু বহুকাল পেছনে-ফেলে-আসা বসন্ত কেবিনের সেই দুর্দমনীয় স্রোত যেন আজও টানছে। একবার, আরেকবার ফিরে যাওয়া যায় না সেই ভাবনা-চিন্তা ভাসিয়ে-দেওয়া প্রথমযৌবনের কলরব-মুখরিত অন্ধকার কোণটিতে?

শুধু একবার। একটি মুহূর্তমাত্র। একটি মুহূর্ত—কিন্তু অনেক। অনন্ত। ব্রাউনিং-এর সেই:

> 'Out of all your life
> Give me but a little moment.'

বাসরঘর

পূর্ণেন্দু পত্রী

আমাদের শোবার ঘর আছে। পড়ার ঘর আছে। স্নানের ঘর আছে। আঁতুড়ঘর আছে। বসার ঘরও আছে। কিন্তু বাসরঘর নেই। অথচ বাসরঘর বলে একটা ঘরের নাম আমরা জানি। গল্পে পড়ি। উপন্যাসে দেখি। কবিতায় পাই। অন্যের বিয়ের বরযাত্রী সেজে দেখে আসি। নিশ্বাসে ঘ্রাণ নিই। তারপর নিজের জীবনে একদিন তার আবির্ভাব ঘটে।

আমাদের বাসরঘর নেই। তবু বাসরঘরকে ধন্যবাদ।

আমাদের সমস্ত সাধারণত্বকে এক অপরূপ সুখের সাবানে ধুয়ে মুছে, আকাঙ্ক্ষার শুভ্র পাউডার অভ্রের মতো সারা মুখে মাখিয়ে, সেই-ই তো আমাদের একদা সাজিয়েছিল এক রাত্রির প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সম্রাট। বানিয়েছিল রঙিন তোরণ। ফুল বিছোনো শয্যা। ফুল্ল উৎসব। ফুলন্ত হাসি-খুশির হাট।

ঐখানে ঘরের মধ্যে ছিল তিন থাক্ টিনের ট্রাঙ্ক। ঐ কোণে স্তূপাকার হাঁড়ি-কলসী। ঐদিকের আলনায় বাদুড়-ঝোলা ময়লা পুরনো এলোমেলো জামা-কাপড়ের ডাঁই। চারদিকের দেয়ালে হয়তো গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছিল থোকা-থোকা ঝুল। দেয়ালে দেয়ালে কত কালের কলঙ্করেখা। উঠতে বসতে ডাইনীর মন্ত্র-পড়ার মতো মড়মড় শব্দে দাঁত খিঁচিয়ে উঠতো তিন পুরুষের মেহগনী কাঠের খাট। খুলতে আঁটতে মাতালের মতো টলমল করতো এক-পা-খোঁড়া আলমারিটা।

বাসরঘরকে ধন্যবাদ।

সব কিছুকেই বদলে দেয় সে। তার আশ্চর্য প্রদীপে আটপৌরে হয়ে ওঠে অমরাবতী। যেদিকে চোখ যায় রূপের ঝালর। যেদিকে চোখ যায় রূপসী মুখ। চুনবালি-খসা, হাড়েমাসে ঘুণ-ধরা একটা চারচৌকো ঘর, ফুটে ওঠে যেন পারিজাত ফুল।

তখন বাসরঘর কোনো ঘর নয়। সে যেন ব্রহ্মাণ্ড। বিপুল এক মহাকাশ। সেখানে সকালের পূরবী এসে মেশে সন্ধের বিভাসে। সেখানে প্রত্যেকটি কথা

নক্ষত্র। প্রত্যেক হাসির গায়ে সাতটি করে রং। প্রতি মুহূর্তের কামনা এক অপরূপ উল্কাপাত।

অথচ এই বাসরঘর, বাসরঘরের সুরভিত স্মৃতি আমাদের প্রতিমুহূর্তে মনে থাকে না। মনে পড়ে না। আমরা অপরকে শৈশবের কথা বলি। রথের মেলায় হারিয়ে যাওয়ার গল্প বলি। বাল্য-প্রণয়ের রঙিন রূপকথা বলি। যৌবনের প্রথম ব্যর্থ-প্রণয়কে পরিবেশন করি বানানো কথার রাংতায় মুড়ে। শুধু বলি না। লিখি। লিখে ছড়িয়ে দিতে চাই। অথচ বাসরঘরে-উদ্‌যাপিত জীবনের প্রথম রোমাঞ্চিত যামিনীর স্মৃতিকথা আমরা কি কখনো উদ্‌ঘাটিত করেছি অপরের কাছে? এমনকি নিজের কাছেও? নিজেদের লেখায়? জীবনস্মৃতিতে? পত্রাবলীর পাতায়?

বিভিন্ন মহাপ্রাণ অথবা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের ছবি ছাপা থাকে বিভিন্ন বইয়ে। নিচে লেখা থাকে জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের সাল তারিখ। বিবাহের দিন, বাসরঘরের তারিখ লেখা থাকে না কেন? তাঁরা কি শুধু জন্মেছিলেন এবং মারা গিয়েছিলেন? জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে তাঁদের জীবনেও তো ছিল বিবাহ। আমরা বলি, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ একসূত্রে গাঁথা। বিবাহ যদি থাকে বাসরঘর থাকবেই। এবং ছিল। কামনার নদীতে সেই তো প্রথম নৌকাবিলাসের দিন। দিন নয়, রাত। সে কেন উপেক্ষিতা তবে জীবনের মহাকাব্যে?

কোথায় যেন পড়েছিলাম কনফুসিয়াস বৃদ্ধ হয়েই জন্মেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত খ্যাতনামা প্রতিভাধরেরাও কি তাই? নাকি ভালবাসার কথা বলতে বড় লজ্জা? প্রেম বড় তুচ্ছ পদার্থ? ও শুধু গানেই থাক। শোভা পাক গল্পে। জীবনস্মৃতি অথবা জীবনকাহিনীতে ওর চির-নির্বাসন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আমাদের একেবারেই বঞ্চিত করেন নি। বাসরঘরের কিছু সংবাদ জানিয়েছেন। জীবনস্মৃতিতে নয়, স্মৃতিচারণের মুহূর্তে, কোনো-না-কোনো অনুরাগিণীর প্রশ্নের উত্তরে। আকাঙ্ক্ষার তুলনায় অল্প। তবু স্বাদে বিচিত্র।

মানুষমাত্রেরই ভুল হয়, জানি। এমনকি মুনীঋষিদেরও। হয়তো ভুলের চেয়েও সেটা বেশী। মতিভ্রম। কিন্তু এই ভুলে যাওয়ার খেলাটা ভারী কৌতুকের।

যে চাবির গোছায় একটা গোটা সংসারের জীয়নকাঠি, যা হারালে এক পলকে তাঁদের উদ্‌ভ্রান্ত মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে অধিকৃত একটা সাম্রাজ্য হারানোর শোক, আমাদের গৃহিণীরা প্রতি পদক্ষেপে সেই চাবির গোছাটিই

মনের ভুলে হারিয়ে বসেন সবার আগে, নিজস্ব আঁচলের অমন নিগূঢ় বাঁধন সত্ত্বেও। ভীষণ প্রয়োজনের মুহূর্তে অর্জুন যেমন করে হারিয়েছিল তার অখণ্ড পরাক্রম, তেমনি করে গভীর প্রয়োজনের মুহূর্তে মনের ভুলে আমরা হারিয়ে বসি অপরিহার্য কিছু। কখনো তা হয়তো একটা লোকের নাম। কখনো একটা ঠিকানা। কিংবা টেলিফোনের নম্বর লেখা ছোট্ট চিরকুট। যতই তুচ্ছ হোক সেই মুহূর্তে সেটিই ছিল সবচেয়ে জরুরী।

কচের মতো আমাদের জীবনেও সবচেয়ে বড় আমাদের কাজ। আমাদের স্বাধীনতা নয়, প্রেম নয়, আপন আত্মার পূর্ণতা নয়। যতই সুখশূন্য হোক, যথাসময়ে হাজিরা দিতে হবেই সুউচ্চ অট্টালিকার স্বর্গধামে সেখানে আছেন দেবতারা। সিংহাসনে সমারূঢ়। তাঁরা দোহন করবেন আমাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অধীত বিদ্যা থেকে সারাৎসার। যার প্রয়োগে অথবা ব্যবহারে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হবেন দেবত্বের অমরত্বের নতুন মহিমায়। এবং তারই জন্যে বারবার নিহত হতে হবে আমাদের। প্রত্যাখ্যান করে আসতে হবে ভালবাসাকে, শোভাকে, প্রীতিকে, পরিপূর্ণতাকে। এবং সারা জীবন তারই জন্যে বইতে হবে বিদায়-অভিশাপ। সবার আগে ভুলতে হবে তাকে যাকে মনে রাখা উচিত ছিল সবার আগে।

কচের জীবনে দেবযানী যা আমাদের জীবনে বাসরঘরও তাই। ফুল দিয়ে, গন্ধ দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, গান দিয়ে, আলাপের অন্তরঙ্গ অবসর দিয়ে সেই-ই তো আমাদের জন্যে সাজিয়ে তুলেছিল এক অভিনব স্বর্গ-লোক। কচের মতো আমরা তাকে ধীরে ধীরে ভুলেছি। কিংবা ভুলিনি। রয়েছে মর্মমাঝে রক্তময়। বাইরে তা দেখানো নিষেধ।

অথচ মানুষের জীবনে বাসরঘরের চেয়ে গৌরবের বড় জায়গা আর নেই। সমস্ত জীবন জুড়ে আমরা যা কিছু পাই, লাভ করি, তা আমাদের অর্জন করতে হয়। আমরা অর্থ পাই, শ্রমের বিনিময়ে। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, পুরস্কার, সম্মান পাই শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি কিংবা জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ সাধনায় দুরূহ কিছু সৃষ্টির বিনিময়ে। একটা ছবি কিংবা কবিতা রক্তের বিনিময়ে। জীবনের ভারাক্রান্ত অভিজ্ঞতার বিনিময়ে গল্প কিংবা উপন্যাস। মাটি, জল ও পরিচর্যার বিনিময় ছাড়া কোন ফুলকে ফোটাতে পারি না। রক্তাক্ত খণ্ডযুদ্ধে প্রাণ বাঁচানোর প্রচণ্ড প্রয়াসের বিনিময়ে পাই খেলার মাঠের টিকিট। গলদঘর্ম ধস্তাধস্তির বিনিময়ে বাসে-ট্রামে একটু পদস্থাপনের স্থান। মোটা অঙ্কের

আক্কেলসেলামীর বিনিময়ে বাড়িঘর। মোটা দামের নোটবইয়ের বিনিময়ে পাঠ্যপুস্তক। কখনো কখনো ঘুষের বিনিময়ে চাকরি। অজস্র তোষামোদের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠাবানের স্নেহ। বক্তৃতার বিনিময়ে ভোট। কামান-বন্দুকের বিনিময়ে রাজ্য।

কিন্তু জীবনে মাত্র একবারই আমরা কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই লাভ করি দুর্লভ কিছু। কোনো কিছু বিনিময় ছাড়াই ? না। বিনিময় ঘটে। সেটা হৃদয়ের। শুধুমাত্র হৃদয়ের বিনিময়ে আমরা লাভ করি পরমাশ্চর্য। বাসরঘরের ঘটকালিতেই মানুষের সঙ্গে প্রেমের প্রথম বৈধ আলিঙ্গন।

কিন্তু পরমাশ্চর্যের শেষ এইখানেই নয়। বাসরঘরের বাহাদুরীর আরো ইতিহাস বাকি। বাসরঘর যে নারীকে এনে সমর্পণ করলো আমাদের দেহে-মনে-জীবনে, একবারে চিরস্থায়ী রূপে, তাকে আমি আগে দেখিনি কিংবা স্বল্পকাল মাত্র আগে দেখেছি। সে আমার কেউ নয়। কিংবা সে যে আমার কেউ হবে তাকে আগে দেখে বুঝিনি।

বাসরঘরে আমরা যে নারীকে পাই তাকে আমরা গড়িনি। যেমন করে গড়ি আমরা আমাদের নিজেদের কবিতা, ছবি, গল্প, গান। আমরা তার নাম দিইনি। যেমন দিই নিজেদের সৃষ্টির বেলায়। আমরা তাকে আকার দিইনি। যেমন দিতে হয় কিছু গড়তে গেলেই। অথচ বাসরঘর তাকেই জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গীরূপে প্রতিষ্ঠা করে গেল জীবনের মাঝখানে।

আদমের পক্ষে ঈভকে একান্ত ভাবে আমার বলা সহজ। সেটা তার সাজে। কারণ ঈভের জন্ম আদমেরই বক্ষপঞ্জরের একাংশ দিয়ে। ঈভ আদমের আপন দেহের মাধুরী দিয়ে গড়া। নিজের জীবনসঙ্গিনী উৎপন্ন তার নিজেরই উপাদানে। সুতরাং ঈভ তো আপন হবেই।

কিন্তু বাসরঘর যাকে বুকের বেদীতে বসিয়ে দিয়ে গেল এ কে ? এ কি করে আমার আপন ? এর জন্ম হয়েছে আমার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টির অগোচরে। এর কৈশোর কেটেছে আমার অজ্ঞাতসারে। একই আকাশের নীচে কিন্তু অন্য কোনখানে, একই বর্ষা-বসন্তে কিন্তু অন্য ভুবনে, একই কালে কিন্তু অন্য মানসিকতায় তিলে তিলে এর বৃদ্ধি, এর জাগরণ, এর স্বপ্ন ও সুষমার বিকাশ। বাসরঘর করলে কি ? সেই অচেনাকেই সলজ্জ ঘোমটার আবরণ খুলে সহসা মিলিয়ে দিয়ে গেল চির-পরিচয়ের ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় বাঁধনে। একি দুর্বোধ্য অথচ সুন্দর কৌতুক। রহস্যের চেয়ে আরো রহস্যময়।

টলস্টয়কে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, আচ্ছা, আপনি তো নারী চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন। আপনার শেষ অথবা চূড়ান্ত কথাটা কি? উত্তরে টলস্টয় বলেছিলেন একমুখ কৌতুক নিয়ে, বলতে পারি। কিন্তু এখুনি নয়। আগে আমার কবর তৈরী হোক। উত্তরটা দিয়েই আমি টুক্ করে কবরে ঢুকে পড়বো।

বাসরঘরের মতোই এ আর এক কৌতুক। উত্তর দিয়েই টলস্টয়কে কবরে ঢুকতে হবে কেন? তিনি কি বোঝাতে চাইলেন যে কবরে প্রবেশ করার আগের মুহূর্তেও মানুষের নারীচরিত্র সম্বন্ধে শেষ অভিজ্ঞতা অজানা থেকে যায়? প্রেম সম্বন্ধে শেষ কথা বলার পরই কি যঃ পলায়তি সঃ জীবতি? বাসরঘরও কি তাই আচমকা এসে দুটো প্রাণকে এক ঠাঁয়ে মিলিয়ে দিয়েই উধাও হয়ে যায় সোনার হরিণের মতো শূন্যে? বাসরঘরের স্মৃতিকে যে আমরা ভুলে থাকি, সে কি তার নিদারুণ কৌতুকের শেষ মানে বুঝতে না পারার ফলেই? বুঝতে-বুঝতেই জীবন কবরখানার দিকে গড়িয়ে আসে বলেই?

বোঝা গেল কেন বাসরঘর বলে কোন স্থায়ী ঘর নেই আমাদের। বাসরঘর একটা হঠাৎ-গাওয়া বাল্মীকির ছন্দ। এক আলোকিত রাতের হঠাৎ অতিথি। ক্ষণকালের জন্যে এসে চিরকালের জন্যে ঘটিয়ে যায় রক্তপাত এবং রক্তাভ কুসুম দিয়ে গাঁথা একটা নিদারুণ নাটক। রাত পোহালে বাসরঘর আর বসে না। চলে যায়। আমরা থাকি, যাদের মিল ঘটলো জীবনে জীবনে, অঙ্গে অঙ্গে। থাকতে থাকতে বদলাই। বদলাতে বদলাতে কি হই? Satis magnum alter alteri theatrum Sumus. একে অপরের কাছে থিয়েটারের ক্রমাগত পরিবর্তমান দৃশ্যের মতো বিস্ময়কর।